নকাল

পূর্ণেন্দু পত্রী

লেখাপড়া। কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৫৭

প্রকাশক
রাখাল সেন
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রাকর
শ্রীবীরেন্দ্রমোহন বসাক
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং হাউস
১০ ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

সুধাংশু গুপ্ত

প্রিয়বরেষু,

একদিন ছিলে নিবিড় পাশে প্রতিদিন
এখন প্রবাসে।
আমার যৌবনকালের অনেক উত্তাল
জোয়ার-ভাঁটার সাক্ষী।
ঢেউএর মাতন গায়ে নাই লাগুক,
উড়ো বালির ঝাপটা
অনেক সামলিয়েছ।
তারই ঋণ শোধ করলাম।

কাচানো) নীলাম্বরীর মতো আকাশটাকেও সবিতার মনে হল মরা।) শুধু আকাশ কেন, সমস্ত জীবনটাই মরা। মরা, মিথ্যে। সবিতার মনে সংশয় ছিল সুজিত হয়তো আজও আসবে না। তবু আসতেও পারে এই রকম একটা তৈরি-করা আশা নিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙল সে। স্কুল থেকে শ্যামবাজার আসতে সময় লাগে আধঘণ্টা। শ্যামবাজার মোড় থেকে মানিকতলার মোড় পাঁচমিনিট, মোড় থেকে রাধারমণ বসু গলিটা কতই বা—খুব জোর মিনিট তিনেক। এতখানি সময় স্থির থাকে। পা গুনে গুনে হাঁটে। সংযত, গম্ভীর। তিরিশ বছরের তুলনায় বেশিই মনে হয় সেটা।
কিন্তু দোতলার সিঁড়িতে পা দিলেই আলাদা মেয়ে। লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙে। দুলুনি খায় সারা শরীর, গালের মাংস, কানের দুল, শাড়ির আঁচল ঠেলে ভারী বুকের রেখা।
সিঁড়িটা এসে বাঁক নিয়েছে উত্তরে। সিঁড়ির একটা বাঁক পর্যন্ত উঠে ঘাড় উঁচু করে তাকানোটা ওর অভ্যেস। দরজার সামনে কয়লার ঝুড়ি। জ্বালানি কাঠ। রোঁয়া-ওঠা পাপোশ। কয়েক পার্টি জীর্ণ জুতো। সবিতা তাকায় সেই জীর্ণ জুতোর জটলার দিকে একটা স্যাণ্ডেলকে দেখবে বলে। ছেঁড়া, ময়লা, গোড়ালি-খোয়া একটা স্যাণ্ডেল। আর ঐ তাকানোর মুহূর্তটায় চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে যায়। ধ্বক্ করে ওঠে বুক। কালকের মতো, তার আগের দিনের মতো, আজও বুকটা একবার ধ্বক্ করে জ্বলে উঠে হিম হয়ে গেল। সুজিত আসে নি। দরজার সামনে স্যাণ্ডেল নেই। আচ্ছা, দুষ্টুমি করে লুকিয়ে রাখতে পারে না কি? যা সব দুষ্টুমি বুদ্ধি ওর মাথায় আসে। খুব বেশী দিনের কথা নয়। সুজিতের একদিনের দুষ্টুমির ছবি মনে পড়ল সবিতার।

সন্ধ্যে না হতেই সেদিন সুজিত এসে হাজির। হাতে বিরাট একটা রজনীগন্ধার গোছা। ঘরে একা আমি ছিলাম না। চিত্রা, কাঁদনও ছিল। হাতে ফুলের গোছা নিয়ে সুজিতের এই আসাটা আমাদের সকলের চোখেই অবাক লেগেছিল। সুজিত হাসতে হাসতে এগিয়ে এসেছিল আমার দিকে। হাসলে ওকে শিশুর মতো দেখায়। ফুলের গোছাটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিল—

—হাতে দেবো না পায়ের তলায় রাখবো ?

বুঝতে পারি নি কি ব্যাপাব, বলেছিলাম,

—কি ইয়ার্কি হচ্ছে ?

সুজিত বলেছিল তোমার জন্মদিনের উপহার।

কাঁদন ছাড়া আমরা দুজন হেসে উঠেছিলাম। চিত্রা বলে উঠেছিল,

—কি অসভ্য দেখছো সবিতাদি।

আমি বলেছিলাম—খুব ইয়ার্কি হয়েছে। বোসো।

—কেন ইয়ার্কি কেন ? আজ তোমার জন্মদিন নয় ?

—না। তুমি খুব ভাল করেই জান আমার জন্মদিন বৈশাখে।

—তাই নাকি ? আমাকে তো বল নি কখনো। কি করে জানবো বল। মেয়েরা বৈশাখ মাসে জন্মাতে পারে এ আমার ধারণার বাইবে।

—আহা ! কেন, বৈশাখটা মাস নয় ?

—মাস ঠিকই। তবে মেয়েদের জন্মানোর মাস নয়। মেয়েরা জন্মাবে শরতে, হেমন্তে, বসন্তে। ঋতু যখন রূপময়।

চিত্রা আবার বলে উঠেছিল ভ্রূকুটি হেনে,

—অসভ্য।

সুজিত তখনো দাঁড়িয়ে। সারা ঘরটা ভরে গেছে স্নিগ্ধ গন্ধে।

আমি আবার ওকে বসতে বলেছিলাম।

—বসছি। কিন্তু তার আগে এগুলোকে তো কোথাও রাখতে হয়। তুমি যখন গ্রহণ করবে না ভক্তের দান।

চিত্রা বলেছিল—ঠিক হয়েছে। সারারাত নিজের ফুল নিজেই ধরে দাঁড়িয়ে থাকুন।
সুজিত নীচু হয়ে চিত্রার মাথায় একটা গাঁট্টা মারতে উদ্যত হলে চিত্রা কৃত্রিম চীৎকারে ভরিয়ে তুলেছিল ঘরটা।
—কাঁদনদা, মেরে ফেললে।
ওটা চিত্রার ন্যাকামো। কাঁদন যেন ওর সারাজীবনের রক্ষাকর্তা। চিত্রাকে এমনি খারাপ লাগে না। অনাবিল মেয়ে। পড়াশুনায় ভাল। ভাল বলেই তো এই ঠাঁই-নেই বাড়িতে ঠাঁই-দেওয়া। কিন্তু কাঁদনকে কেন্দ্র করে ওর ঐ লোক দেখানো প্রেমের অভিনয় ভাল লাগে না। লোকের চোখে সব সময়েই ও এমন একটা ভাব দেখাতে চায় যেন কাঁদনই চিত্রাকে বেঁধে রেখেছে ভালবাসার সাতপাকে।
সুজিত এবার চিত্রাকে ধমক দিয়েছিল।
—তাহলো ওঠো।
চিত্রা উঠে গিয়েছিল। কাঁদনের এত কথাতেও কোন কান নেই। লিখে চলেছে নিজের কবিতা। চিত্রা ফুলগুলোকে সুজিতের হাত থেকে নিয়ে ফ্লাওয়ার ভাসে সাজিয়ে রাখার পর সুজিত খাটে এসে বসেছিল আমার পাশে, সামান্য একটু দূরত্ব রেখে। এমনিতে স্মার্ট। চোখে মুখে চঞ্চলতা। অথচ কোন কোন বিষয়ে বিষম লাজুক। মেয়েদের মতো। কেমন যেন বোকা-বোকা, ভোঁতা হয়ে যায়।
আমি বলেছিলাম—কি ব্যাপার বলতো? হঠাৎ ফুল কেনা কেন?
—হঠাৎ কেন হবে। আমি তো জানতাম আজ তোমার জন্ম-দিন।
—আবার ইয়ার্কি।
—ইয়ার্কি নয়, সত্যি, বিশ্বাস কর। ইউনিভার্সিটি থেকে মেসে ফিরে জানলা দিয়ে তাকাতেই হঠাৎ চোখে পড়ল আকাশে একটা প্রকাণ্ড সোনার থালা। কলকাতায় যে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে কখনো

দেখি নি। তারপরেই মনে হল আজ নিশ্চয়ই সবিতাদির জন্মদিন। আকাশ জুড়ে তাই এই অভাবনীয় কাণ্ড।

মুখে ওকে তিরস্কার করেছিলাম। কিন্তু শুনতে ভাল লেগেছিল। জানতাম সব কথাই সুজিতের এখুনি বানানো। ফুল এনেছিল নিছক মজা করবার জন্যে। তবু ভাল লেগেছিল শুনতে। মনের তলায় ক্ষণিকের জন্যে বয়ে গিয়েছিল একটা চাপা কষ্ট। সুজিতের বানানো কল্পনা, কেন সত্যি নয় আমার জীবনে। কেন পৃথিবীতে ঘটবে না স্মরণীয় কিছু আমার জন্মদিনে! কেন এত নগণ্য হবে পৃথিবীতে আমার থাকা, বাঁচা, জীবন যাপন!

কাঁদন কবিতা লেখা শেষ করে বেরিয়ে গিয়েছিল। চিত্রা বসেছিল পড়তে। আমি আর সুজিত বারান্দায়। সত্যিই পৃথিবীতে আজ পূর্ণিমা। কেউ কোন কথা না বলে দাঁড়িয়েছিলাম। আশ্চর্য, দুজনের হাতেই দুটো শূন্য চায়ের পেয়ালা। চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। আমি কাপ দুটো নিয়ে চলে গিয়েছিলাম। রান্নাঘরে বিশুর মাকে রান্নার এটা-ওটা বুঝিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এসেছিলাম বারান্দায়, সুজিতের পাশে। ওর মাথার চুলে আলতো একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলাম—কি ভাবছো?

সুজিত আমার একটা হাত আলতো করে ছুঁয়েছিল তখন। কোন কথা না বলে।

— এত চুপচাপ কেন? রাগ?

— কিঞ্চিৎ।

— কারণ?

হঠাৎ সুজিতের গলা পুরুষের মতো হয়ে উঠেছিল। ভারী।

—আচ্ছা সবিতাদি, তুমি কি ঠিক জান আজ তোমার জন্মদিন নয়?

— ও মা, সে কি! ঠিক জানি না তো কি?

— তার মানে তুমি একবারই জন্মেছ পৃথিবীতে? জন্মানোর পর আর কোনদিন তুমি নতুন করে জন্মাও নি?

— তার মানে ?

—(কাপুরুষরা নাকি মৃত্যুর আগে অনেকবার মরে। তেমনি কিছু কিছু মানুষ জন্মাবার পরেও নতুন করে জন্মায়। ফুলের কোন নির্দিষ্ট জন্মদিন নেই। কারণ সে রোজই জন্মাতে পারে। যারা ভালবাসে, তারা রোজই জন্মায়। প্রতিদিন তাদের জন্মদিন।)

সুজিতের কথাগুলো আমার বুকের মধ্যে তখন যেন মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার মতো ঢংঢং করে প্রবল কলরবে বেজে উঠেছিল। সুজিত মাঝে মাঝে এমনি সব কথা বলে। অর্থহীন কথা। তবু কিছু যেন তার মানে হয়। অর্থ ছাড়িয়ে গভীর বাণীর মতো শোনায়। মাঝে মাঝে ওর ঐ সব পুরনো কথা শুনতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে ওকে ডেকে বলি—সুজিত, সেই জন্মদিনের কথাটা আবার একবার বলতো।

সুজিত বলবে—যারা ভালবাসে, তারা প্রতিদিন জন্মায়।

সুজিতকে বলবো—তুমি আমাকে নতুন করে বাঁচিয়েছ সুজিত। অনুপমা গার্ল স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হারিয়ে যাচ্ছিল পৃথিবীর নগণ্য ভিড়ে। তুমিই তাকে জন্ম দিয়েছ নতুন করে।

সেদিন রাত্রে সুজিতকে খেতে বলেছিলাম।

— তুমি যেমন মিথ্যে-জন্মদিনের ফুল নিয়ে এসেছ, তেমনি মিথ্যে-জন্মদিনের খাওয়াটাও খেয়ে যাও।

বিরামের সেদিন নাইট ডিউটি। ও চলে গিয়েছিল সকলের আগে খেয়ে।

কাঁদন বলে গিয়েছিল, ফিরতে রাত হবে। বলে যেদিন যায় না, সেদিনও রাত্রি হয়। ক্লাব, সাহিত্য-সভা, রাজনীতি এই নিয়ে কদিন বেশ একটা উন্মত্তের মতো জীবন কাটাচ্ছে। পড়া ছেড়ে দিল মাঝপথে। চাকরির চেষ্টা নেই। মাটির পৃথিবীকে সোস্যা-লিজমের স্বর্গ না-বানানো পর্যন্ত ও কেবল কবিতা লিখবে, তর্ক করবে, মিছিলে গলা ফাটাবে আর বাড়ি ফিরবে গভীর রাত্রে।

আর শুধু ওর সিগারেট খাওয়ার পয়সা ছাড়া আর সমস্ত কিছুর খরচ বইবে দিদি। সিগারেট খাওয়ার পয়সা ও কোথায় পায় কে জানে!

খেতে বসেছিলাম আমরা তিনজন। আমার পাশে সুজিত। চিত্রা আমাদের দিকে মুখ করে।

ভাত মুখে দিতেই ফুলের গন্ধ নাকে এল। তাকিয়ে দেখি সমস্ত ভাতে রজনীগন্ধার অজস্র ভাঙা পাপড়ী মেশানো। দুটোর রঙই সাদা। তাই প্রথমে চোখে পড়ে নি। সুজিত ভিজে বেড়ালের মতো মুখ করে বসেছিল। আমি ওর দিকে কপট ক্রোধের ভাব নিয়ে তাকাতেই সুজিত প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাও। বুঝলাম চিত্রা ছিল ওর এই চক্রান্তের অংশীদার।

হাসতে হাসতে সুজিত তারপর বলেছিল,

—খেয়ে দেখোই না। ফুল দিয়ে ভাত খেতে খারাপ লাগার কি আছে?

কি করে যে মাথায় আসে এসব ওর!

আজও কি কোনো একটা দুষ্টুমি করে লুকিয়ে থাকতে পারে না!

দরজাটা খোলার আগে এদিক ওদিক অকারণে তাকিয়ে দেখল সবিতা।

না, আজ ও আসবে না। তার কারণ আর কিছুই নয়, যেহেতু স্কুলে বসে আমি মনস্থির করে ফেলেছিলাম আজ সুজিত এলে সুজিতকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাবো। হয় বেড়াতে। নয় সিনেমা দেখতে।

সবিতা জানে তার কোনো সিদ্ধান্তই সিদ্ধ হয় না, হবে না।

আস্তে দরজাটা খুলতে গিয়ে আঙুলের ডগায় যেন শরীরের সব শক্তি উঠে এল। থড়াস করে দেওয়ালে ধাক্কা খেল দরজাটা। কেউ চমকে উঠল না সে শব্দে। একটা লম্বা টিকটিকি কেবল মুখ

ঘুরিয়ে কড়িকাঠের দিকে তর্‌তর্‌ করে দৌড়ে গেল শিকার ফেলে। চমকে উঠবার মতো কেউ নেই ঘরে। কাঁদন কিংবা চিত্রা কেউ না। পাশের ঘরটা সবিতার শোবার ঘর। যেখানে তক্তপোশের ওপর মিণ্টু ঘুমোচ্ছে, বেঁকে, গোল্লা পাকিয়ে। মুখের ওপর মাছি ভন্‌ভন্‌। তার পাশে রান্নাঘর। বিশুর মা ঘুমোচ্ছে নাক ডাকিয়ে। সমস্ত বাড়িটা চুপ। মৃত্যুর মতো। বারান্দায় শুকনো কাপড় উড়ছে। একটা রঙীন ব্লাউজ আর সাদা রুমালে জড়াজড়ি। নীচের টিউবওয়েলে বালতির লাইন। হাঁ-করা মুখ। সরু গলির ভেতর আটকে-পড়া মোটর গাড়ির কর্কশ হর্ন। একবার বারান্দা আর একবার ঘর, এত করেও কিছু ভাল লাগছে না সবিতার। মিণ্টুর বিছানায় বসে মাছি তাড়াল। তার ঘুমন্ত গালে চুমু খেল আল্‌তো ভাবে। চোখের পাতার ওপর থেকে সরিয়ে দিলে পশমী চুল। নাকের ডগা থেকে মুছে নিলে কয়েকটা শিশিরের মতো ঘামের বিন্দু। অন্য ঘরে অর্থাৎ সামনের ঘরটায় মেঝের ওপর বিছানা পাতা। কাঁদন কোথায় যেন গেছে। বিছানাটা গুটিয়ে যাবারও ফুরসত নেই। সেটা গুটোল। টেবিলের ওপরে মাথার ঘাঁটা চুলের মতো বইখাতা ছড়ানো। চিত্রাও গেছে হয়তো কাঁদনের সঙ্গে। বইগুলো গুছিয়ে যেতে পারে না। কতবার বলেছি, ও এসব নোংরামি দেখতে পারে না। সবিতা বইগুলো গুছোল। রান্নাঘরের দরজায় ধাক্কা মারল অবশেষে।

— বিশুর মা, বিশুর মা, ওঠো দেখি। জল আনো। আঁচ দাও উনুনে। আমার পেট জ্বলছে, মিণ্টুকেও দুধ খাওয়াতে হবে।

সবিতা এসে মিণ্টুর বিছানার ওপর বসল। বসতে ভাল লাগল না। শুয়ে পড়ল। জানলার নীচে টবে লাগানো গোলাপ গাছ কয়েকটা। তার পাতাগুলো পোকায় কেটেছে। কিসে মরবে পোকাগুলো? জানলার ওপরে আকাশ। আকাশের নীচে সারি সারি কয়েকটা টালির চাল। এদিকে ওদিকে অনেক সৌখিন

বাড়ি আকাশের দিকে তাকাল সবিতা। কাচানো নীলাম্বরীর মতো আকাশকেও তার মনে হল মরা। শুধু আকাশ নয়, জীবনটাও।

সন্ধ্যে হয়ে এল। বাইরে উনোনের ধোঁয়া ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে অল্প ঘরে আসছে। সবিতা তবু উঠে দরজাটা পুরো ভেজিয়ে দিতে পারল না।

বিশুর মা দুধ গরম করে আনল।

—চা বসিয়েছ ?

—ক-কাপ জল চাপবে মা ?

—ওরা তো কোথায় বেরিয়েছে। আমাকে এক কাপ করে দাও।

—চিনি কিন্তু কম আছে মা। আনতে হবে দোকান থেকে।

—আনোগে যাও। চা যদি কম থাকে সেটাও এনো।

—পয়সা দিন মা।

—পয়সা! পয়সা আমি জানি না। পয়সা চাইবে বাবুর কাছে। আমি ছাড়া কি আর লোক নেই বাড়িতে। বাবু আছে, কাঁদন আছে, চিত্রা আছে। সংসার নিয়ে আমাকে একা মাথা ঘামাতে হবে কেন ?

বিশুর মা বাড়ির সবাইকে বুঝতে পারে। কেবল তার এই মা-টিকে ছাড়া। আজ হাসিখুশি, কাল আবার মন-মেজাজ কেমনতর। এদিকে দয়া-মায়ার অন্ত নেই। আবার রাগলে বাড়িসুদ্ধ কাঁপে।

—আপনিই তো চিরকাল দিয়ে আসছো গো। ওদের চাইবো কেন ?

সে কথা সত্যিই। বিশুর মার কি দোষ। ও কি বোঝে সংসারের! ওর কাছেই বা নিজের নিঃসঙ্গ অস্তিত্বের জ্বালা জানিয়ে কি লাভ! সবিতার কি মনে হল সুজিতের না আসার পেছনে, তার এই স্বাদহীন মরা মরা দিনগুলোকে সইতে না পারার অসহ্য জ্বালার পেছনে বিশুর মারও অপরাধ আছে কিছু ?

—ব্যাগ থেকে নিয়ে যাও একটা আধুলি। আর শোন, ছুপুরে একঘর মাছির মধ্যে মিন্টুকে শুইয়ে গেলে। মশারীটা টাঙিয়ে দিতে পারলে না? যে কথাটি না বলে দোবো সে কাজ আর কখনো হবে না তোমাদের দিয়ে। তোমরা সবাই মিলে কি পেয়েছ বল তো আমাকে?

কান্নায় গলিয়ে দিতে পারলে মনের দাহ উপশম হয় যতটা, রাগের কৃত্রিমতায় তার আংশিক ঘটে। বিশুর মাকে খানিকটা রূঢ় ভাষায় কিছু বলতে পেরে সবিতা একটু শান্ত হল অন্তরে।

ছুধ খাওয়াতে বসল মিন্টুকে ঘুম থেকে তুলে।

মিন্টুকে সাজগোজ করিয়ে বারান্দায় দোতলার অন্য ভাড়াটের ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলতে বসিয়ে এল।

রাত শুরু হয় হয়। ঘরে আলো না জ্বালিয়ে চুপ করে টেবিলের ওপর গালে হাত দিয়ে বসে রইল সবিতা। বসে থাকা নিশ্চল স্তব্ধতার মধ্যে সে তখন হারিয়ে যাচ্ছিল এক নৈরাশ্যময় অনুভূতির অতলে।

দরজা ঠেলে কাঁদন ঘরে ঢুকল। ভাল জামা-কাপড় পাল্টে আটপৌরে জামা-পায়জামা পরল সে।

টেবিলের ওপর কনুই রেখে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই প্রশ্ন করল সবিতা,

—কোথায় গেছলি কাঁদন?

—কে? আমি? সিনেমায়।

—চিত্রা?

—সেও।

—ঘরের দরজা আলগা করে গেলি, বিশুর মাকে ডেকে খিলটা দিতে বলতে পারলি না?

কাঁদন সে কথার জবাব দিলে না। যেন কিছুই নয় ব্যাপারটা।

—শোন, এখানে আয় তো কাঁদন।

কাঁদন চেয়ারে গা লাগিয়ে দাঁড়াল।

—একটা কথা খুলে বলবি আমাকে ?

কাঁদন এই আকস্মিক প্রশ্নে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কি কথা ?

—তুই আমাকে এখন কি ভাবিস জানি না! তবে মনে রাখিস কাঁদন, আজও আমার চেয়ে বড় বন্ধু তোর কেউ নেই। আজ হয়তো সে বন্ধুত্বকে তুই মর্যাদা দিস্ না। তবু আমি তোর দিদি। আমাকে খুলে বলবি একটা কথা ? চিত্রাকে তুই ভালবাসিস ? বল।

—না।

—না ? সত্যি বলছিস্ কাঁদন ?

—দিদি, তুমি আমাকে জান। যদি সত্যিই ভালবাসতাম তোমাকে তা জানাবার মতো সৎসাহসও আমার থাকতো।

—তবু বলে রাখছি কাঁদন, কিছু হবার আগে আমায় জানাস। খামখেয়ালি করে কিছু করিসনে। ভালবাসাটা খেয়াল বা খেলার বস্তু নয়। আমার জীবনের সবটাই তুই জানিস্। তা থেকে কিছু শিখবি না ?

—কিন্তু এমন সন্দেহ তোমার মনে এল কেন বল তো ?

সবিতা কিছুক্ষণ থামল। আকাশের প্রাণহীনতার দিকে তাকিয়ে থেকে একটু রুক্ষতা এসে গেল তার কণ্ঠস্বরে।

—তুই জানিস, বিরামের চোখে পড়েছে তোদের মেলামেশার বাড়াবাড়িটা। ওতো মুখ ফুটে কিছু বলে না। আমি ওর মুখ দেখে বুঝতে পারি। ওর অনুমতি ছাড়াই চিত্রাকে এখানে থাকবার জায়গা দিয়েছি আমি। কিছু হলে সে অপমানের ভাগ আমাকেই বইতে হবে।

কাঁদনের গলায় পাল্টা রুক্ষতা।

—বিরামবাবুর চোখে যা বিসদৃশ লাগে তুমিও কি সায় দাও তাতে। বিরামবাবুর চিন্তাধারাটা ফিউডাল। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলা-মেশাকে···

—চুপ কর, চুপ কর কাঁদন। ওসব আমি অনেক শুনেছি। তুই যে রাজনীতি করিস আর অনেক থিয়োরি মুখস্থ করেছিস সে আমি জানি। বিরাম কি ভাবে সে কথা বাদ দে। কিন্তু ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশাকে যে আমি কোনদিন বাঁকা চোখে দেখি নি তার যদি কেউ বড় সাক্ষী থাকে সে তুই। কিন্তু সে মেলা-মেশার সময় রাত্রি নয়।

কাঁদন কথাটার ঠিকমতো অর্থ বুঝতে না পেরে দিদির দিকে বড় চোখে বোবা হয়ে তাকায়।

—কাল রাত্রে চিত্রা তোর কাছে বারান্দায় উঠে যায় নি? অনেক রাত পর্যন্ত হাসাহাসি করিস্ নি তোরা?

আবার সব চুপচাপ। আকাশের গায়ে আলো ছড়িয়েছে কলকাতা। পাশের বাড়িতে রেডিও বাজছে। আর ছোট ছেলে-মেয়েদের জটলা। মিণ্টুর থেকে থেকে নাকি-কান্না। বাকি সব চুপ। সবিতা বসে রইল এক জায়গাতেই মাথায় কয়েকটা চুল নরম আঙুলে টানতে টানতে।

—তোরা চারিদিক থেকে আমাকে ফুরিয়ে দিতে চাস। ফুরিয়েই তো যাবো আমি, কি আছেরে আমার বাঁচার? কে চায় আমাকে?

সবিতা লক্ষ্য করে নি কাঁদন রান্নাঘরে চলে গেছে কখন। সবিতা উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। নীচের চওড়া রাস্তায় ছড়িয়ে গেল তার লম্বা বিকৃত ছায়াটা। রিক্‌শার চাকা আর মানুষ যাকে পায়ের তলায় চেপ্টে চেপ্টে যাওয়া আসা করছিল। চিত্রা ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারে একটা কিছু ঘটেছে। সবিতাদির বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ সে বোঝে। প্রবল কোন মানসিক উত্তেজনাকে সামলাতে হলে বারান্দার রেলিং ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে সবিতাদি।

চিত্রা চোখের ভুরু বাঁকিয়ে নিঃশব্দে প্রশ্ন করে কাঁদনকে, কি

হয়েছে ? কাঁদন মৃদু হেসে বন্ধ ঠোঁটের ওপর তর্জনী ছুঁইয়ে জানায় —চুপ্।

বিশুর মা বোকা হয়ে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে থেকে কড়ার ভাজা আনাজে জল ঢেলে দিল।

কিছুক্ষণ পরে কাঁদন বাইরে বেরিয়ে গেল দরজাটাকে জোরে আছড়ে। তার ক্ষোভ সবিতাকে জানাবার পরোক্ষ কৌশল ঐ শব্দটুকু।

দিদি কেবল নিজেকেই বোঝে। কিন্তু প্রাণবস্তুটা যে দিদির মতো প্রাকৃতিক নিয়মে সকলের মধ্যেই আছে অল্পবিস্তর দিদি সেটা বোঝে না। দিদিকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, কিন্তু দিদির এই যে অহরহ মেলাঙ্কলি—এতে গা ঘিনঘিন করে। আমি জানি দিদির জীবনটা একটা দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু সেই দীর্ঘশ্বাসের ছাটে যারা সুস্থ তাদের পুড়িয়ে মারতে হবে ? এটাকে ইন-হিউম্যানিটি ছাড়া কি বলবো। আসলে এর একটা কারণ আছে। কারণটা কি ? কারণ দিদির জীবনে কোন নির্দিষ্ট ফিলসফি নেই। সেন্টিমেন্টের বীজাণু দিদির প্রত্যেকটি রক্তবিন্দুতে।

কাঁদনের এটা একটা অভ্যেস। চেনা-জানা প্রত্যেক লোককে খুঁটিয়ে সমালোচনা করতে চায় ও। কে কোন্ রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী, কোন্ পরিবারে জন্ম, কি পরিবেশে মানুষ ইত্যাদি ইত্যাদি। কাঁদন যখন এইসব ভাবতে ভাবতে রাধারমণ বসুর গলির বাঁক পেরিয়ে গেল, বারান্দা থেকে সবিতা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তাকে।

এ-জানলা ও-দরজার আলোয় কাঁদনের ছায়াটা ঘন হল, কালো হল, পায়ের তলায় পোষা বেড়ালের মতো তালগোল পাকিয়ে আবার ইঁদুরের মতো স্যাৎ করে মিলিয়ে গেল। মানুষের ছায়া মানুষের চেয়ে কি বিশ্রী। কাঁদনের শরীরটা আগের চেয়ে অনেক ভেঙেছে। সেদিন বলছিল কত পাউণ্ড যেন ওজন কমেছে ওর। কেন কমবে

না? কি খাওয়াই ওকে আমি? যে বয়সে যা খাওয়া উচিত সে তুলনায় কতটুকু খেতে পায়? শুধু আমার উপর নির্ভর করে নিজের জীবনটাকে ধ্বংস করছে ও। এম. এ. শেষ করল না। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবল না, রোদে ঘুরে ঘুরে গাল ছুটোকে ভেঙেছে। কোন কিছুতে এনার্জি নেই। বিরাম আমাকে দোষ দেয়। একটা সক্ষম সুস্থ, স্বাভাবিক ছেলেকে বসে বসে খাওয়ার সুযোগ দিলে সে জীবনে আর কোনদিন সিধে হয়ে হাঁটতে পারবে না। কিন্তু আমি কি ওকে বোঝাই না। তার বেশি আর কি করতে পারি, তাড়িয়ে দিতে পারি না তো। ও আমার নিজের ভাই।

চিত্রা বই নিয়ে পড়তে বসেছে। খেলা ভেঙে গেছে মিণ্টুদের, তাকে একটা ছবির বই দিয়ে ভুলিয়ে সবিতা রাঁধতে গেছে তরকারীটা। বিশুর মা ডাল ভাত ভাজা-ভাতে এসব ভালই রাঁধে কিন্তু ভাল তরকারী কিংবা মাছ মাংসের কিছু হলে রাঁধতে হয় সবিতাকে, নইলে বিরাম অধিকাংশ দিন সেসব মুখে তোলে না। ছবি দেখতে দেখতেই মিণ্টু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে।

সবিতা রান্নাঘর থেকে জবাব দেয়, হয়ে গেল আমার।

রান্না শেষ করে সবিতা মিণ্টুকে কোলের কাছে নিয়ে তক্তপোশে শোয়। স্তনটা একটু মুখে দিতে না দিতেই ঘুম এসে গেল তার। মিণ্টু প্রতিদিনের অভ্যেসমতো ঘুমোবার সময় একটা স্তনকে হাতে ছুঁয়ে থাকে।

সবিতা চুপচাপ শুয়ে রইল। উঠল না, ঘাম-লাগা শাড়ি ব্লাউজটা পাল্টাবার প্রয়োজনে গা-ধুতেও গেল না।

একটু পরেই বিমলা আর রথীন বেড়াতে এল।

—আয়রে আয়। কি ভাগ্য আমার! পথ ভুলে এসে পড়লি বুঝি?

বিমলা আর রথীন ছুজনেই পাশাপাশি বসল তক্তপোশে।

ওদের চোখে পড়ল সবিতার ম্লান চেহারা, উস্কোখুস্কো চুল, কপালে সরু সরু ভাঁজ, জামাকাপড়ে অপরিচ্ছন্নতা।

—তোর শরীর খারাপ না কিরে? কি হয়েছে?

—শরীর খারাপ? কই না তো? কিছুই হয় নি।

সবিতা খুব স্বাভাবিকভাবে হাসবার চেষ্টায় হাসতে হাসতে ভাবলে আমার মনের ভাবনাগুলো কি মুখে দাগ কেটেছে? আর সেই দাগ দেখে ওরা কি বুঝে নিতে পারবে আমার ভাবনাগুলোকে?

সবিতা প্রায় লাফিয়েই উঠে বসল তক্তপোশে। বিমলার শাঁখা চুড়ি ভরা হাতদুটো মুঠোয় জাপটে হ্যাঁচকা টান মারল।

—কিছু যদি হয়ে থাকে তো গায়ে জোর হয়েছে।

—কি জানি, তোকে দেখলে ভয় হয়। তুই যা মেয়ে বাবা। কোন সময়েই বুকের মধ্যে একরাশ দুঃখ ছাড়া বাঁচতে পারিসনে।

—ওঃ, তোরাই বুঝি দুঃখ ছাড়া বেঁচে আছিস পৃথিবীতে। রথীন কি তোকে এত ভালবাসে? আরে ও চশমা নিলে কবে?

সবিতা রথীনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। অনেক মোটা হয়েছে। ভারী হয়েছে চোখ মুখ। অনেক গম্ভীর। আর কেমন যেন প্রাণহীন ভোঁতা। দেখলেই মনে হয় কেরানী।

—চশমা ও অনেকদিন নিয়েছে। আট মাস তো বটে। বেশি হবে, তো কম নয়।

—ইস্, তার মানে প্রায় এক বছর বাদে তোরা এলি?

—দোষটা আমাদেরই বুঝি শুধু? তুই তোর বিরামকে বগল-দাবা করে একদিন যেতে পারতিস না? ঠিকানাটা তোর জানা ছিল জানি।

বিরামের কথায় হাসল সবিতা খলখল করে।

—বিরামকে তোরা কদ্দিন দেখিস নি বলতো? তাকে বগলদাবা করবো আমি। মুটিয়ে হাতি হতে চলেছে সে।

বিমলা খুশিতে গদ্গদ হয়ে যায়।

—বলিস্ কিরে? সেই রোগা ঢ্যাঙা বিরাম হাতি হয়েছে? ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে বিরামকে।

সবিতা রথীনের দিকে আঙুল বাড়ায়।
—ওকেই ভাল করে দেখ, তাহলে বুঝতে পারবি।
সবিতা ভাবে ইউনিভার্সিটির সেই মুখ-চোরা রথীন যাকে অবিরাম ঠাট্টা করার মধ্যে অনাবিল ফুর্তি উপভোগ করা যেত, অসম্ভব রকমের ভালবাসা নিয়েও যে কোন সময়েই যে কোন মেয়েকে মুখ ফুটে ভালবাসা জানাতে পারে নি আবার মেয়েদের সঙ্গ ছাড়া হলেই যাকে মনে হত ডাঙার মাছ, সেই রথীনকে কী আজও তেমন করে রাগানো কাঁদানোর জন্যে ঠাট্টা করা যায়? নাকি সে-সব অতীত বহুদিন আগেই মরে গেছে।
সবিতা রথীনের চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিজের চোখে লাগিয়ে বলে, রথী, একবার হাসো তো দেখি। হাসো না।
রথীন কিছু বুঝতে না পেরে অপ্রতিভ ভাবে হাসতে গিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।
—ছ্যাখ ছ্যাখ বিমলা ঠিক সেই রথীন। ছেলের বাপ হয়েও মেয়েদের সামনে ওর এডালোসেন্ট ভাবটি গেল না।
বিমলা অবাক হয়ে যায় সবিতার ছেলেমানুষি দেখে। ওর মনটা কি সেই হস্টেল লাইফের বেপরোয়া সুরে আজও বাঁধা?
—আচ্ছা সবিতা, তোর বুঝি বয়স বাড়ে নি?
—কিসের বয়স? মরার?
ঠাট্টা করতে গিয়ে মনের গভীর জিজ্ঞাসাই হঠাৎ বেরিয়ে গেছে তার ঠোঁট দিয়ে। কিন্তু কি জানলে ওরা খুশি হয়। কি বললে ওরা কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে বয়সের যন্ত্রণাই আজ আমাকে সমস্ত পৃথিবী থেকে একা করে দিয়েছে। সবিতা লাফিয়ে অন্য প্রসঙ্গে পৌঁছয়।
—জানিস বিমলা, এতদিন পরে এমন একটা সময়ে এলি যে খোকাটা ঘুমোচ্ছে। তোদের বাচ্চাটা কেমন আছে? নিয়ে এলি না কেন?

—ভারী দুষ্টু হয়েছে জানিস্। কিছুতেই মা বলবে না আমাকে।
—সে কি রে?
—হ্যাঁ আমাকে বলে বড় মা। আর কাকিমাকে ডাকে মা। তার কারণ বাড়িতে তো একপাল ছেলে। সকলেই প্রায় আমাকে ডাকে জেঠিমা, বড় মা বলে। ওর সঙ্গে খুব ভাব, বাপের কাছে ঘুমোনো, বাবা বললে তবে খাওয়া, বাবাকে চুমো খাওয়া আমাকে নয়—
ছেলের গল্পে বিমলা থামে না। শুনতে শুনতে ক্লান্তি লাগে সবিতার। রান্নাবান্না, ঘর সংসার, স্বামী পুত্র, এসবের মধ্যেই কি ইহলোকের স্বর্গ গড়ে উঠেছে বিমলার জীবনে? বিমলা মরে গেছে। সবিতার ইচ্ছে করল বিমলাকে জিজ্ঞেস করে দুটো স্মৃতি এখনও সে মনে করতে পারে কিনা। যার নায়িকা বিমলা নিজেই। এক দোলের পরের দিন বেঁটে প্রফেসারের গালে আবীর মাখানো। আর একটা নভেম্বর দিবসের মিটিংএ পুলিসের ব্যাটন কেড়ে নেওয়া। এমনিতে মনে হয় কিছুই স্মরণীয় নয় ঘটনা দুটো। কিন্তু যেদিন ঘটেছিল এবং যে ভাবে ঘটেছিল তার প্রত্যক্ষদর্শীরাই জানে সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে বিমলাকে নিয়ে কি হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। কালো, মোটা, ষণ্ডামার্কা চেহারা নিয়ে বিমলা বক্তৃতা করতো আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে, ছাত্র-সমাজকে বুলেটের মুখে এগিয়ে যাওয়ার উত্তেজনা যোগাতে, একি সেই বিমলা?
সবিতা আড়ে-আড়ে খুঁটিয়ে দেখে বিমলাকে। কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ। হাতে শাঁখা, লোহা আর আটগাছা সোনার চুড়ি এক হাতে; আরেক হাতে শুধু একটা রিস্টওয়াচ। ঘি রঙের সিল্কের শাড়িটা সাদা-মাঠা কিন্তু উজ্জ্বল আর দামী ব্লাউজটা শাড়ির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। ব্লাউজের ফাঁকে গলায় আলো লাগা সাপের খোলশের আঁশের মতো চিক্‌চিক্ করছে হারটা। ইউনিভার্সিটির ছেলে-জ্বালানো বিমলা গৃহস্থ ঘরের নিপুণা গৃহিণী সেজে স্বামীকে আঁচলে বেঁধে বেড়াতে বেরিয়েছে। বিমলা মরে গেছে।

রথীন সকালের কাগজটা টেনে পড়ছিল। সে কাগজ থেকে মুখ তোলে।

—এতটা রাস্তা এলাম, একটু চা খাওয়াবে না সবিতা ?

বিমলা কথাটা সম্পূর্ণ করে।

—হ্যাঁরে, একটু চা খাওয়া, একটা খবর আছে তোকে জানানোর।

সবিতার খেয়াল হল চা করার ব্যাপারে। বিশুর মাকে আগেই জল চাপাতে বলে দেওয়া উচিত ছিল।

শুধু চা নয়। ওরা দুজন অনেক দিন পরে এসেছে, সবিতা চায়ের সঙ্গে সুজিও বানালে বিশুর মাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই পিঁড়ি টেনে বসে।

তিনটে সাদা প্লেটে সুজি আর তিন কাপ চা বিছানার ওপর খবরের কাগজ পেতে তার ওপর রাখল সবিতা। শেষে নিয়ে এল এক গ্লাস করে জল। খানিকটা সুজি ডেলা করে বিশুর মাকেও খেতে দিয়েছে। আরো খানিকটা বাটিতে ঢাকা আছে কাঁদন আর চিত্রার জন্যে।

সবিতা চায়ের কাপে আলতো ঠোঁট ছুঁইয়ে গরম ঠোঁটের ওপর জিভটা বুলিয়ে নিয়ে বললে, হ্যাঁরে, কি নতুন খবর শুনি ? এই, চায়ে চিনি কম হলে কিন্তু বলবি। আমাদের আবার চিনি একটু কম খাওয়া অভ্যেস।

রথীন বললে, লাগবে না।

বিমলা বললে, আমার একটু লাগবে রে।

সবিতা তক্তপোশ থেকে প্রায় নাচের মতো দৌড়ে গেল রান্নাঘরের দিকে, কয়েকটা ধাক্কা খেয়ে চুলের খোঁপা সাপের কুণ্ডলির মতো ঘাড়ের ওপরে দুলতে দুলতে হঠাৎ পিঠ বেয়ে ঝুলে পড়ল নীচের দিকে। একটা খোঁপা আর বেণীর মধ্যে এত তফাত ! এক মুহূর্তে সবিতার বয়স যেন কমপক্ষে পাঁচ কি সাত বছর কমে গেল।

—কই, বল কি খবর ?

—টুনুকে তোর মনে পড়ে তো ?

ঠোঁট থেকে চায়ের কাপটা নামিয়ে সবিতা আত্মহারা আনন্দে লাফিয়ে উঠবে এমনি ঝাঁকুনি তুলল শরীরে।

—ওমা, টুনুকে আমার মনে পড়বে না ? কি বলিস রে তুই ? চার বছর এক হস্টেলে কাটিয়েছি। মাসে কটা দিন ও নিজের বেডে শুতো ? দুজনে গা-জড়াজড়ি করে না শুলে আমাদের ঘুম হত না জানিস ? টুনুর বিয়ের দিন চোখের জল ফেলে যদি কেউ কেঁদে থাকে তো সে আমি। আর তোরা ভাবছিস টুনুকে আমি ভুলে যাব ? বিশ্বাস করবি, টুনুকে আমি যা ভালবাসতাম বিরামকেও কোনদিন তেমন বেসেছি কিনা সন্দেহ।

বিরাম শব্দটা উচ্চারণ করার মুহূর্তে সবিতা একটু থেমেছিল, অন্যমনস্কতায় বিরামের বদলে সুজিত নামটা উচ্চারণ করে ফেলার মারাত্মক ঝোঁক সামলাতে।

—হ্যাঁ, কি হয়েছে টুনুর ?

—আচ্ছা তুই কি জানতিস সুকুমার আর টুনুর মধ্যে কোনরকম হিচ চলছিল।

—না তো।

—টুনু যে মাস সাতেক হল কলকাতা থেকে ওর দেশের বাড়িতে গেছে সেটা জানিস কি ?

—হ্যাঁ, সেটা শুনেছি। কল্যাণ পূর্ণিয়ার এক কলেজে চাকরি পেয়েছে। ও যখন ছুটি-ছাটায় কলকাতায় আসে তখনই ওর কাছ থেকে টুনুর খবর পাই।

—অন্য আর কোন খবর পাস নি ?

—না। কি ধরনের খবর ?

—এই ধর টুনু সুকুমারকে ডিভোর্স করে বাপ মায়ের মনোনীত এক পাত্রকে বিয়ে করে বিলেত যাচ্ছে।

সবিতার বুকের মধ্যে আগুন লাফিয়ে উঠল।

—অসম্ভব, তোরা কি আমায় গল্প শোনাতে এসেছিস বিমলা? কে বলেছে তোকে এইসব আজগুবী কাহিনী বল তো? সুকুমার নাকি?

—না, সুকুমার নয়। সুকুমারের দু-একজন বন্ধু ওর আপিসে কাজ করে। তারাই বলেছে ওকে।

—যেই বলুক বিমলা, আমি বিশ্বাস করি না। কিছুতেই না, তার আগে টুনু মরে যাবে। সুইসাইড করবে, বিষ খাবে। জানিস বিমলা, আমি তাকে বুকে জড়িয়ে হস্টেল লাইফ কাটিয়েছি।

বিমলা রথীন দুজনেই সবিতার ফ্যাকাসে মুখটার দিকে তাকিয়ে আর তার অতিরিক্ত ভাবাতিশয্য দেখে বিমূঢ় হয়। ওরা দুজনেই পরামর্শ দিলে সবিতাকে নিজে চিঠি লিখে সমস্ত ঘটনার সত্যি মিথ্যে জানতে।

বিমলা ও রথীন চলে যাবার পর সেই এক জায়গাতেই বসে রইল। সে যেন হাঁপিয়ে উঠতে চাইছে অত্যধিক শ্লেষ্মা-ঘটিত অসুখে যেমন হয়। অথচ ও রকম কোন অসুখ তার নেই। তাহলে কষ্টটা কোথায়? বুকে? পিঠে? শিরদাঁড়ায়? না পায়ে? চোখে? কোথায়?

কোথাও না। আমার কষ্ট আমার অস্তিত্বে। কেন বেঁচে আছি? কেন পাল্টে যাই নি? বিমলা রথীন এদের সামনে আর কতদিন মুখোশ পরে থাকব? চিত্রা ভীষণ ভয়ে আস্তে আস্তে পাশের ঘরে গিয়ে নরম মৃদু এবং নিরপরাধ গলায় সবিতাকে ডাকে,

—সবিতাদি, গা ধুতে যাবে না? রাত বাড়ছে।

মন্ত্রচালিতের মতো সবিতা উঠে দাঁড়ায়।

দুই

পরের দিন সকালে সবিতার নামে দুখানা চিঠি এল। একটা খাম। আর একটা পোস্টকার্ড।

সবিতার তখন মাথার চুলে তেল, কাঁধে পাট-করা শাড়ি ব্লাউজ। বাথরুমে যাচ্ছিল স্নান করতে।

পোস্টকার্ডটা লিখেছে রমা। মোগলসরাই থেকে। ও কলকাতায় আসছে মাস দুয়েকের মধ্যে। সন্তানবতী। কলকাতা থেকে শ্বশুর শাশুড়ী গিয়ে সাধ খাইয়ে এসেছেন। তার মানে এতদিন পরে রমাকে তাঁরা পুত্রবধ্ হিসেবে সামাজিক মূল্য বা সম্মান দিলেন? নাতি-নাতনীর লোভেই কি? আর সব খবর ভাল। সবিতা অনুভব করে ছোট্ট চিঠিঠার প্রত্যেকটি অক্ষরে রমার জীবনের সুখী সচ্ছল আত্মসন্তোষকে। রমা ওর আরেক বন্ধু। নিশীথ ওকে বিয়ে করেছিল প্রেম করে সংসারত্যাগী হয়ে। রমা মা হবে এতদিনে।

খামটা সুজিতের। সুজিত কি কলকাতায় নেই?

মরা পাখির গা থেকে ছোট ছেলেরা যে ভাবে পালক ছাড়ায়, সবিতা তেমনি করে খামের একটু ছেঁড়া অংশের ভেতর আঙুল চালিয়ে টেনে আনল পুরো চিঠিটা। দ্রুত হল শ্বাস-প্রশ্বাস।

সবিতাদি,

দেশ থেকে বাবার চিঠি পেয়ে হঠাৎ বর্ধমানে চলে আসতে হল। তোমাকে না জানিয়েই। বিকেল চারটের গোমো একস্‌প্রেসে না এলে এখানে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যেত। আমার আকস্মিক অন্তর্ধানে তুমি যে কতটা রেগেছ তা আমি বুঝতে পারি। কলকাতার আকাশে শেষ বসন্তের উজ্জ্বল রোদের আভাস

লেগেছিল। এখানে দিনরাত মেঘলা। বৃষ্টি হচ্ছে কম। কিন্তু মনে হয় সে যদি একবার তার অশ্রুভারাতুর হৃদয়টাকে উপুড় করে দেয় পৃথিবী ভেসে যাবে।

আকাশময় নিজের অন্তরের প্রতিচ্ছবি দেখছি। এখানে এসে ভাবতে পারি না আকাশ সোনার রোদে রঙীন হয় কোথাও। যার নীচে তুমি আছ। কলকাতা থেকে মাত্র ষাট মাইল দূরে এসেও তোমাকে মনে হয় অবিশ্বাস্য স্বপ্নের মতো। তুমি আমাকে ভাল-বাসো এই সত্যটুকুও অসম্ভব ঠেকে। আমার চোখের তারার নির্জন অন্ধকার ভেদ করে বিদ্যুৎ-শিখার মতো প্রতি মুহূর্তে তুমি যাচ্ছ আসছ! তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। বার বার অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা কবিতার টুকরো লাইন মুখে আবৃত্তি আর মনে গান হয়ে আমার বেদনাকে দ্বিগুণ করে তুলছে। অমিয় চক্রবর্তীর লেখা লাইনটা। —'কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।'

না, থাক, এসব কথা। আমার একান্ত আপন ও গোপন বেদনাকে চিরকাল তোমার অগোচরেই রাখবো। তোমাকে সুখী করা, বন্ধুত্ব দানের অমেয় আনন্দে ভরিয়ে রাখাই আমার জীবনের ব্রত। যতদিন বাঁচবো এ দায়িত্ব পালন করবো আমি। হয়তো ভবিষ্যৎকালে জীবনের অন্য নানা রূপান্তর ঘটবে। তবু তুমি জেনো সবিতাদি, অনন্তকাল তুমি আমার আত্মার আত্মীয়ই থাকবে।

আরো অনেক কথা তোমাকে বলতে সাধ যায়। মনে আমার কথার সমুদ্র। মুখে কয়েকটা বুদ্বুদ। আমার জীবন এখন একটা বিরাট দ্বন্দ্বের মুখোমুখি। তোমাকে সে কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছি। তোমাদের মতো শিক্ষিত মার্জিত বুদ্ধির কাছে যা অন্যায়, প্রচণ্ডতম অপরাধ, ঘৃণ্য সংস্কার, আমাদের সংসারে তাই অনিবার্যভাবে ঘটতে চলেছে। আমি নিজে উপার্জনক্ষম নই। আমার প্রতিবাদ তাই সামাজিক মূল্য বা সাবালকের মতামতের গুরুত্ব পাবে না। অন্যায়কে নীরবে সহ্য করার গ্লানি বহন করতে হচ্ছে তাই প্রতি পলে পলে।

আর কেউ বুঝবে না কিন্তু তুমি আমাকে বুঝবে বলেই তোমাকে অকপটে জানাতে আমার সংকোচ নেই।

আমার ছোট বোনের বয়স মাত্র বারো বছর। গড়নটা বাড়নসার বলেই চোদ্দর মতো দেখায়। বাবা হঠাৎ এক উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পেয়ে তার বিয়ের ব্যবস্থা করছেন। আমাদের সাংসারিক অর্থাভাবের দিক দিয়ে বিচার করলে এটা নাকি একটা মস্ত সুযোগ। কেননা পাত্রপক্ষের দাবি-দাওয়ার ফাঁসটা অনেক আলগা। পাত্রের বাবা বর্ধমান শহরে বিরাট মনোহারী দোকানের মালিক। ছেলেটি এ বছর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে। পাত্রের বাপ কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে নিজের থেকেই প্রস্তাব করেছেন।

আমার এক এক সময় ভাবতে অবাক লাগে সবিতাদি, আমি এই বাড়িতে জন্মালাম কি করে? সমাজ ও শিক্ষার তারতম্য কি এত শক্তিশালী যে পিতা ও পুত্রের চেতনায় এমন একটা যুগের ব্যবধান গড়ে তুলতে পারে? বিয়েটা এখানে একটা প্রথা। নির্বিবাদ আনুগত্যই প্রেম। ভালবাসা ললাটের লিখন। অথচ এইই চলে আসছে। ভালবাসার অভাবে আমার মাকে কখনও হাহাকার করতে শুনি নি। আমার বড় বৌদির আপাতত পাঁচটি সন্তান। তার মুখে জীবনের ক্লান্তি কিংবা বৈরাগ্য আঁচড় কাটে নি তো। এরা তো সুখী। এরা তো জীবনের বঞ্চনায় পীড়িত নয়। আমি জানি আমার বোনও সুখী হবে। ওদের দুজনের বিপুল অপরিচয়ের ব্যবধান এক নিমেষে দূর হয়ে যাবে পুরোহিতের মন্ত্রে, শাঁখের শব্দে, হলুদ কষানো শাড়ির গন্ধে আর রাত্রির নগ্ন অন্ধকারের আত্মসমর্পণে। তাহলে তোমার আমার জন্ম হয় কেন পৃথিবীতে? দেহাতীত অন্য কোন ঐশ্বর্যকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় তুমি জীবন বিদীর্ণ করে হাহাকার কর সবিতাদি? আমি কেন সাড়া দিয়ে তৃপ্ত হই সেই ডাকে যা তোমার দেহের অন্ধকার কন্দরের আদিম আহ্বান নয়, মুক্তির পিপাসা। তাহলে কি পৃথিবীতে ভালবাসার চরিত্র

ছু-রকম। শিক্ষিতের কাছে তা অন্তরের সমস্যা। অশিক্ষিতের কাছে দেহের অভ্যাস।

থাক থাক, কপালের রগ দুটো জ্বালা করছে। কেন তোমাকে বিচলিত করলাম এ চিঠি লিখে। অথচ জানো সবিতাদি, প্রায় তিনটে অসম্পূর্ণ চিঠি ছিঁড়েছি ইতিমধ্যে। রাত হয়েছে। খেতে যাবার তাড়া এসেছে। আজকের মতো এইখানেই যবনিকা পতন হোক তোমার আমার নিভৃত আলাপচারিতে।

কবে কলকাতায় যাব ঠিক নেই। আগামী কাল প্রাতঃকালে হুগলী রওনা হতে হবে পাত্রকে আশীর্বাদ করতে।

তুমি আমার শ্রদ্ধা নিও।

ইতি

তোমার

সু

সবিতা আবার ঘরে ঢুকতেই চিত্রা জিজ্ঞেস করলে, কার চিঠি ?

—রমার।

—দুটো যে।

—আরেকটা সুজিতের।

সবিতা সুজিতের নামটা উচ্চারণ করল বেশ জোর দিয়ে। এটা যে গোপন রাখার মতো কোন ঘটনা নয় তা যাতে সবাই বুঝতে পারে। সবাই অর্থে আসলে একা বিরাম। সবিতা সুজিতের চিঠিখানা নিজের সুটকেসে রেখে রমার পোস্টকার্ডটা বিরামের মুখের দিকে এগিয়ে দিল। বিরামের সারা মুখে তখন সাদা সাবানের ফেনা।

—রমা চিঠি লিখেছে। ওর বাচ্চা হবে। কি রকম খুশি হয়ে লিখেছে দেখ।

বিরাম চিঠিটার দিকে তাকাল কেবল। পড়ল না।

যেন দাড়ি-কামানো শেষ হলে বিরাম পড়বে বা পড়তে পারে এই ভেবে পোস্টকার্ডটা তার সামনে ফেলে রেখে সবিতা স্নানে চলে গেল।

চৌবাচ্চার সবুজ রঙের জল আর সাবানের সাদা ফেনার স্পর্শে সবিতার শরীর শুধু নয়, মনও পরিচ্ছন্ন প্রশান্ত হয়ে উঠল। চকচকে শুভ্র মুখে আর কপালের ওপরের দু-একটা চুলে শিশির বা মুক্তোর মতো কয়েকটি জলের বিন্দু। চিত্রা সেদিকে বোকার মতো আচমকা এমনভাবে তাকাল যেন সবিতাকে সে দেখল এই প্রথম। চিত্রার বিস্ময় অকারণ বা অহেতুক নয়। গত তিন-চার দিন ধরে সে সবিতাকে দেখছে শুকনো, মনমরা, সহজে রেগে ওঠার মতো খিটখিটে, একা-একা, অন্যমনা। কোথাও কোন কিছুর সঙ্গে যোগ নেই। এমন কি একটু আগে কাঁধে তোয়ালে, সায়া, ব্লাউজ, শাড়ি জড়িয়ে সবিতা সিঁড়ি ভেঙে নীচে গেল যখন তখনও তার মুখে বা চোখের কোণে বা চলার ছন্দে একটা বিষন্ন ক্লান্তির ছাপ লেগেছিল। কিন্তু বাথরুম থেকে স্নান সেরে সবিতা যেন তার ছদ্মবেশ খুলে এল। ম্যাজিকের কৌশলে হঠাৎ অপরূপ হয়ে গেছে সে। যদিও সত্যিকারের ম্যাজিকটা কি ভাবে ঘটল সেটা বোঝার বয়স চিত্রা বহুদিন পেয়েছে। সুজিতের চিঠিখানা পৌঁছতে আর একবেলা দেরি হলে শুধু সাবান মেখে সবিতা এক সুন্দরী হয়ে উঠতে পারতো কিনা চিত্রার মনে সেই রকম প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছিল।

চিত্রার তাকানো দেখেই সবিতা বুঝেছিল চিত্রা তার মানসিক উচ্ছ্বলতার কারণটা ধরে ফেলেছে। হয়তো ইচ্ছে করলে নিজেকে স্বাভাবিক রাখা যায়। গত তিন-চার দিন মনের উপর দিয়ে যে সব ফাঁকা ফাঁপা দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, আর নিঃসঙ্গতার চাপা ঝড় বয়ে গেছে তাকে সে নিজের মধ্যে সংহত করে রেখেছিল। সুজিতের চিঠির কাটাকুটিহীন অক্ষরগুলো আবার দমকা হওয়ার মতো তাকে যে অসম্ভব খুশি হওয়ার, উচ্ছল, তরল হওয়ার প্রেরণা এনে দিল তাকেও সংহত করা যায়। কিন্তু সবিতা সে চেষ্টা করল না। অসুস্থ রুগী চেঞ্জে এসে শীতের সবটুকু হাওয়া শরীর দিয়ে যেভাবে শুষে নিতে চায়, সবিতা তার মনের ভেতরে ফেনিয়ে ওঠা আকস্মিক

আনন্দকে তেমনি উপভোগ করতে চাইল শরীরের আন্দোলন দিয়ে। তার চলায়-বলায়, খেতে বসার ভঙ্গিতে, মিণ্টুকে অগুন্তি চুমো খাওয়ার আদরে, মোলায়েম কণ্ঠস্বরে সকলের সঙ্গে বেশি কথা বলার আগ্রহে একটা নতুন ছন্দ। স্কুলে বেরুবার সময়টা ঘড়ির কাঁটায় পার হয়ে যাচ্ছে দেখেও সে অনর্থকভাবে কিছু তৈরি-করা বে-কাজে ছুটোছুটি শুরু করে দিল।

মিণ্টুর ময়লা ইজের জামা আর একটা-তুটো বালিশের ওয়াড় গোল্লা পাকিয়ে রান্নাঘরের চৌকাঠের সামনে রেখে বললে, বিশুর মা, চান করার সময় এগুলো মনে করে কেচে দিও। এ্যা! সাবান আছে তো? মিণ্টুর আর সব জামা নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলো না কাচলে ওর বিকেলে কিছু পরার নেই।

চিত্রা বীজগণিতের একটা সিমপ্লিফিকেশন নিয়ে তু-ঘণ্টা মাথা ঘামাচ্ছে। সবিতা তার পিঠে হাত রেখে বসল। চোখের দিকে তাকিয়ে অকারণে হাসল।

—অঙ্ক? পারছিস না?

সবিতা হুড়হুড় করে অঙ্কটা কষে দিলে।

—একটা কাজ করতে হবে যে চিত্রা?

—কি?

—তুপুরে তো পড়িস না, ঘুমোসও না। তাইতো? শুধু যে আড্ডা চলে তা আমি জানি। আজকে তুপুরে তাকগুলো ভাল করে ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করতে পারবি? কতদিন ধরে ভাবছি। মেজাজ পাই না ঠিকমতো।

চিত্রা উৎসাহ দেখাল প্রত্যাশার চেয়ে বেশি। কাল বিকেল থেকে সবিতার সঙ্গে তার ভাল করে কথা হয় নি। আজ সকাল থেকে সে নানা ছুতো আবিষ্কার করেছে যাতে কথা বলাটা শুরু করা যায় সহজে। এই গোটা বাড়িটার মধ্যে একটি মানুষই জ্যান্ত। সে ঐ সবিতাদি। তাকে মন-মরা বা শুকনো দেখলে

চিত্রার পৃথিবীকে বিস্বাদ বিবর্ণ বীজগণিতের অঙ্কের মতো রূঢ় বলে মনে হয়।

সবিতার তাক-মোছার প্রস্তাবে চিত্রা বললে, দুপুরে কেন সবিতাদি, চান করার সময়েই করে দেব। গায়ে তো ময়লা ঝুল এসব লাগবে, চান করার আগে করাই ভাল।

সবিতা বিরামের কাছে এসে দাঁড়াল। বিরাম তখন কিছু লিখছিল সাদা কাগজে। দ্রুত বেগোচ্ছল অক্ষরগুলো সাদা কাগজের পরিচ্ছন্নতাকে সেনাবাহিনীর মতো ক্রমশ দখল করে চলেছে। লেখার মধ্যে অজস্র কাটাকুটির নোংরামি দেখেই কি একথা মনে হল সবিতার? নাকি এটা ঈর্ষা। বা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের মনোভাব? সুজিতের চিঠিখানায় এমনি কাটাকুটি থাকলে সবিতার মাথায় কি সেনাবাহিনীর তুলনাটা আসতো?

—এই শোনো।

সবিতা কচি মেয়ের মতো গলায় ডাকল।

বিরাম মুখটা একটু তুলেই আবার নামিয়ে নিল।

—বলো।

—না। শোনো না। মুখের দিকে তাকাবে তো।

সবিতা নিজেই বিরামের চিবুক ধরে মুখটাকে ওপরে তুলল। খানিকটা বিরক্তি সত্ত্বেও বিরাম স্বাভাবিকভাবে কথা বললে।

—কি হল?

—তাকাতে পারছো না যে মুখের দিকে? সেজে-গুজে কি রকম সুন্দর হয়েছি দেখাতে এলাম। কি রকম লাগছে?

—ট্রয় পুড়ে যাবে।

বিনা আবেগে সহজ সরল স্বাভাবিক একটা উত্তর। তবু উত্তরের অর্থ নয়, উত্তরের ভঙ্গিটাই খুশি করল তাকে। এইভাবেই বিরাম কথা বলতো। বুদ্ধিদীপ্ত টুকরো টুকরো কথা, আর এই সব কথা বলার সময় সবিতার চোখে বিরামের মুখটা উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত

হয়ে উঠতো মিষ্টি হাসিতে। সে হাসি সবিতার বরাতে খুব কমই জোটে আজকাল।

হয়তো সেই জন্যেই সবিতার গলার স্বরে ভালবাসার কাঁপুনি এল। বিরামের অনাবৃত ধবধবে ঘাড়ের ওপর মৃদু আঙুল ছুঁইয়ে আবার ডাকে, শোনো।

বিরাম এবার না হেসে তাকায় কেবল।

—আমি আর দাঁড়াবো না। বেশ দেরি করেছি। তোমার জন্যে পটল ভাজা করেছি আর মুসুরির ডাল। পয়সা কুলুলো না, তাই মাছ আনা হয় নি, আর শোনো, তোমার জামা-কাপড় ময়লা হয়েছে। এগুলো আজ ছেড়ে যেও। বিকেলে কাঁদন লণ্ড্রীতে দিয়ে আসবে। ট্রাঙ্কের ওপর তোমার নতুন জামা-কাপড় আছে। নিও। আমি চলি তাহলে, কেমন?

বিরামের এলোমেলো কালো নরম চুলগুলোকে তরল আঙুলে ঘেঁটে দিয়ে সবিতা দ্রুত হয়ে ওঠে দেরি হওয়া বাঁচাতে। মিণ্টু সবিতার এঁটো থালায় বসে কিছু খাচ্ছিল। সবিতা ঝুঁকে পড়ে তার মাথার চুলে একটা চুমো খেলে।

—মিণ্টু। ওঠো। আর খেতে নেই। বিশুর মা এর মুখটা ধুইয়ে দাও তো।

সিঁড়ির প্রায় শেষ ধাপে এসে মনে পড়ে সুজিতের চিঠির কথা। তখন এক ঝট্‌কায় পড়তে হয়েছে। হয়তো গভীর কোন তাৎপর্য চোখ এড়িয়ে গেছে মনের অন্যমনস্কতায়।

সবিতাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বিরাম পিছু ফেরে।

—ফিরলে যে আবার?

—স্কুলের একটা দরকারী কাগজ ফেলে যাচ্ছিলুম।

গলির বাঁকে কাঁদনের সঙ্গে দেখা। অসম্ভব রকম দেরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বুকে নিয়েও কাঁদনকে দেখে সবিতার চলা থেমে যায়।

কমাথা শুকনো ঘাঁটা জঞ্জালের মতো চুল। রুখু রুখু চোয়াড়ে মুখ। ময়লা পাৎলুন। গালে খসখসে বিশ্রী না-কামানো গোঁফ দাড়ি। কাঁদন বড় একা। ও যেন সব সময়েই কিছু হারাচ্ছে।

—কাঁদন খুব রেগে আছিস আমার ওপর, না ?

কিছু না ভেবেই বলে ফেলে সবিতা।

—কিছু বললেই তোরা রেগে যাস কাঁদন। তুই এত জানিস, এত বুঝিস আর আমাকে বুঝিসনে। আমাকে তোরা বুঝতে চাসনে কেন ?

কাঁদন কোন জবাব দেয় না। পায়ের বুড়ো আঙুলের বড় নখটা রাস্তার পাথরে ঘষতে থাকে।

—শোন, আমার স্যুটকেসে তিন-চারটে কাপড়ের নীচে একটা টাকা আছে—নিস্। কি খাতা কিনবি বলছিলি না ? সামনের মাসে আমার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে একটা জামা করাস। এটা তো ছিঁড়েছে। যা, বাড়িতে গিয়ে চান করে নে তাড়াতাড়ি।

সবিতা চলে যাওয়ার পরও কিছুটা সময় কাঁদনের চোখে লেগে থাকে সবিতার মুখের কিংবা মনের সতেজ প্রসন্নতা।

কাঁদনের সব গুলিয়ে গেল, কাল রাত থেকে যত কিছু মনের মধ্যে গুছিয়ে তুলেছিল সে। কাল রাত থেকে একটা ঘৃণার পাহাড় একটু একটু করে মাথা তুলেছিল কাঁদনের চেতনায়। নিজেকে সে প্রস্তুত করছিল একটা কবিতার জন্যে। ঘৃণার কবিতা। সমস্ত কিছুর ওপর বিদ্বেষ-বিরক্তি জমিয়ে তোলার কবিতা। শব্দের ছন্দের বক্তব্যের পরস্পর-বিরোধী অসঙ্গতি ঘটিয়ে আধুনিক জীবনকে কেন্দ্র করে আধুনিক কবিতা।

অসঙ্গতি। কথাটা শুনতে বেখাপ্পা লাগে। বয়স্ক-মাথাদের ভুরু কুঁচকে ওঠার মতো একটা শব্দ বটে। কিন্তু এটা শব্দ নয়। প্রতীক। আধুনিক জীবন, আধুনিক সভ্যতা, আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক সাহিত্য, সব কিছুই অসঙ্গতির উপাদানে গড়ে উঠেছে।

এই কলকাতা শহরটা আধুনিক। এর মধ্যেও অসঙ্গতি একাকার হয়ে আছে। শহরের সেরা রাজপথে অতি-আধুনিক বুইকের পাশাপাশি মোষে-টানা গাড়ির অসঙ্গতিটাকেও একটা প্রতীক বলে মনে হয়। বাইরে গতি ভেতরে মন্থরতা এইটেই কি এ-যুগের চরিত্র নয়? এই বাড়িটাও আধুনিক। এর মধ্যেও তাই অসঙ্গতির অন্ধকার কোণে কোণে ছেয়ে আছে।

দিদির সঙ্গে বিরামবাবুর কি মিল? দিদির সঙ্গে আমারই বা কি? আমার সঙ্গে বিরামবাবুর? আমার সঙ্গে চিত্রারই বা সম্পর্ক কি? আর দিদির সঙ্গে সুজিতের?

কাঁদনের চিন্তাটা থমকে গেল একটু।

দিদি ওকে ভালবাসে। জীবনে অনেক ব্যর্থতার পর সুজিতকে পেয়ে দিদি ভেবেছে সুজিত ওকে বাঁচাবে। এটা এক রকমের বিশ্বাস। প্রবল নৈরাশ্যের উপলব্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে বিশ্বাসের ওষুধ। কিন্তু আমি জানি এ বিশ্বাস বেশিদিন টিকবে না। দিদির জীবনে কোন নির্ভরশীল ভূমিকা নেওয়ার মতো ক্ষমতা সুজিতের নেই। দিদি সমাজকে ভাঙতে চায়। কিন্তু সমাজের পাল্টা-আক্রমণকে প্রতিরোধ করার মতো তীব্র একাগ্র আত্মনির্ভরতার কি গড়ে তুলেছে মনে? সমাজ যেদিন ওদের ভালবাসাকে অস্বীকার করবে, সেদিন সমাজকে অস্বীকার করার মতো স্পর্ধা ওদের বুকের পাটায় ফুলে উঠবে কি? তবু এও সত্যি সুজিত নইলে দিদি মরে যেতো। বিরামবাবুর নির্বিকার প্রাণহীনতা আর দিদির অবিরাম আত্মকেন্দ্রিক বিক্ষোভে এই বাড়িটা কিছুদিন আগে নরকের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে উঠেছিল। সুজিতের আবির্ভাবে বাড়িটা স্বর্গ না হয়ে উঠলেও নরক হয়ে ওঠার অনেক উপসর্গ দূর হয়েছে। দিদি খানিকটা বাঁচতে শিখেছে।

সেফটি রেজারের কৌটায় দাড়ি কামানোর যন্ত্রপাতিগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে কাঁদনের নিজেকে বেশ খুশি খুশি মনে হল।

অন্যমনস্কতার ফলে দাড়ির কয়েকটা জায়গা কেটেছে, জ্বালা করছে। রক্তপাত সত্ত্বেও বেখাপ্পা মুখের চেহারাটা পাল্টে মানুষের মতো সুশ্রী মাজাঘষা হয়ে উঠেছে বলে নয়।

বিরাম আপিসে চলে গেছে খেয়েদেয়ে। চিত্রারও খাওয়া হয়ে গেছে। সামনে পরীক্ষা। তাই স্কুল-কামাই।

মিণ্টু ঘুমোচ্ছে। প্রতিদিনই এই সময় বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যায়। পাশের বাড়িতে অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে শুনেও কাঁদন বারান্দা থেকে ওঠে না। রোদের জ্বালার ভেতরে আরও কিছুক্ষণ বসে মনের জ্বালায় আরও কিছু ভাববার মনোভাব তাকে উৎসাহ যোগায়।

চিত্রা এসে বকুনি দেয়।

—কাঁদনদা, খাবে না ? বিশুর মা রেগে যাচ্ছে। কেন মিছিমিছি বেলা বাড়াচ্ছো বল তো ?

চিত্রা কাঁদনের সামনে থেকে সেফটি রেজারের বাক্সটা তুলে ঘরে রেখে আসে। ভাঙা চায়ের কাপে কুচিকুচি চুল আর সাবানের ফেনা মাখানো জলটা ঢেলে দেয় বারান্দার কোণের গর্তে। গামছা তেল এনে কাঁদনের সামনে জড়ো করে।

—মাখিয়ে দোব ?

—তোমার খাওয়া হয়ে গেছে ?

—আজ্ঞে বাবু, অনেকক্ষণ। আপনি উঠুন তো মশায়।

—কেন এত তাড়াতাড়ি খাওয়া হল কেন ?

—খিদে পেল তাই। আপনি তো দার্শনিকের মতো বিশ্বজগৎ ভুলে এতক্ষণ বিশ্বজোড়া ভাবনা ভাবছিলেন। ওদিকে আমার গা-হাত ব্যথা হয়ে গেল জিনিস নাড়তে-সরাতে। সামনের ঘরটা কি রকম গুছিয়ে সাফ করেছি সেদিকে চোখ আছে কি ? চান করার সঙ্গে সঙ্গেই খিদে পেয়ে গেল, তাই খেয়ে নিলাম। উঠবে কি ?

—টেনে তোল।

—না, টানতে হবে না। বোস, তেলটা মাখিয়ে দিই। সবিতাদি কাল তোমায় কেন বকেছিল, কাঁদনদা ?

চিত্রা হঠাৎ আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করে।

—আমাকে ? কই না তো ?

—না তো ! তাহলে মুখ গোমড়া করেছিলে কেন ? বল না।

—তোমার সঙ্গে বেশি মাখামাখি হচ্ছে, দিদির অভিযোগ।

—সত্যি ? ঠিক করে বল না।

—কেন, কথাটা কি মিথ্যে ?

চিত্রার গালে একটা টোকা মেরে কাঁদন নাইতে ওঠে।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে কাঁদন গায়ে জামা চড়িয়ে নীচে যায়।

সবিতার বাক্স থেকে একটা টাকা যথাসময়ে সে নিজের পকেটে ভরে নিয়েছে। খাতা কেনার টাকাটা ভাঙিয়ে সে একটা সিগারেট কেনে। প্রায়ই সে চেনাজানাদের লুকিয়ে নানাভাবে সিগারেট খায় আজকাল। খাওয়ার চেয়ে সিগারেটটা হাতে ধরতে পারার মধ্যেই কেমন একটা বোমাঞ্চ আছে, রোমাঞ্চকর তৃপ্তি। যত তাড়াতাড়ি সিগারেট ধরা যায় তত তাড়াতাড়িই যেন শরীরে মনে সাবালকত্বের স্পন্দন ছড়ায়। ঠিক ঐ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মায়েদের কোমর পর্যন্ত বেড়ে উঠেই মেয়েরা ছটফট করে কোমরে শাড়ি জড়াতে।

মেঝেয় বিছানা পেতে জামা খুলে শুয়ে তারপর সিগারেটটা ধরাল কাঁদন। বালিশের পাশে রাখা ছিল রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'। গত কয়েকদিন ধরে সে ওটা পড়ছে। আর একটু এগোলেই শেষ হয়ে যায়। অথচ সকাল পর্যন্ত তার পরিকল্পনা ছিল দুপুরে রাত্রের ভাবা কবিতাটা শেষ করবে। কিন্তু দিদির আকস্মিক স্নেহপ্রবণতার উত্তাপে তার মনের জমাট-বাঁধা বিরুদ্ধাচরণের নেশা গলে গেছে।

কাঁদনের ডানদিকের জানলার পাল্লার ফাঁক দিয়ে রোদের ফালি

ঘরের মেঝেয় একটা মাঝারি সাইজের কাঁসার থালার মতো আকৃতি এঁকেছিল। কাঁদনের সিগারেটের ধোঁয়া রোদের স্পর্শে এসে নাচের ভঙ্গিতে রঙিন আর আঁকাবাঁকা হয়ে যায়। বাকি চারপাশ স্থির। রেডিওটা বন্ধ হয়ে গেছে পাশের বাড়িতে রাগ-প্রধান গানের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে। রান্নাঘরে এঁটো বাসনের ওপর দিয়ে দু-একটা ইঁদুর ত্রস্ত পায়ে ছোটাছুটি করছে হয়তো। সারা দুপুর কোথায় যেন জল ঝরার শব্দ হয়। সারা দুপুর কাছে দূরে মেয়েরা কি সব কথা বলে, হাসে, শোনা যায় না, সমস্ত মিলে যেন একটা ভোমরার গুনগুনোনি। বেশ লাগে।

সিগারেটটা শেষ করে তার দগ্ধাংশ ও ছাই সবসুদ্ধ জানলার বাইরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে কাঁদন 'যোগাযোগ' নিয়ে শুল।

চিত্রা কিছুতেই পড়তে পারছিল না। কি নিয়ে সবিতাদি বকাবকি করেছে তার বিস্তৃত বিবরণ না জানা পর্যন্ত।

জল খাওয়ার ছল করে চিত্রা চেয়ার ছেড়ে উঠে এক গ্লাস জল কুঁজো থেকে গড়িয়ে খেল। তারপর কাঁদনের বিছানার কোণে বসে পড়ল।

—সত্যি করে বল কাঁদনদা, কি হয়েছে।

—দাঁড়াও বলছি, এই চ্যাপটারটা শেষ করে নিই।

কাঁদনের বুকের কালো লোমের দিকে তাকিয়ে থাকে চিত্রা। তার চোখে পড়ে কাঁদনের সীমের মতো চ্যাপটা নাক। আর ছোট্ট কপাল। পুরুষমানুষের কপাল বড় হওয়াই ভাল।

—কই বল।

—পরশু রাত্রে তুমি বারান্দায় উঠে গিয়েছিলে সেটা বিরামবাবু টের পেয়েছেন।

—সবিতাদি কি বললে ?

—কি বলবে আবার। যা বলতে হয়, সব গুরুজনেরা যা বলে, তাই বললে। চাণক্যের শ্লোক আওড়ালে।

সব কিছুর মধ্যেই কাঁদনের একটা বেপরোয়া ভাব আছে। কিন্তু চিত্রা এই ভেবে ভয় পায় যে এ সব ব্যাপারে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ওপরেই নজর আর শাসন কড়া হয়ে থাকে। সবিতাদি মুখে কড়া কথা বললেও মনে ক্ষমা করবে। কিন্তু বিরামবাবুর নীরব উপেক্ষা কিংবা বিরূপ মনোভাবের কাছে ক্ষমা পাওয়ার প্রশ্ন অবাস্তব।

চিত্রা পড়াব টেবিলে এসে পড়ায় মনোযোগ দেয়। পড়ার মধ্যেই তার বেশি মনোযোগ পড়ে কাঁদনের সঙ্গে ভবিষ্যৎ মেলামেশার বিধি-নিষেধ ও কড়াকড়িব খসড়া রচনায়।

কাঁদন পড়তে পড়তে এক সময় পাশ ফিরে শোয়। খানিক পরেই তার নাক ডাকে। চিত্রার বিশ্রী রকম অসহ্য লাগে এই নাক ডাকা। নাকে দেশলায়ের কাঠির সুড়সুড়ি দিয়ে [illegible]য়িকভাবে নাক ডাকা থামানোর কায়দাটা অন্য দিনের মতো আজও চিত্রার মাথায় এ[illegible] কিন্তু কাজে খা[illegible]না।

দুপুরে[illegible]ত্রার বই খাতা[illegible]র দিয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে গেল রাস্তায়, যেখানে বিকেলের জলের জন্যে টিউবওয়েলের কাছে সারবন্দী বালতিগুলোর মুখ হাঁ হয়ে থাকে।

প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভেঙে চোখের পাতা রগড়াতে রগড়াতে কাঁদনের চোখে পড়ল মিণ্টু তাকে ঠেলা মারছে।

—ও মামা, ওতো না, ওতো।

সবিতা মিণ্টুর পাশে একটা হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে হাতের আঙুলে মাথার সরু চুল পাকাতে পাকাতে কি যেন ভাবছে। কাঁদন দু-হাতের চেটোয় চোখ রগড়ে উঠে বসল।

—তোর হয়েছে কিরে কাঁদন? এত ঘুমোচ্ছিস? কখন থেকে ডাকছি। কটা বেজেছে জানিস? সাড়ে পাঁচটা বাজে। চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। নে মুখ ধুয়ে আয়।

গভীর ঘুমে গলার স্বরটাও মাথার মতো ভারী ভরাট হয়ে গেছে।

—আলো জ্বাললে কখন?

—এই তো কিছুক্ষণ।

—কিছুক্ষণ! আশ্চর্য!

—কি আশ্চর্য রে।

—দাঁড়াও বলছি।

বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে এসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কাঁদন বলে, একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলাম।

সবিতা কাঁদনের দিকে তাকায়। তার চোখে উৎসাহ বা আগ্রহের কোন চিহ্ন ফোটে না।

—কাল রাত্রে যখন 'যোগাযোগ'টা পড়ছিলাম তখন তুমি টুনুদির গল্প করছিলে। আমি স্বপ্নে টুনুদিকে দেখলাম। পোয়াতি হয়েছে। তাকে দেখতে হয়েছে কুমুদিনীর মতো। মধুসূদনবাবু গড়গড়া টানছেন ঘরের এক কোণে। টুনুদি তাকে লুকিয়ে সেতারের তারগুলো ছিঁড়ে গলায় জড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে মরে গেল।

কাঁদন কয়েকটা দৃশ্য কেটে বাদ দিলে তার স্বপ্নদর্শন থেকে। যেমন কুমুদিনীর মুখের সঙ্গে সবিতার মুখের সাদৃশ্যের দৃশ্যটা।

—স্বপ্নটা বড় আশ্চর্যের না দিদি?

কাঁদন বোকার মতো জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ। ফ্রয়েড বলে: সব স্বপ্নেরই কার্য-কারণ আছে। আমি একটু-আধটু পড়েছিলাম ফ্রয়েড। বেশ ভাল লাগত।

—ঠিক ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতো।

—তুই ঠাট্টা করছিস?

—এটা ঠাট্টা হল? ফ্রয়েড আর ডিটেকটিভ উপন্যাস এক জাতের নয় বলছো? দেখ, ফ্রয়েড বাতিল হয়ে গেছে বহুদিন। কবে থেকে জান? যেদিন থেকে মানুষ মার্কসবাদকে পেয়েছে। মানুষের মন যে শুধু যৌনচেতনা বা কামোত্তেজনার ক্রীতদাস নয় এটা তুমি,

তুমি কেন, কেউ অস্বীকার করতে পারে? আসলে মনটা কি? মনও একটা ম্যাটার। এনভায়রনমেণ্টের ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রমবিবর্তন···

বেশ একটা তর্ক করার নেশা কাঁদনের চোখে মুখে স্পষ্ট হতে দেখে সবিতা বারান্দায় উঠে যায়।

ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ বুঝতে পারি। মার্কসবাদের মনের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বুঝতে পারি। কিন্তু আমি আমার মনকে বুঝি না। ঠিক এই মুহূর্তে আমার চোখে কান্না এলে খুশি হই। কিন্তু কেন কাঁদলাম তার কৈফিয়ত কাউকেই দিতে পারবো না। মনের প্রসঙ্গে অনেক আজে-বাজে ভাবনায় সবিতার মন-ছেয়ে গেল।

বারান্দাটা টলে আড় হয়ে গেলে কেমন হয়? নীচে গড়িয়ে পড়বো, মুখটা বিকৃত বীভৎস হয়ে যাবে। প্রচুর রক্তক্ষয়ের অবসাদে ঝিমিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে শরীরটা। শরীরে আর চেতনা নেই। সারা জীবনের স্মৃতির ভার, সারা জীবনের অভিজ্ঞতার জ্বালা, সুখ-দুঃখের, পাপ-পুণ্যের বিচার বোধ, সব কিছুই অদৃশ্য পথে অসীম শূন্যে ছায়ায় অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। কোন্‌টা সুখের? সেটা না এটা? এই প্রতিদিনের দ্বন্দ্বে নিজেকে ভাঙা-গড়া বাঁচা-মরা। সুজিতের ভাল-বাসাকে কেন্দ্র করে জীবনের ভবিষ্যৎকে ভাবতে ভাবতে বিরামের সঙ্গে নিরুত্তাপ দিনযাপনের যান্ত্রিক অভ্যাস বজায় রাখার প্রতিদিনের দ্বন্দ্ব। ভাবতে ভাবতে শিউরে ওঠে সবিতা নিজেই। শক্ত হাতে রেলিঙটা চেপে ধরে। কিন্তু প্রাণের যন্ত্রণায় প্রাণহীন বস্তু একটা অবলম্বন নয়। তাই একটা জীবন্ত প্রাণীর খোঁজ পড়ে।

চিত্রা আসতেই সবিতার মুখে এমন একটা প্রশ্ন ফুটে ওঠে, যা সবিতা প্রশ্ন করবে ভাবে নি।

—তুই কখনো অ্যাকসিডেণ্ট দেখেছিস?

—কি রকম অ্যাকসিডেণ্ট? ছোটখাট অ্যাকসিডেণ্ট অনেক দেখেছি।

—চোখের সামনে একটা মানুষের মৃত্যু ঘটতে দেখেছিস অ্যাকসিডেন্টে ?

—একেবারে চোখের সামনে একটা মানুষ মরা ? না তো দেখি নি। দুইজনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

তারপর স্বগতোক্তির মতো অস্পষ্টভাবে শুধুমাত্র নিজেকে শোনাতেই যেন কথা বলে সবিতা, জানিস চিত্রা আজ রাস্তায় একটা অ্যাকসিডেন্ট দেখলাম।

এতক্ষণে চিত্রা সবিতার মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নাগাল পেয়ে বেশ সহজ হয়।

—বাসে চাপা পড়ল একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক। হাতে রেশন ব্যাগ ছিল। কিছু কিনে-কেটে বাড়ি ফিরছিলেন হয়তো।

চিত্রা জিভে চুক্‌চুক্‌ শব্দ করে। মৃত মানুষটার চেয়ে তার বেশি সমবেদনা জাগে মৃত্যুর অন্যতম দর্শক সবিতার উপর। যে মানুষটা নিজেকে নিজেই দিনরাত মরার কথা, আত্মহত্যার কথা, উন্মাদ হয়ে যাওয়ার কথা শোনাচ্ছে, তার চোখে এমন-সব ভয়ংকর মরার ছবি পড়ে কেন ?

—কিছুতেই তাকাতে চাইছিলুম না। তবু চোখদুটো কয়েকবার বেঁকে গেল। একটু-আধটু রক্ত ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে নি। দেখতে দেখতেই বিরাট ভিড় জমে গেল। এখনো গা-হাত ঝিম-ঝিম করছে।

—চল সবিতাদি, আজ একটু বেড়িয়ে আসি।

—কোথায় ?

—হেদোয় চল।

—মিণ্টু একা থাকবে কার কাছে ?

—ওকেও নিয়ে যাব তো।

—না, আমি আজ আর বইতে পারবো না ওকে। তাছাড়া বাইরে বেরুলেই ওর কেবল ঘ্যানর ঘ্যানর। এটা ওটার বায়নাক্কা।

তুইই বরং ওকে নিয়ে পার্কে যা। আমি আজ একটু একা থাকি।
—না না, একসঙ্গে চল। মিণ্টুকে আমি সামলাব।
—তাহলে গা-হাত ধুয়ে নিই।

হঠাৎ অনেক আলো, হাওয়া, স্নিগ্ধ জল, মন্থর মানুষ, মাথার ওপরের বিস্তৃত আকাশ, বেথুন কলেজের সার-বাঁধা দেবদারুর ছবির মধ্যে সাঁওতালী চরিত্রের আভাস, কুস্তিগিরদের গদা-গদা পায়ের মতো পাম্ গাছের গুঁড়ি, অন্য দৃশ্যকোণ থেকে অতি পরিচিত ট্রামকেও অন্য কোন রহস্যময় যন্ত্রযান মনে হওয়া ইত্যাদি পরিবেশ ও আবেষ্টনীর প্রতিফলনে সবিতার মনের চেহারার রূপান্তর ঘটতে লাগল।
চিত্রা বলে,—ঐদিকটায় যাই।
—না, আমি এখানেই দাঁড়াই। বেশি আলোয় ভাল লাগে না দাঁড়াতে। তুই যা মিণ্টুকে নিয়ে।
শুধু আলোর প্রতি অসহনশীলতা নয় বা অল্প অন্ধকারে মনের ভাঙা-চোরা ভাবনাগুলোকে স্পষ্ট করে দেখার সাধ মেটানোর জন্যে নয়, সবিতার ঠিক ঐ জায়গাতেই দাঁড়ানোর অন্য কারণ ছিল। সুজিতের সঙ্গে এসে ঠিক এই জায়গাতেই সবিতা দাঁড়ায়। গত দশ-পনেরো দিন আগেও সব শেষ একবার এসেছিল।
সুজিত! এটা একটা নাম নয়। শব্দ নয়। শিহরণ। সুজিত মানে বন্ধুত্ব, অনাবিল প্রেম, আত্মার মুক্তি, আমার সব, সর্বস্ব। সুজিত আমাকে মরা থেকে বাঁচাল। বহুদিনের জীর্ণ দুর্গন্ধেভরা কূপের আবদ্ধ অন্ধকার থেকে হাত ধরে টেনে তুলল আলোর বিশ্বভুবনে। যদি মরেই যেতাম, কত আনন্দ, উপভোগ, অধিকার, আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্তি, অজানা থেকে যেত।
এ সুখ চিরস্থায়ী নয় কেন?
সুজিত কি লিখেছে চিঠিতে? 'অনন্তকাল তুমি আমার আত্মার

আত্মীয়ই থাকবে'। অনন্তকাল? না, অত সুখ সইবে না আমার কপালে। বিরামকে নিয়েও আমি অনন্তকালের স্বপ্ন-রচনা করে-ছিলাম। ও যে কি করে এমন বদলে গেল। সব বদলে যায় সুজিত। এখনও জীবনের ঘা খাও নি। আমি যেন সেদিন না বাঁচি।

'তাহলে তোমার আমার জন্ম হয় কেন পৃথিবীতে? দেহাতীত কোন ঐশ্বর্যকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় তুমি জীবন বিদীর্ণ করে হাহাকার কর সবিতাদি? আমি কেন সাড়া দিয়ে তৃপ্ত হই সে ডাকে যা তোমার দেহের অন্ধকার কন্দরের আদিম আহ্বান নয়, মুক্তির পিপাসা।' দেহের অন্ধকার কন্দর? দেহ সম্পর্কে সুজিতের ধারণা আছে নাকি কিছু? দেহের আহ্বানকে কি অনুভব করার অভিজ্ঞতা পেয়েছে? নাকি শহরের অতি-চতুর মনের ব্যাধিগুলো ওকে অকালে পাকিয়ে দিয়েছে। না, সুজিত অন্য অর্থে বলেছে কথাটা। ও এখনও পাকে নি। শুদ্ধ সুকোমল ওর হৃদয়। হৃদয়টাই সব সুজিত। দেহটাকে ছুঁয়ো না। ওর শেষ আছে, বার্ধক্য আছে। হৃদয়ের একূল ওকূল দু-কূল ভেসে যায় সজনী, কিছু আর............

তুমি তো অনেক অবেলায় এসেছ সুজিত। আমার দেহের কতটা মাধুরী দেখতে পাও। দেহটাই কি অভিশাপ? অসংখ্যই তো ভালবেসেছে। কি পায় নি বলে ঘৃণা জানিয়ে চলে গেছে? বিরাম। তোমাকে তো একদিন বলেছিলাম সুজিত, বিরাম আমার দেহটাকেও......তাও যদি বাসতো আমি ধন্য হয়ে যেতাম। ওর কাছে আমি এক প্যাকেট সিগারেটের চেয়ে কতটা বেশি?

তবু ওকে আমি ঘৃণা করতে পারি না। শ্রদ্ধা, না ভালবাসা, না ভক্তি কি জানি না। অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে সুজিত। কোন উত্তর দিই নি। কোনদিন যদি দিতে হয় কি দোষ? দিলেও ও বুঝবে না। এখনও অপরিণত। যাক এসব জটিল ভাবনা কেন ভাবছি? মনের খুশি হয়ে ওঠাকে অকারণে জট পাকানো। ট্রাম-

গুলো সার বেঁধে দাঁড়াল কেন ? মানুষের চলা যেন থেমে গেছে খানিকটা। লাইনেই গণ্ডগোল ? না, শ্লোগান, প্রোশেসন। আজ কি মিটিং ছিল কিছু ? হ্যাঁ তো, খাদ্য আন্দোলন। মফস্বলের না কি শহরতলীর কৃষকরা যাচ্ছে। অন্নের দাবি। ক্ষুধিতদের খাদ্য সংগ্রহের অভিযান। আমাদেরও তো ফুটপাতে নামতে হবে। আমরা কৃষক মজুর নই, শিক্ষক, জাতির জন্মদাতা, গুরু। আমরাও ক্ষুধিত। চিৎকার কলরব, শ্লোগান, অনশন, অবস্থান ধর্মঘট…… প্রয়োজনটাকে এইভাবে দাবি করে তুলতে হবে। দাবি কি মিটবে ? মিটতেও পারে। কাগজে-পত্রে যা পাওয়া যায় তাতে সংগঠন বেশ জোরালো রূপ নেবে মনে হয়। এতেও তো খুশি হওয়া যায়।

যদি এমন হয় যে দাবি গর্জে ওঠার আগেই তা পূরণ হয়ে গেল তা কি হয় ? বেতন বৃদ্ধি বা খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কমানো অথবা বোনাস দেওয়া এসব ছাড়া আর যে সব দাবি ? সেগুলো কি ভাবে মিটবে ? আমি বিরামের কাছে একশোটা গলার জোর নিয়ে চিৎকার করবো, ওগো, আমাকে ভালবাসো, ভালবাসো।

সুজিত নীরবে একটা রুলটানা খাতার পাতায় হঠাৎ লিখে ফেলেছিল —'আমি তোমাকে ভালবাসি'। তারপর অনেক কেটেও মুছতে পারল না। ধরা পড়ে গেল। বুকে ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠল হৃৎপিণ্ডটা। সুজিত তখন কুঁকড়ে, হয়তো বা ভয়ে কুঁচকে বিবর্ণ হয়ে গেছে। কেন লিখল সুজিত ? তার আগে ওর পাশে বসে আমি কিছু বলেছিলাম। মিন্টুর জন্যে সোয়েটার বুনছিলাম মনে আছে। সুজিত কাঁদনের বন্ধু। প্রায়ই যাওয়া আসার ফলেই অন্তরঙ্গতা। ওর কাছে রোজই কিছু কিছু নিজের ব্যর্থ জীবনের ভগ্নাংশ প্রকাশ হয়ে যেত। সেদিন কি ওকে উপলক্ষ্য করেই বলেছিলাম, 'কেউ যদি পৃথিবীর কোন সুদূর প্রান্ত থেকে মিথ্যে করেও বলে আমি তোমাকে ভালবাসি, তাহলে বেঁচে যাই আমি'। সুজিত জবাবটা

লিখল। সে রাতটা জীবনে আর ফিরবে না। খুশি, খুশি, ঘুম নেই ; খোলস খসতে লাগল সারা রাতের চিন্তায়।

সেদিন রাত্রে, ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নে, সুজিতকে দেখেছিলাম। অন্য সুজিত। রোগা, লাজুক, মাথাভরা এলোমেলো চুলের, দুষ্টুমী ভরা লুকনো মুখের সুজিত নয়। সে এক পরিপূর্ণ পুরুষ। যেন একটা বিশাল দেবদারু। তার মুখটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। কেবলই ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল অন্ধকারে, যতবার কাছে আসে, যতবার কাছে পেতে যাই। কেবল দেখতে পাচ্ছিলাম তার হাতের আঙুলগুলো। সাদা, শুভ্র, ভীষণ ফর্সা, শীর্ণ, দীর্ঘ, তার আঙুল-গুলো আমার চোখের সামনে যেন বাতাসে নবীন কোন গাছের পুষ্পিত শাখার মতো দুলছিল, নড়ছিল। ও আমাকে ধরে আছে, ধরছে, ছুঁয়ে আছে, ছেয়ে আছে সেই আঙুলে। আমার চুলের মধ্যে ওর আঙুল। আমি কি বলতে গিয়ে চোখে জল এনেছিলাম। ওর আঙুল আমার চোখ থেকে সেই জল মুছিয়ে দিল। কি যেন শূন্যতার, কি ব্যথার, কিংবা বিষাদের কথা বলতে যাচ্ছিলাম ওকে। ওর তর্জনী একটা বৃহৎ নিষেধের মতো সামনে এসে দাঁড়াল। স্বপ্নে দেখলাম, এক বিপুল প্রান্তরের সীমাহীন শূন্যতার এক প্রান্তে বসে সুজিত ঘাসের উপরে, নাকি জলের ঢেউএর উপরে, কিংবা ধুলোয় মাটিতে কি যেন লিখে চলেছে। লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম না। অথচ ওর লেখার অক্ষরগুলো ওর লেখার মধ্যে থেকে উঠে এসে প্রজাপতি কিংবা রঙীন ফড়িং কিংবা চড়ুই পাখির মতো কেবলই উড়ে উড়ে আমার চুলের মধ্যে ঢুকে, আমার গা ছুঁয়ে আমার শাড়ির ভাঁজের মধ্যে লুকিয়ে ধরা না দেবার খেলায় আমাকে ক্রমাগত বিরক্ত বিব্রত করে তুলতে চাইছিল। ধরা যাবে না জেনেও আমি তাদের পিছনে ছুটছিলাম হাওয়ার আঁচল উড়িয়ে। কী ভীষণ হাওয়া উঠল সহসা। আমার গায়ের সমস্ত আবরণ বুঝি উড়ে যাবে। আমি উড়ে যেতে পারি। তাই যাব। সারাজীবনের দুঃসহ ভার, অসীম

ক্লান্তি, সবই তো গেছে খসে। আমি পালকের মতো হাল্কা হয়ে আকাশে ভাসবো। সহসা আকাশের দিকে চোখ পড়ল। কে যেন তার সব রঙ নিয়েছে শুষে। আকাশ জুড়ে ভয়াবহ অন্ধকার। থেকে থেকে ক্রমশ দ্রুতলয়ে আকাশ চিরে ঝলসে উঠছে বিদ্যুতের শিখা। সুজিতকে কোথাও দেখতে পেলাম না। ভীষণ ভয়ে, নিঃসঙ্গতায়, আবার আমার জীবন থেকে খুশি হারিয়ে যাবে এই আতঙ্কে, হাহাকারে, আর্তনাদ করে উঠতে চাইলাম প্রাণপণ শক্তিতে। গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরুল না। সেই মুহূর্তে হঠাৎ যেন মনে হল বিদ্যুতের ঝলসানো শিখাগুলোই সুজিতের আঙুল। আকাশ জুড়ে তার আঙুল কি যেন লিখছে। ধীরে ধীরে অক্ষরগুলো ফুটে উঠল স্পষ্ট হয়ে। পড়লাম—আমি তোমাকে ভালবাসি। সারা বিশ্বভুবনের উপরে আকাশ ছেয়ে ঐ লেখা মেঘের মতো ধীরে ধীরে কোথায় যেন ভেসে যাচ্ছে। আর চোখে পড়ল বহুদূর দিগন্তের পার থেকে সুজিত হেঁটে আসছে আমার দিকে। ছোট্ট শিশুর মতো মনে হচ্ছিল ওকে। আমি ভাবছিলাম ও কেন ছুটে আসছে না? এত ধীরে ধীরে এলে অনেক দেরি হবে পৌঁছতে। ও যখন পৌঁছবে, আমি ভাবছিলাম, আমার বুকের মধ্যে যতটুকু প্রেম, প্রীতি, সুধা অবশিষ্ট আছে সব দিয়ে ওকে স্নান করিয়ে দোব। তারপর কি হল মনে নেই। মনে আছে কেবল সেদিন ভোর থেকে আমি সবাইকে ভালবেসেছিলাম, আমি বাথরুমে অনেকক্ষণ গান গেয়েছিলাম, আমি বারান্দায় একটা ছোট্ট ফুলের বাগান করবো ঠিক করেছিলাম। কী খুশিতেই কেটেছিল কটা দিন।

আজও আমি খুশি। সুজিতই খুশি করল।

বুকে বেড় দিয়ে কাঁধে উঠে যাওয়া শাড়িটাকে টেনে গায়ের সঙ্গে খাপিয়ে এঁটে নিতে সবিতা একটু নড়ে-চড়ে উঠল। মনে হয় যেন অল্প খুশির এই সংক্ষিপ্ত বর্তমানটুকুকে সে বুকের মধ্যে আটকে রাখার চেষ্টা করছে।

সবিতাকে একলা থাকার সুযোগ দিয়ে চিত্রা মিণ্টুকে কোলে নিয়ে, দু-একবার হাঁটিয়ে, অনেকদূরে চলে গিয়েছিল চারপাশে আইবুড়ো ছেলেদের চোখ দিয়ে মেয়েদের ভাল-লাগা শুঁকবার জ্বলজ্বলে চাউনির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে। অনেকে চিত্রার শরীরের এত কাছ দিয়ে হেঁটে গেছে যেন ওর আঁচলের একটু ছোঁয়া পেলেই আজকের রাতটা অনিদ্রার সুখে ভরে উঠবে তাদের।

চিত্রা এমন কিছু সুন্দর নয়। সাধারণ উপন্যাসের নায়িকাদের যতটা রূপ থাকলে উপন্যাসের সমাদর বাড়ে চিত্রার যৌবনপুষ্ট শরীরে তার সমর্থন নেই কোথাও। মুখটাকে মেজে ঘষে অর্থাৎ পুরু পাউডার স্নো-এর প্রলেপে মুখের অসংখ্য ব্রণ-ঘটিত ক্ষতকে ঢাকা দিলে লোকচক্ষে নেহাত মন্দ মানাবে না। কিন্তু আসল ত্রুটি রয়েছে শরীরের বেমানান গড়নে। মাথা থেকে কোমরের অংশটা কোমর থেকে পা পর্যন্ত অংশের চেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার ত্রুটি।

নিজের রূপ বা শারীরিক গড়ন-গঠন সম্পর্কে চিত্রার নিজেরও কোন দুর্বলতা নেই। বরং ঐ ব্যাপারে খেদ না রেখে বেপরোয়াভাবে মেলামেশা চলা-হাঁটার সবলতাটাই তার মধ্যে প্রকট।

মিণ্টুর মুখের আর বয়স্ক ছেলেদের চোখের হ্যাংলামি সামলাতে গিয়ে চিত্রা বিব্রত আর অধৈর্য হয়ে ফিরে আসে সবিতার পাশে। মিণ্টু মায়ের কোলে উঠেও আইসক্রীমের বায়নায় বিরতি ঘটায় না।

চিত্রা বলে,—চল এবার বাড়ি ফিরি।

একাগ্রভাবে অনেক কিছু ভাববার সুযোগ পেয়ে সন্ধ্যেটা সবিতাকে শান্তি দেয়।

মিণ্টুর একরোখা জেদী বায়নাটা যে আসলে চোখ-জোড়া ঘুমের জন্যে সেটা বুঝে সবিতা মিণ্টুর মাথা কাঁধে নুইয়ে পিঠে আস্তে চাপড় দিতে দিতে পথ হাঁটে।

সবিতা ঠিক করে গিয়েই ঘুম পাড়াবে মিণ্টুকে। মিণ্টু ঘুমোলে 'যোগাযোগ'টা পড়বে আরেকবার। কুমুদিনীর ট্রাজেডি হয়তো

তার নিজের জীবনের সমীকরণে আগের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব ঠেকবে। চেনা সাহিত্যকে জীবনের অভিজ্ঞতা কি নতুন স্বরূপে চেনায়? পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি লেখকের রচনা-করা চরিত্রও রূপান্তর পায়?

যেমন?

সবিতা নিজেকে প্রশ্ন করে।

যেমন? ঐ তো কুমুদিনীই।

সবিতার একসময়ে, ছাত্রী জীবনের মধ্যযুগে আর রাজনৈতিক জীবনের শৈশবকালে, মনে হয়েছে কুমুদিনী আর মধুসূদনের সমস্যায় শ্রেণী সমস্যারই প্রতিচ্ছায়া জড়ানো। ফিউডাল, যার ধ্বংস হচ্ছে, আর বুর্জোয়া যে ক্রমশ পুষ্ট হবার পথে, এই দুটো শ্রেণীর অন্তর্বিরোধের প্রতিচ্ছায়া। আজ কেন তা মনে হয় না? আজ মনে হয় কুমুদিনী একটা অস্তিত্বের আত্মমর্যাদার মহত্তর প্রশ্ন। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের নতুন-জাগা সমস্যা।

বাড়ি ফিরে চিত্রা বই নিয়ে বসে। কাঁদন বেরিয়ে গেছে। সবিতা কাঁধে মাথা রেখে ঘুমানো মিণ্টুকে বিছানায় শুইয়ে তার ঘুমকে আরও গাঢ় করে দেবার তাগিদে পাশে শুয়ে থাকে। বিশুর মা রান্নার হিসেব-নিকেশ সম্বন্ধে কিছু জানতে এলে সবিতা গলা খাটো করে তাকে নির্দেশ দেয়।

পাশের বাড়িতে কে বুঝি হঠাৎ রেডিওটা খুলে দিলে। একটু আগে শুরু হওয়া রবীন্দ্র সংগীত বেশ স্পষ্ট হয়ে চারপাশের বাতাসে কি রকম একটা অস্পষ্ট ব্যথার আবেশ ছড়াল।

সবিতাও মৃদু স্বরে রেডিওর আসল গানের সঙ্গে অবিকলভাবে তার নকল গলাটা মিলিয়ে গেয়ে ওঠে—"কেন যামিনী না যেতে জাগালে না......"

গানের সুর জানে না কিন্তু ভাষা জানে এই বিচারে সবিতা প্রায় অর্ধেক গীতবিতান মুখস্থ বলতে পারে। তার সে দক্ষতার প্রকাশ

প্রায়শই ঘটে থাকে চিঠির পাতায়, একেবারে শীর্ষদেশে, সম্বোধন শুরুর আগে যেখানে চিঠি শুরু হয়।

সবিতার অনেকগুলো গান সুজিতের কাছে শেখা। সুজিতের গলায় রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের গান ভারী সুন্দর ফোটে। বড্ড নরম গলা। তাতে গানের ভিতরকার বেদনা যেন ঢেউয়ের মতো খেলা করে।

গান গাইতে গাইতেই সবিতার মনে এসে গেল, অন্যদিনের মতো আজ সে আগে খাবে না। বিরাম এলে একসঙ্গে খেতে বসবে দুজনে।

তিন

যে কোন মাসের শুরু ও শেষ ভারী বিপর্যয়ের সময়। মাসের শুরু ও শেষের অর্থ মাইনের টাকার শুরু ও শেষ।

শুরুর দিকে পোয়াতে হয় কি কি বিষয়ে কত খরচ করা হবে তার ঝামেলা। শেষের দিকে পোয়াতে হয় কতটা খরচ কোন্ বিষয়ে না করা হবে তার ঝঞ্ঝাট। যেহেতু জীবন মানেই টাকার মাপে জীবন।

সকালের দিকে বিরাম ও সবিতার মধ্যে একটা অল্প-কথার বচসা বা বিবাদ হয়ে গেল, যা প্রায়শই ঘটে থাকে সব সংসারে। টাকা-কড়ির হিসেব-নিকেশ সংক্রান্ত বচসা। বিরামের অভিযোগ সবিতা কেন হিসেবের বাইরে খরচ করে। সবিতার অভিমান বিরাম নিজে কেন সংসারের খরচ-পত্রের দিকে কানা-বোবা হয়ে থেকে শুধু মাঝে মাঝে খুঁত ধরার কর্তালী করতে আসে। নিজে দায়িত্ব নিয়ে সংসার চালালে পারে।

অথচ এর মধ্যে যেটা লক্ষ্য করার বিষয় সেটা হল যে, টাকা নিয়ে

ঝগড়া শুরু হয় নি। হয়েছিল মিণ্টুর গতকাল রাত থেকে শরীর খারাপ হওয়ার ব্যাপার নিয়ে। সেটাই ক্রমে ক্রমে গড়িয়ে এল টাকার হিসেবে, টাকার সঙ্গে জীবনের অঙ্গাঙ্গী সূত্র বেয়ে।

সবিতা ও বিরামের প্রাতঃকালীন ঘরোয়া কলহের উত্তাপ ঠিক যখন জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয় হয় শর্বাণী এল সেই সময়ে। শর্বাণীর সঙ্গে ছিল অপরেশ। বিরামের সঙ্গে অপরেশের পরিচয় করিয়ে দেয় শর্বাণী। অপরেশ বারান্দায় গিয়ে আলাপ-আলোচনায় বসে বিরামের সঙ্গে। বিরাম সকালের ইংরেজী ও বাংলা মিলিয়ে তিন-চারটে খবরের কাগজ পর্যায়ক্রমে উল্টে-পাল্টে দেখছিল। এতগুলো কাগজ রোজই আসে বিরামের কাছে। এবং বিনামূল্যে। বিরাম যে সাপ্তাহিক পত্রিকার আপিসে কাজ করে সেখানকার বন্দোবস্তে। পত্রিকাটি কলকাতার চেয়ে মফস্বলেই চালু বেশি। বাংলার বাইরে বাঁধা গ্রাহক আছে বেশ কিছু, বিভিন্ন প্রদেশের বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চলে। পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যদিও বেশ বড় হরফে লেখা থাকে অমুকচন্দ্র অমুক, আসলে তিনি মালিকমাত্র। সম্পাদকীয় স্তম্ভ, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এবং সময়োপযোগী বিশেষ প্রবন্ধাদি সব কিছুরই দায়-দায়িত্ব বিরামের ওপর।

যিনি নামে সম্পাদক তিনি নামজাদা সাহিত্যিক না হলেও সাহিত্য-রসিক বা সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে স্বনামধন্য। সাহিত্য সম্পর্কিত সভা-সমিতি বা স্থায়ী বহু সংগঠন তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট। যৌবনকাল থেকেই দেশপ্রেমের অপরাধে ইংরেজ সরকার তাঁকে এত বেশি সময় মানুষের জীবন ও মানুষের তৈরি সাহিত্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছিল যে পুরোপুরি সাহিত্যিক হয়ে ওঠার সাধ ও সাধনা তাঁর সাধ্যায়ত্ত হয় নি। স্বাধীন ভারতের শুরুতেই তিনি নির্বাচনে নেমেছিলেন এম, এল, এ হওয়ার তাগিদে। নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজয়ের পরই তাঁর এই নির্ভীক জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক মুখপত্রটি প্রকাশিত হচ্ছে।

বিরামের সঙ্গে মহিমারঞ্জনের যোগাযোগের ঘটনাটি আকস্মিক ও আকর্ষণীয় বলেই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।
ইউনিভার্সিটির পড়া শেষ করে জীবনে বেকারত্বের গ্লানিকে উপলব্ধি করার শুরুতে বিরাম একটা দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত 'ফিচার' ও পুস্তক সমালোচনা লিখত। সেই সময় ওর হাতে একটা প্রবন্ধের বই আসে বেশ মোটাসোটা। নাম 'ভারত-আত্মা' বা 'শাশ্বত-ভারত' এই জাতায় কিছু। ত্যাগ ও তিতিক্ষার পথেই যে ভারতের মুক্তি, ইওরোপের যুক্তি-বিজ্ঞান যে ভারতবর্ষের চিরন্তর ঐতিহ্যের বিরোধী ও অন্তরায় প্রচুর ইংরেজী উদ্ধৃতির সাহায্যে গোটা বইয়ে শুধু সেই বিষয়টিই আলোচিত। বিরাম বেশ বড় ও জোরালো সমালোচনা লিখেছিল বইটার, সগু-পড়া বিশ্বের চিন্তাশীল মনীষীদের রচনাবলী থেকে যথোপযুক্ত যুক্তি-তর্কের লাগসই ব্যবহার ঘটিয়ে। টুকরো টুকরোভাবে প্রশংসা করলেও আসলে বইটিকে বিরাম উদ্ভট ও অবৈজ্ঞানিক বলেই প্রমাণ করেছিল। অথচ সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার এক সপ্তাহ পরে বিরাম দেখে অবাক হল যে সেই বইটির বিজ্ঞাপনে তার সমালোচনার প্রশংসাসূচক বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে এক জায়গায় জোড়াতালি দিয়ে ছাপা হয়েছে। ওপরে লেখা রয়েছে "মার্ক্স, হেগেল, রাসেল, বার্নার্ড শ', রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে 'অমুক' পত্রিকা বলেন.........".
আরো অবাক হবার কারণ ঘটল আরো পরে। যেদিন ঐ দৈনিক পত্রিকার আপিসে রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক ভবতোষবাবু প্রবন্ধকার শ্রীমহিমারঞ্জন রায়চৌধুরীর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করিয়ে দিলেন বিরামের। বিরাম দ্বিধা ও দুর্বলতায় প্রায় কেঁচোর মতো কুঁচকে ছিল। কিন্তু ভরাট স্বাস্থ্য ও গম্ভীর মুখাবয়বের অধিকারী মহিমারঞ্জন প্রায় পঞ্চমুখে প্রশংসা করলেন বিরামের লেখার। বহুকাল তিনি এই জাতীয় খাঁটি প্রবন্ধ পড়েন নি বলে

মন্তব্য করলেন বিরামের উদ্দেশে। ভবতোষকে বললেন, 'আজকাল তো মশাই লোকে ভাল সাহিত্য নাড়া-চাড়া করে। তা বলতে হবে, বিজ্ঞাপন দিয়ে বেশ কাজ পেলুম আমার বইটার। টুকটাক্ বিক্রি হচ্ছে। মনে তো হয় খরচা শিগ্‌গির তুলে ফেলবো।'
যাবার আগে সেইদিনই তিনি বিরামকে আশ্বাস দিলেন একটা স্থায়ী চাকরির। শীঘ্রই তিনি একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করছেন, তাতে। বিরামের মতো শিক্ষিত ও সুযোগ্য লোক যে না খুঁজেই পেয়ে গেলেন এজন্যে কৃতজ্ঞতা জানালেন নিজের ভাগ্যকে। পরবর্তীকালে বিরাম সত্যিই কাজ পেল মহিমারঞ্জনের সাপ্তাহিকে। আজও কাজ করছে সেখানে।
বিরাম নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে আরেকটা বাড়ায় অপরেশকে
অপরেশ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, আপনারা সাংবাদিকরা আমাদের একটু সাহায্য করুন।
বিরাম প্রশ্ন করে, আপনারা ধর্মঘটের তারিখ ঠিক করেছেন ?
—না, এখন সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্যেই সামনে অধিবেশন ডাকা হয়েছে। ধর্মঘট শুরু হবার আগে আমাদের অভাব-অভিযোগ, দাবি-দাওয়া আর সরকার পক্ষের বেমালুম চুপচাপ মেরে থাকা এসবের ভিত্তিতে সারা বাংলা শিক্ষক ধর্মঘটের ওপর কিছু লেখা-টেখা ছাপুন।
বিরাম আশ্বাস দেয়, লেখালেখি বিস্তর হবে। তার জন্যে ভাববেন না। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে আপনাদের স্ট্রং ইউনিটির ওপর। মনে তো হয় পিপল্‌স সিমপ্যাথি বা পিপল্‌স সাপোর্ট শহরে বেশ বড় রকম আকার নেবে। কেননা এটা তো ঘটনা হিসেবে সত্যিই খুব সিগনিফিকেন্ট......মানে শিক্ষকরা রাস্তায় নামবে..... এতে পলিটিক্‌স পছন্দ করেন না যাঁরা তাঁরাও......হ্যাঁ, আচ্ছা, কি রকম অর্গানিজেসন চলছে আপনাদের ?
—চলছে তো পুরোদমে। শহর বা শহরের আশপাশের রিপোর্ট

তো বেশ আশাপ্রদ। তবে ভয় আছে মফস্বলের শিক্ষকদের নিয়ে।

—কেন মফস্বলে কি সংগঠন নেই ?

—সংগঠন আছে। যেখানেই স্কুল বা শিক্ষক আছে সেখানেই সংগঠন। তবে ওরই মধ্যে উনিশ-বিশ। ধরুন যেখানে শিক্ষক সংগঠন ছাড়াও আর পাঁচটা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন সক্রিয়-ভাবে কাজ করছে সেখানকার মানুষের চেতনা অন্যান্য ঝিমধরা অঞ্চলের চেয়ে খানিকটা বেশি তাজা বা বেশি উন্নত হবেই। আসলে কি জানেন······

অপরেশের গলাটা একটু খাটো হয়ে আসে।

—যারা দেশকে শিক্ষিত করবে সেই শিক্ষক জাতটাই এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে অশিক্ষিত রয়ে গেছে। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা এক কথায় চরিত্রে মেরুদণ্ডের অভাব। সমাজ জীবন, ব্যক্তি জীবন, রাজনীতি, সত্যিকারের শিক্ষা-নীতি কি হওয়া উচিত, এই যেমন ধরুন সোভিয়েট করেছে, এসব সম্পর্কে একটা প্রাথমিক চেতনা তো থাকা চাই। নইলে গণচেতনা আসবে কোথা থেকে। তবে কি জানেন, হবে। এই ধর্মঘটের ধাক্কায় শিক্ষক সমাজের বেশ একটা মজবুত বনেদ তৈরি হবে।

বিরাম সব কথাতেই সমর্থন জানিয়ে যায় খবরের কাগজের বিশিষ্ট সংবাদের ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে।

ওদিকে অন্য চালে কথা চলে শর্বাণী ও সবিতার মধ্যে।

শর্বাণী সবিতার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। স্বাস্থ্যে আরও হৃষ্টপুষ্ট। তবে মাথায় বেঁটে। শরীরে বেঁটে হওয়ার ত্রুটিটা ঢেকে দিতে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দুটো জিনিস। যৌবন। ও যৌবনের কমনীয়তা।

শর্বাণীর সাজ-পোশাকগুলোর কোনটাই কম দামী নয়। শরীরের উঁচু নীচু ভাঁজের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো শাড়ি ব্লাউজ, শুভ্র ও সুডৌল

হাতের কব্জিতে এঁটে বসা ছোট্ট রিস্টওয়াচ, রিস্টওয়াচের বিনুনি পাকানো চকচকে কালো ব্যাণ্ড, মাদ্রাজী মাদুরি দিয়ে বোনা ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ের সাদাসিধে সর্বাধুনিক সাণ্ডেল সব কিছুতেই রুচি ও প্রাচুর্যময় জীবনের ছাপ স্পষ্ট।

শর্বাণী প্রথম যৌবনে কিছুদিনের জন্যে কোন এক স্কুলের হেড মিস্ট্রেস হয়েছিল। সেখানে পদচ্যুতা হবার পর থেকে এ পর্যন্ত একটানা শিক্ষা-সংক্রান্ত সংগঠন ও নারী আন্দোলনের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছে।

সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা যে বয়সে একাধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে জীবনের গৃহিণীপর্বে পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে, সে বয়সে সবিতা মাত্র একটি সন্তানের জননী। আর শর্বাণী সবিতার বয়স কয়েক বছর আগে পার করে দিয়েও যৌবনের জন্মগত দাবিকে উপেক্ষিত রাখার ক্ষমতায় আজও অবিবাহিতা।

ঘর-সংসার আসবাব-পত্র জিনিস-পত্রের দাম, কেনা-কাটার সমস্যা, কাঁদনের মতি-গতি, মিণ্টুর বয়সের চেয়ে বেশি রকম চতুরতা ও চাপল্য, গোলাপের পোকা ইত্যাদি বিষয়ে অনেকটা সময় অগোছালো কথা চলে সবিতা ও শর্বাণীর মধ্যে। সবিতা শর্বাণীকে ডাকে 'মিতুদি' বলে। শর্বাণীর চেয়ে বাইরের জগতে 'মিতুদি' নামটাই বেশি প্রচলিত।

বিরাম একসময় অপরেশের সঙ্গে আলোচনা থামিয়ে বলে, আপনি বসুন। আমি একটু উঠবো।

—না। আমিও উঠবো।

অপরেশ শর্বাণীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে তার যেতে দেরি হবে কিনা। শর্বাণী দেরি হবে জানায়।

বিরাম তার লেখার টেবিল থেকে কিছু দরকারী কাগজপত্র নিয়ে গায়ের গেঞ্জির ওপর একটা আধ-ময়লা পাঞ্জাবি চাপিয়ে সিঁড়িতে নামে। অপরেশও প্রায় একই সঙ্গে নামতে গিয়ে সিঁড়ির মুখে

একটু থমকে শর্বাণীকে আবার ডাকে। শর্বাণী সিঁড়ির কাছে এলে অপরেশ আবার জিজ্ঞাসা করে, তোমার কি ফিরতে খুব দেরি হবে এখান থেকে। আপিসে ওয়েট করবো কি?

—না। আপনি এখান থেকে সটান বাড়ি চলে যান।

—ও, তাহলে তুমি এ-বেলা আপিসে আসছ না। ওবেলা কখন আসছ? ঠিক সময়ে আসছ তো?

—হ্যাঁ, বিকেলে আসছি।

—আচ্ছা। চলি তাহলে। পাঁচটায় আসছ, কেমন তো?

অপরেশ একটু ম্লান হেসে সিঁড়িতে নেমে যায়। ওর বয়স চল্লিশের গায়ে গায়ে। কথাবার্তায় বয়সের ভারিক্কিয়ানা। সুশ্রী বা সুপুরুষ নয় কিন্তু শরীরটা বেশ খাড়াই আর শক্ত।

শর্বাণী ফিরে আসতে তার ঠোঁটের এক কোণে ঈষৎ হাসির আভাস-টুকুকে সবিতা লক্ষ্য করে।

—হাসি কিসের মিতুদি?

—ছিট আছে খানিকটা। তার মানে, এত টকেটিভ্, ওঁর সঙ্গে রাস্তায় হাঁটতে পর্যন্ত ভয় পাই······অত বক্ বক্······

শর্বাণীকে আলতোভাবে জড়িয়ে ধরার ভঙ্গিতে নুয়ে সবিতা বেশ আপ্লুত কণ্ঠে বলে,—তাই বলো, আমরা ভাবলাম এতদিনে বুঝি তোমাকে ভালবাসবার মতো একটা বুড়ো-হাবড়া জন্মাল পৃথিবীতে।

সবিতা 'আমরা' বলল হয়তো এই জন্যে যে চিত্রা ঐ সময়ে উঠে এসেছিল মিণ্টুর জ্বরটা আছে কি নেই দেখতে। কাছের ডাক্তারখানা থেকে চিত্রা নিজে গিয়ে যে ওষুধটা নিয়ে এসেছে তারই নির্দেশ রয়েছে জ্বর থাকলে না-খাওয়ানোর।

শর্বাণী সবিতার রকম-সকমে বিহ্বল হয় খানিকটা। সবিতার বয়সী বিবাহিতা অন্য মেয়েদের সঙ্গে সবিতার চরিত্রের কিছু ভাল-মন্দ পার্থক্য তার চোখে পড়ে বার বার।

—কি ব্যাপার রে তোর সবিতা! বড্ড বেশি হাসি-খুশি দেখছি যে তোকে। তোরা দুজনে কি আবার নতুন করে যৌবনে পা দিলি নাকি?

—সকলেই দেখছি আমাকে ঠিক চিনতে পারে। সকলেই দেখে আমি খুব মজাসে নেচে-গেয়ে দিন কাটাচ্ছি।

—আর কে বললে?

—কাল বিমলা আর রথীন এসেছিল।

—আরে, বিমলা এসেছিল! ওকে তুই জিজ্ঞেস করেছিলি কিছু?

—কি?

—ওদের স্কুলে ধর্মঘটের অর্গানিজেশানটা কেমন চলছে। ওখানে আমার যাওয়ার কথা ছিল।

সবিতা অবাক হয়। বিমলার সঙ্গে তার কতদিন পরে দেখা। আর দেখা মাত্র সে তাকে জিজ্ঞেস করবে, স্ট্রাইকের তোড়জোড় কেমন চলেছে। তা ছাড়া টুনুর যে খবরটা সে শোনাল তারপর ওসব প্রসঙ্গ উঠতেই পারে না।

টুনুর প্রসঙ্গটা কি মিতুদিকে জানাবো? আগ্রহ দেখিয়ে শুনবে ঠিক। কিন্তু বুঝবে কি? বুঝবার মতো মন আছে কি মিতুদির। সবিতার ঠোঁটে ছাপানো ছবির হাসির মতো না-কমে না-বাড়ে একটু হাসি সব সময় লেগে থাকলেও একটুখানি সময়ের মধ্যে সে অনেকগুলো কথা ভাবে।

শিক্ষকদের মাইনে বাড়ানোর সমস্যা নিয়ে ভেবে ভেবে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললে মিতুদি। কিন্তু মানুষের জীবনে এমন অনেক সমস্যা আছে যা মাইনে বাড়িয়ে দিলেও কমে না।

সবিতা মনে মনে বলে কথাগুলো।

শর্বাণী বলে,—শোন, কাজের কথা বলি।

—বল।

—তোকে একটা কার্ড নিতে হবে।

—কিসের ?

—মহিলা সমিতির জন্যে চ্যারিটি শো করা হচ্ছে। ফিল্ম দেখানো হবে একটা।

—ওমা, পয়সা দিয়ে টিকিট। আমাকে মাপ কর বাবা, কি করে যে এখনো তিনটে দিন কাটবে তাই ভেবে অস্থির।

—আচ্ছা কার্ডটা তুই নিয়ে রাখ না। মাইনে পেলেই টাকাটা দিবি। আমি এখন এত গুচ্চের কার্ড নিয়ে কোথায় ঘুরবো তোরা না নিলে। আর কেউ যাবে ?

চিত্রা ফিল্ম-এর নাম শুনেই উঠে এল দ্রুত পায়ে।

—কি ছবি দেখাবে মিতুদি ?

—গর্কির 'মাদার'।

—ও হো, ওটা আমার দেখা হয় নি। আমি কিন্তু দেখবো ওটা, সবিতাদি। সত্যি, যাবো দেখতে।

চিত্রা নাকে কাঁদার মতো আহুরে আবদার ধরে।

—তাহলে এক কাজ কর সবিতা, বিরামের তো সময় হবে না, তোরা তিনজনে তিনটে কার্ড নে।

সবিতা একবার ভাবলে প্রচণ্ডভাবে অগ্রাহ্য করবে কার্ডগুলোকে। তারপর ভাবলে, না, নরম গলায় মিতুদিকে বোঝাবে যে এইসব বাড়তি খরচের ব্যাপার নিয়ে বিরামের সঙ্গে তার একচোট বচসা হয়ে গেছে আজকেই। সুতরাং......কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্ড তিনটে সে হাতে নিলে বিনা বাক্যে।

মিতুদিকে সংসারের খবর জানিয়ে কি লাভ। এক কানে ঢুকলে আরেক কান দিয়ে বেরোবে। সংসারের আলাদা আলাদা মানুষদের ওরা গ্রাহ্য করে না। সমষ্টির সমস্যা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। দেশে একেবারে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে তারপর সংসার আলাদা করে— মানুষ, ব্যক্তি এসব নিয়ে ভাববে।

শর্বাণী উঠবার মতো হয়ে দাঁড়ায়।

—বেড়াতে যাবি এক জায়গায়।

—কোথায় ? কলকাতার বাইরে।

—হ্যাঁ, তবে পুরী ওয়ালটেয়ার নয়। সুন্দরবনে। আমাদের মহিলা সমিতির কয়েকজন লেখিকা যাচ্ছে সুন্দরবন এলাকায়। এর আগে ওরা হুগলীর অনেকগুলো গ্রাম ঘুরে এসেছে। নিরুপমা, মানে নিরুপমা ত্রিবেদীকে তো তুই চিনিস্। ঐ যে রে 'সমাজ প্রগতি ও নারী আন্দোলন' বইটা যার লেখা। ও যাচ্ছে। আর যাচ্ছে শোভনা রায়। এম. এল. এ বিজন রায়ের বৌ। আরও দু-একজন থাকবে সঙ্গে। আমিও যাবো ভাবছি। তুই যেতে চাস তো মন ঠিক করে ফেল।

—কেন, যাচ্ছে কেন ?

—চব্বিশ পরগনার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকাগুলো দেখতে। গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে জানানো হয়েছে সমস্যা এমন কিছু মারাত্মক বা জরুরী নয়। অথচ আমাদের 'জাগৃহি' প্রতিদিন মরা-মানুষের, কংকালসার মানুষের ছবি, শুকনো ফাটা মাঠের ছবি ছাপছে। শিয়ালদা স্টেশন ভরে যাচ্ছে উদ্বাস্তু কৃষকের ভিড়ে। পার্টির একদল এম. এল. এ. গেছেন তদন্তে। ওরা ফিরলেই মহিলা সমিতির তরফ থেকে আমরা যাবো।

—না, আমার বোধহয় যাওয়া হবে না।

—কেন ?

—মিণ্টুর শরীরটা খারাপ। আর......।

—যখন যাওয়া হবে তখনও কি আর জ্বর থাকবে। ভেবে দেখিস। আর শোন, ফিল্ম শোতে পরশু যাস তাহলে।

শর্বাণী চলে যায়। সবিতা তাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে আসে।

মিণ্টু সারাদিন রয়েছে আধো-তন্দ্রার ঘোরে। মুখটা টস্‌টসে, ফোলা ফোলা। চোখের নীল অংশ যেন জলে ডুবে আছে। সবিতা মিণ্টুর বুকের খালি অংশের ওপর জামাটা টেনে দেয়। ঘরের

ভেতরের কিছু এলোমোলো জিনিসপত্র গোছায়। হাতে কাচা ধুতি-শাড়িগুলোকে ইস্ত্রি করার অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে ভারী চামড়ার সুটকেশের নীচে জাঁক দেয়।

বিশুর মার খুস্তি নাড়া ঝিমিয়ে আসাতে সবিতা বুঝতে পারে ঝোল হয়ে এল। নীচের বাথরুমে একটা বিশেষ ধরনের জল ঢালার শব্দে বোঝা গেল বঙ্কিমবাবুর চান করা শেষ। দোতলার অন্য ভাড়াটের ঘরের বিবাহিতা ও গর্ভবতী মেয়েটি সবিতাদের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। প্রায়ই আসে, গল্পগুজব করে। ভারী ছেলেমানুষি মন। বাড়িতে ছোট ছেলের অসুখ জেনেই সে বোধহয় তার স্বভাবসুলভ হাসি-তামাশাকে থামিয়ে রেখেছে।

কাজের ফাঁকেই সবিতা কিছু কথা ভাবল।

মিতুদিকে সব কথা যদি জানাই কোনদিন? যদি জানতে পারে? সবিতা ঘরের একটা কোনায় এসে ব্লাউজের ভিতরের জামাটা খুলল। বিমলা আর মিতুদির মধ্যে তফাত কি? বিমলা যদি বুঝতো? তার কাছে চাল-ডাল তেল-নুনের সাংসারিক সমস্যার চেয়ে অন্য কিছু বেশি মূল্য পেত কি?

বিছানার ওপর থেকে তিনটে কার্ড নিয়ে ছোট্ট চামড়ার সুটকেশের ওপরে জমানো বই-খাতার মধ্যে চাপা দিলে অল্প একটু কোনা বাইরে রেখে।

মিতুদি যদি জানতে পারে সে কি আমাকে এই কথাই বোঝাবে না যে অর্থনৈতিক অসাম্যের সঙ্গে সামাজিক ছোট-বড় যে সব ভেদ-বিভেদ ঘটনা-দুর্ঘটনা, ভাঙা-গড়ার যোগ রয়েছে, প্রেমের ব্যর্থতা তারই একটা ভিন্ন রকম রূপ। সুতরাং সাম্যবাদ যতদিন না......

সবিতার হঠাৎ মনে পড়ে কালকের হিসেবটা খাতায় লেখা হয় নি। দৈনিক জমা-খরচের খাতা ও ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কলমটা নেয়।

এ যুক্তিতেও যদি রোগ না সারে? তখন কি তাকে রাজনৈতিক ডাক্তারদের চেম্বারে হাজির করানো হবে। বড় ধরনের ক্ষয়ের

আশঙ্কায় ডাক্তারেরা যেমন তুটো হাতের একটাকে ছেঁটে ফেলে, তুটো ফুসফুসের একটাকে ভোঁতা অকেজো করে দেয় চিরকালের মতো শ্বাস-প্রশ্বাসের অনিয়ম ঘটিয়ে, রাজনীতিতে যেমন মতভেদের সংঘর্ষে বৃহত্তর স্বার্থের অজুহাতে এক বা একাধিককে দলচ্যুত করার সহজ পথ খোলা থাকে, মিতুদিরা কি তার জীবন থেকে তেমনি সুজিতকে মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়ে এর চিকিৎসা করবে ?

বিরাম ফিরে এল। এসেই তার চেয়ার টেবিলে গিয়ে বসল কাগজ-পত্র নিয়ে। সবিতা গিয়ে দাঁড়াল পাশে।

—এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে ?

বিরাম উত্তর না দিয়ে বাঁ হাতের তেলোয় তার শরীরের সবটা ভার ছেড়ে দিয়ে টেবিলের দিকে নুয়ে পড়ে। সবিতা হাত রাখে বিরামের পিঠে।

—ফিরে এলে যে তুমি এত তাড়াতাড়ি ? টাইপ করাতে গিয়েছিলে তো।

বিরাম আরো নুয়ে তার ইংরেজী লেখা কাগজগুলো ঘাঁটে।

—এখনো রেগে আছো তো ? কি ? রেগেছ ?

—উঁহু।

—তাহলে কথা বলছ না যে।

—একটা টাইপরাইটার না কিনলে চলবে না।

—কেন ? যেখানে করাও কি হল ?

—এত ইরেসপনসিবল, একদিন খুশি আসে, একদিন খুশি আসে না।

বিরাম সাপ্তাহিক পত্রিকার চাকরি ছাড়াও আরও একটা কাজ করে। বোম্বায়ের 'বোম্বাই-রিভিউ' পত্রিকার কলকাতা শহরের বিশেষ প্রতিনিধির কাজ। সপ্তাহে একবার করে কলকাতার উল্লেখ-যোগ্য সংবাদগুলো সংগ্রহ করে পাঠায়। কর্তৃপক্ষ তার থেকে পছন্দ মতো ছাপেন। এর জন্যে একটা নিয়মিত টাকা প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহে মনি অর্ডার যোগে আসে তার কাছে।

—একটা মেশিনের দাম কত ?

—অনেক। একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড রেমিংটন কিনবার চেষ্টা করেছি কয়েকবার। তাতেই দুশো-আড়াইশো করে চায়।

—আড়াই শো! সবিতার আগ্রহ ঢিলে হয়ে যায়। দুজনের মাসিক রোজগার কানাকড়ি না বাড়িয়েও আড়াইশো টাকা খরচ করে কিছু কেনার কথা সে কি করে ভাবছে। নিছক আবেগ? বিরামকে সহানুভূতি জানাবার অকারণ উৎসাহে।

—শোনো।

—বল।

—এদিকে তাকাও। এবারেও তো ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার খাতা দেখতে পাব। কিছু বেশি করে নোব। তুমি যদি শ-খানেক একস্ট্রা ইনকাম কিছু করতে পার তাহলে হয়ে যায়।

—আচ্ছা, এক্সপ্লোশন বানানটা কি বলতো? tion না sion?

—sion ঠিকই তো লিখেছ।

—কালকের স্টেটসম্যানটা কোথায়? একটু দ্যাখ তো।

—কাঁদনই পড়ে, কাঁদনই রাখে। দেখ ঐখানেই কোথায় আছে।

সবিতা তার ঘরে ফিরে এসে মাথার খোঁপা ভাঙে।

গোটা বাড়িতে ভাড়াটে পরিবার একতলা দোতলা মিলিয়ে পাঁচটি। কিন্তু বাথরুম একটাই। মাঝারি ধরনের চৌবাচ্চা। তাই সকলের শরীরকে সমানভাবে স্নিগ্ধ করার জল তার সিমেন্ট-করা পেটে ধরবার কথা নয়।

গোটা বাড়িতে সকলের শেষে স্নান করে কাঁদন। ফলে ময়লা হড়হড়ে তলানির জলটা তারই মাথার জন্যে অবশিষ্ট থাকে রোজ। সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের পক্ষে শহরবাসের কয়েকটি নিত্যনৈমিত্তিক অসুবিধেকে মেনে নেওয়াই বাঞ্ছনীয় ভেবে কাঁদনের মনে জলের ঘাটতি সম্বন্ধে কোন কাঁদুনি নেই।

কাঁদনের স্বভাবটা একটু স্বতন্ত্র ধরনের তার পরিচয় আগেই পাওয়া গেছে কিছু। একালের কাঁদনের সমগোত্রীয় নানা চরিত্রকে বিশ্লেষণ করলে তাদের মধ্যে কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পাবে৷ বিংশ শতাব্দীর পঞ্চদশকের পরবর্তী যুগের সৎ, শৃঙ্খলাহীন, স্বার্থ-বিরোধী তরুণ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কথাই বলা হচ্ছে। লক্ষণগুলো এইরকম।

সময়মতো না নাওয়া, না খাওয়া। সাজ-পোশাকের প্রতি অযত্ন। সমাজের প্রতি অবজ্ঞা। হাতে বিদেশী বই। চোখে চশমা। যে কোন কথাকেই গড়িয়ে নিয়ে যায় তুমুল তর্কে। তর্ক গড়িয়ে যায় আন্তর্জাতিক সমস্যায়। ভালবাসাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে ভালবাসে। রাজনীতির প্রতি গভীর আনুগত্য। অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব, পুঁজিবাদের পতন, সমাজতন্ত্র, শান্তি আন্দোলন ইত্যাদি বাক্যের বারংবার ব্যবহার ঘটায়। নিজের সঙ্গে কথা বলার সময় কান্না, রক্ত, নৈঃশব্দ্য, আহত, বন্দী, হাহাকার, যন্ত্রণা ইত্যাদি শব্দ উদ্‌ভ্রান্ত করে। মেলামেশা করে খুব ছোট্ট সীমাবদ্ধ জগতে, যেহেতু মতের মিল ছাড়া মনের মিল ঘটে না।

কাঁদনের চরিত্রের অসহিষ্ণুতা প্রকট। নিজের যুক্তি, বিশ্বাস, ভাল-মন্দের ধারণাকে সে অন্যের ওপর আরোপ করতে সব সময় সচেষ্ট থাকে। এবং একই সঙ্গে সে প্রত্যাশা করে অন্যেরাও তার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখুক।

কিন্তু আজকের ঘটনাটা অন্যরকম।

অন্যদিনের চেয়ে আজ অনেক সকাল সকাল বাড়ি ফিরল কাঁদন। হাতের খবরের কাগজের একটা বড় বাণ্ডিল আর পকেট থেকে একটা আলতার শিশি রাখল সামনের ঘরের পশ্চিম দিকের দেওয়ালের তাকে। তাড়াতাড়ি জামা গেঞ্জি খুলে গায়ে তেল মেখে বাথরুমে নেমে গেল স্নান করতে। চৌবাচ্চাটা তখন শুকনো।

সারাদিন রোদে বেশি ঘোরাঘুরির জন্যে আর সকাল থেকে প্রায় দুপুর পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে শুধু মাত্র দু-কাপ চা খেয়ে পেটে প্রচণ্ড খিদের আগুন দাউদাউ করতে থাকার ফলে কাঁদনের সারা শরীরে শীতল জলের চাহিদা বা তৃষ্ণা ভীষণ উগ্র হয়ে উঠেছিল। কাঁদন তাকিয়ে দেখল চৌবাচ্চার জল নিকাশের যে গর্তটা সব সময়ে ন্যাকড়া এঁটে বন্ধ করে রাখা হয় সেটা কে যেন খুলে দিয়েছে। সেই সঙ্গে চোখে পড়ল সমস্ত বাথরুমে ভাত, ডাল, আলু-কুমড়োর টুকরো, মাছের কানকো, কাঁটা, কয়লা, ছাই ইত্যাদি আবর্জনা ছড়ানো।

ওপরে রান্নার জন্যে মজুদ রাখা এক বালতি জল নামিয়ে এনে কাঁদন স্নান করল। শরীরটা জ্বালা করছিল বলে সে সাবান মাখবে ভেবেছিল আজ। মাখা হল না।

খেয়ে উঠেই বসে গেল কাগজ আর আলতা নিয়ে। বিকেলের মধ্যে গোটা পনেরো পোস্টার লিখতে হবে তাকে। ঝাঁটার কাঠিতে মোটা করে তুলো জড়িয়ে কাঁদন গোটা গোটা করে লিখল.....

"আগামী ১৭ই চৈত্র শনিবার খাদ্য আন্দোলনের দাবিতে বিরাট···"

চিত্রা পড়তে পড়তেই মন্তব্য করল,—কি ছিরি গো লেখার। ঐ বুঝি আগামী হয়েছে, ঠিক যেন আসামী।

একটা হাসিকে দুজনে ভাগ করে উপভোগ করল কিছুক্ষণ।

লিখতে লিখতে কাঁদন হঠাৎ বলে,—একটা সাদা পাতা দাও তো।

—সাদা কাগজ? হবে না। আমি কি খাতা ছিঁড়বো নাকি?

কাঁদন উঠে গিয়ে জোর করে ছিঁড়ে আনে একটা পাতা। তার ওপর আলতার লাল অক্ষরে স্পষ্ট করে লিখলে—

"অনুগ্রহ করিয়া বাথরুমটিকে বাসন মাজার পর পরিষ্কার রাখিবেন।"

স্নানের জলের অপচয় ঘটানোর কথাটা কি ভাবে প্রকাশ করবে বুঝতে না পেরে কাঁদন আগের কথাকেই একটু বাড়িয়ে দিলে—

"বাথরুমের মেঝে সবসময় নোংরা থাকে।"

লিখে তখুনি আঠা দিয়ে সেঁটে এল বাথরুমের দরজায়।
এর প্রতিক্রিয়া ঘটল অনেক পরে, রাত্রে।
বেশ রাত করে কাঁদন বাড়ি ফিরতেই সবিতা ডাকল তাকে।
—হ্যাঁরে, বাথরুমের দেয়ালে কি কাগজ মেরেছিস তুই?
—ওঃ। কে বললে?
কাঁদন একই হাসিতে ফোটাল তার তাচ্ছিল্য আর ঔচিত্য বোধ।
—আকাশ থেকে পড়লি বুঝি? তুই লিখিস্ নি?
কাঁদন হাসে তার নিজস্ব হাসিটি।
—জান। কী বিশ্রী হয়ে থাকে বাথরুমটা সবসময়। যা-তা। আজকে এক বালতি খাবার জলে চান করতে হয়েছে।
—বেলা দেড়টা পর্যন্ত কে তোর জন্যে জল ভরে রাখবে চৌবাচ্চায়?
—দেড়টা! কই চিত্রাকে, বিশুর মাকে জিজ্ঞেস করতো কটায় ফিরেছি আজ।
—যা বলার মুখে বলতে পারলি না। লিখতে হল?
—মুখে কাকে ডেকে বলবো? বাথরুমকে নোংরা তো আর একজনই করে না। তাই সকলকেই সাবধান করে দেবার জন্যে লিখলাম।
বিরাম বাড়িতে ফিরে গায়ের জামা-কাপড় ছাড়তে না ছাড়তেই নীচের তলার মাধববাবু এলেন।
—আসতে পারি?
বিরাম পিছনে তাকিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।
—আরে। ওঃ, আপনি, আসুন আসুন।
—এই একটু আসতে হল আর কি আপনার আছে। আচ্ছা উনি কোথায়, ঐ যে আপনার......
বিরাম মাধববাবুকে বসবার চেয়ারটা এগিয়ে দেয়।
—কে বলুন তো? কাকে......
বিরাম ভাবলো সবিতাকেই খুঁজছে বুঝি মাধববাবু।

—ঐ যে আপনার ছোট ভাই না......

—ও হো। না, না, আমার শ্যালক......

—ওকে ডাকুন না একবার।

কাঁদন দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। এসে দাঁড়াল বিরামের ডাকে। এবার বিরামের সামনে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল সমস্ত ব্যাপারটা। প্রায় না থেমে, অনর্গল গতিতে মাধববাবু বকে গেলেন। রাগ বা অভিমান বা ক্ষোভের অংশটুকু দ্রুত শেষ করে তিনি এলেন প্রচ্ছন্ন উপদেশ-মেশানো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অংশে। ভাড়াটে হলে কি কি মানুষকে সহ্য করতে হয়। কোন্ সময়ের মধ্যে স্নান সেরে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। একজনের ফেলে-যাওয়া ময়লা আর একজন কেন সাফ্ করবে। বাড়িতে তো ভাড়াটে অনেক। অথচ মাধববাবু তো মাঝে মাঝে মেথর ডাকিয়ে নিজের তদারকে পায়খানার ঘর, ড্রেন, চৌবাচ্চার অপরিচ্ছন্নতা ঘুচিয়েছেন।

বিরাম প্রথম প্রথম বেশ মাথা নেড়ে যথাসময়ে হেসে দু-একটা আলগা 'হ্যাঁ' 'না' 'তাইতো' 'ঠিক বলেছেন' ইত্যাদি জবাব দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। গায়ের ঘেমো জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে আপিস থেকে ফিরে বারান্দার হাওয়ায় একটু সহজ হয়ে গা ছড়িয়ে বসতে না পারার জন্যে তার শরীরে ও মনে একটা অস্বস্তি পাকিয়ে উঠছিল। বিরাম মাধববাবুর গুরুত্বপূর্ণ কথার মাঝখানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে কয়েকবার বললে, না না, ওসব আর হবে না। আমি সাবধান করে দোব, আপনি নির্ভয়ে উঠতে পারেন। প্রথমে হেসে, তারপর একটু গম্ভীর হয়ে, তারপর সামান্য বিরক্তি মিশিয়ে ঐ একই কথাকে নানাভাবে বলার পরও মাধববাবুর মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা দিল না। বিরাম শেষ পর্যন্ত সবিতার ডাকে উঠে গেল মিণ্টুকে দেখতে। সবিতা ভাবছিল, যদি আরও কিছুক্ষণ ভদ্রলোক ঐভাবে হেঁড়ে গলা হাঁকান, আর তাতে মিণ্টুর বহুকষ্টে পাড়ানো ঘুম এক পলকের জন্যেও ভাঙে সে উঠে গিয়ে

সরাসরি মাধববাবুকে বেরিয়ে যেতে বলবে কিনা। অসভ্য, অসভ্য, কাঁদন ঠিকই করেছে। বিরাম উঠে যেতে মাধববাবু কাঁদনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে লাগলেন,—

আপনাদের সমস্যাটা মশাই আমরা বুঝি। ঠিক আমাদের মতো করে বাঁচার কায়দাটা এখনো আপনাদের রপ্ত হয় নি। তাই পছন্দমতো কোন জিনিস না পেলে, না ঘটলে একটু ডিসটারবেন্সেই আপনারা অধৈর্য হয়ে পড়েন, বুঝলেন না। আরে মশাই, এটা কি আর বুঝি না, যে টাকাকড়ির অবস্থা সচ্ছল হলেই আপনারা এই এঁদো গলিতে পড়ে থাকবেন না, বেশ বুঝি, নেহাতই অবস্থা-বৈগুণ্যে পড়ে এখানে এসেছেন। কিন্তু আমাদের কথাটা। ভেবে দেখুন, আমাদের স্বর্গ-মর্ত্যই বলুন বা নরকই বলুন, এইখানেই জীবনটাকে কাবার করতে হবে। ওসব জীবনের রোমান্স-টোমান্স মশাই একদম হজম করে ফেলেছি। কোনরকমে দিনগত পাপক্ষয়।

বিরাম বেরিয়ে এসে বেশ বিনীত গলায় বলে,—দেখুন, মানে আমার ছেলের শরীরটা খারাপ, আপনি যদি কথা বলতে চান তাহলে বারান্দায় বসবেন কি, মাতুর পেতে দিচ্ছি বরং···

—না, না, অসুখ নাকি, মিণ্টুর? এহে, তাই তো কবে থেকে হয়েছে, হল, কাকে দেখাচ্ছেন, আপনাদের চেনা-জানা ভাল ডাক্তার আছে তো? না হয় বলুন, আমার চেনা একজন চাইল্ড স্পেশালিস্টকে ডেকে এনে দেখাই! বাচ্চা-কাচ্চার অসুখে মশাই গাফিলতি করবেন না, এই দেখুন না সেবারে আমার ছোট ছেলেটার সর্দি-সর্দি, জ্বর-জ্বর হল, ভাবলুম এমনি হয়েছে সেরে যাবে, চার পয়সার হোমিওপ্যাথি খাওয়ালে সেরে যেত। তা থেকে গড়াল নিমুনিয়া, টাকার বাপের শ্রাদ্ধ করে তবে ছাড়ল, সে কি কম ভোগান্তি···

বলতে বলতে মাধববাবু নিচে নামবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

বিরাম বন্ধ দরজাটা খুলে দিল তাঁর যাওয়ার জন্যে। সবিতা মনে

মনে জ্বলতে লাগল মাধববাবুর বিরুদ্ধে, বিরামের বিরুদ্ধে, কাঁদনের বিরুদ্ধে। ঘাড় ধরে বার করে না দিয়ে বসে বসে গল্প করল ওরা। কাঁদনের সব কিছুতেই মোড়লি। পৃথিবীকে পাল্টে দেবার স্বপ্ন দেখছে। গাল বাড়িয়ে চড় খেতে হল। ঠাট্টা, ঠাট্টা আর বুঝি না আমি। নেহাতই অবস্থা-বৈগুণ্যে এখানে এসে পড়েছেন। হ্যাঁ, তাই এসে পড়েছি তো। নইলে…নইলে কি? সবিতা ভাবে জীবনকে সে কী ভাবে চেয়েছিল। কত ভাবে চেয়েছিল। ভাবতে ভাবতে একসময় সবিতার চোখদুটো প্রায় অশ্রুময় হয়ে ওঠে।
এই কী আমার জীবন নাকি? এই কি চেয়েছিলাম? বিরাম টাকা নিয়ে ঝগড়া করে আমার সঙ্গে। টাকা কত বড়? টাকা কিছু নিয়, চাইলে, চেষ্টা করলেই মেলে। কিন্তু আমাদের মন এমনি করে বুড়ো হয়ে যাবে? কাজের ফাঁকে একটু সময় পেলে আমরা সাংসারিক জমা-খরচের হিসেব কষবো কেবল? কেবল খরচ কমাবার হিসেব? আমি বড় বারান্দা খুঁজেছিলাম। তিন-চারটে টবে গোলাপ লাগাবো। একটা রেডিও সেট থাকবে। ছবি আঁকার হাত ছিল, ইচ্ছে ছিল। কুমোরটুলি থেকে কাঁচা মাটির ফ্লাওয়ার ভাস্ কিনে এনে নিজে তার ওপর আলপনা আঁকব। বিরামের জন্যে বানাবো ছোট্ট একটা আশট্রে। দেওয়ালে ছবি থাকবে। প্রথমে আমার ছেলে না হয়ে মেয়ে হবে, তাকে গান শেখাবো, যা নিজে শিখতে পারলাম না, রবীন্দ্র সঙ্গীত। বড় বড় ঘর থাকবে। আমার বাবা, আমার ভাই আমার বোন আসবে মাঝে মাঝে। নিজের রোজগারের পয়সায় তাদের খাওয়াবো, দু-দিন প্রাণ ভরে হৈ-চৈ করবো। অথচ সামনে গরম আসছে। একটা টেমপোরারি ফ্যান ভাড়া করতে পারা যায় না। বাথরুমটায় আলো নেই। নিজেরাই কিনে লাগিয়ে দিতে পারি তো একটা বাল্‌ব। কেন দিই না? নিজের পয়সায় অন্যদের উপকার করার ইচ্ছে নেই বলে? নাকি পয়সার অভাব, বিরাম তার

বিরুদ্ধে কিছু বলবে বলে? বিরামের কথার সিঁড়ি বেয়ে আমাকে উঠতে হবে, নামতে হবে, চলতে হবে কেন? আমার নিজের ইচ্ছা, কামনা বাসনা স্বাধীনতা নেই? কেন বিরামের ব্যবহার আমার স্বাধীন অস্তিত্বকে ভুলিয়ে দিতে চায়? বিরাম আমার স্বামী বলে? কিন্তু আমি কারো স্ত্রী হতে চাই না, বন্ধু হবো, বন্ধু হতে চাই, বিরামকেও চাই তেমনিভাবে। কালই যদি আমার জীবনটা শেষ হয়ে যায়, কি পেলাম তাহলে? মরবার আগের মুহূর্তে কেন এই সুখটুকু পাব না যে জীবনে আমি যা কিছু ধ্যান করেছিলাম তার সব পেয়েছি।

আরো অনেকক্ষণ সবিতার চোখ ও মন অশ্রুময় হয়ে রইল। মাধববাবু চলে যাবার পর বিরাম কাঁদনকে রূঢ় স্বরে আর চিত্রা বিশুর মায়ের সঙ্গে হেসে হেসে কি যে বলাবলি করল, সবিতার কানে এল না।

চার

বিকেলের দিকের এক এক্সপ্রেসে সুজিত কলকাতায় আসছিল। থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট। প্রচণ্ড ভিড়। বসবার ছেড়ে দাঁড়াবার জায়গাই বিরল। সুজিতকে অস্বস্তিজনক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কাটাতে হল অনেকক্ষণ। গাড়ি কয়েকটা স্টেশন দ্রুত-গতিতে পার হয়ে আসার পর ভদ্রলোক সুজিতকে নিজের জায়গাটা ছেড়ে দিলেন।

—আপনি বসুন! আমি সামনের স্টেশনে, ব্যাণ্ডেলে নেমে যাব।

ব্যাণ্ডেল? এ গাড়ির তো একেবারে একটাই স্টপেজ—হাওড়াতে গিয়ে। তাহলে? জানলার সামনে মুখ এনে কিছুক্ষণ বাইরে তাকাবার পর সুজিত বুঝল তার ধারণার ভুলটা। গাড়িটা কর্ড লাইনের নয়। মেন লাইনের। একটা লম্বা ছুট দিয়ে পৌঁছবে

ব্যাণ্ডেলে তারপর সব স্টেশনেই ধরবে। তার মানে হাওড়া পৌঁছতে সন্ধ্যে। সবিতাদি তো তখন স্কুল থেকে ফিরে আসবে। তাহলে আর কি হল। সবিতাদিকে তো চমকে দেওয়া যাবে না। সুজিত বেশিক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না মনের অস্থিরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। মাথার পাট-করা চুলগুলো হাওয়ায় মাথা ছাপিয়ে কপালে এলোমেলো উড়ছিল। চোখ জ্বালা করছিল বালির মতো কিছুর আঘাতে। ট্রেনের গতি অনেকটা থেমে এসেছে। এবার সুজিতের চিন্তার জগৎটা ক্রমে ক্রমে ভরে উঠল একক জীবনের নিঃসঙ্গ অনুভূতিতে। তার দৃষ্টি ও চিন্তার জগৎ থেকে মুছে গেল ট্রেনের কামরা ভর্তি নানা বিচিত্র মানুষের বিশৃঙ্খল ওঠানামা, কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা জীবন্ত পারিপার্শ্বিক। সুজিত ব্যাগ থেকে টানল একটা বই। অ্যানা কারেনিনা। বইয়ের প্রায় মাঝখান থেকে কয়েকটা পাতা খুঁজে নিয়ে তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। যেখানে লেভিন আর কিটি টেবিলের ওপর চক পেন্সিলে কিছু সাংকেতিক অক্ষর সাজানোর মধ্যে দিয়ে পরস্পরকে নিজেদের মনের গভীর তলদেশের সংবাদ জানাচ্ছে। কিটি লেভিনকে বললে, Yes. লেভিনের সমস্ত জীবন উপচে পড়ল সুখের ধারায়, 'me.? happiness! Its happiness tha's come over me!' সুজিত আবেগ দিয়ে কয়েকবার উচ্চারণ করল 'happiness' কথাটি মনে মনে। ঠিক এমনিই তো ঘটেছিল আমাদের। কি প্রবল স্পর্ধায় স্পন্দিত ছিল সেই মুহূর্তটি। কত দুরূহ জটিল বেদনা বাসনা দিয়ে গড়া একটি অমার্জনীয় ইচ্ছা কত সহজে নিরাপদে নির্বিঘ্নে হঠাৎ কুয়াশা কেটে রোদ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার মতো উষ্ণতায় প্রকাশ পেয়ে গেল। আমার চেতনে ছিল পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ-এর বিচার বোধ। অবচেতনে ছিল এক অমার্জনীয় ইচ্ছা। রক্তের স্রোতে যে ইচ্ছা বহুদিন ধরে কলরব করেছে, শরীরকে ক্লান্ত করেছে প্রতিদিনের বিরুদ্ধ সংঘাতে। আমার কেবলই মনে হয়েছিল ক্ষয়,

ধ্বংস, সর্বনাশ এমনি ভয়ংকর কোন পরিণতির কথা। মনে হয়েছিল একটা বিরাট তোরণের মধ্যে মাথা গলিয়ে দিলাম আমি, এবার যেখানে গিয়ে পৌঁছব সে রাজ্য আমার অচেনা, রহস্যের আঁধারে ভয়াবহ, প্রত্যাবর্তনের পথ নেই, আছে কেবল প্রত্যহ প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন সংঘাতে, বেদনায় ক্ষয়ে, বিষণ্ণ আর্তিতে নিজেকে ভেঙে-চুরে পরিবর্তিত করার পরিস্থিতি।

আমার লেখাটার দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে সবিতাদি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার সাহস ছিল না সেই মুখের দিকে তাকানোর। আমি তখন নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম ক্ষমা-প্রার্থনার জন্যে। সবিতাদি পরস্ত্রী, তার সন্তান আছে। আমি শিশু, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি এখনও অপরিণত, আমার অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডল এখনও কত অজ্ঞতায় ভরা। আমার চিত্ত কেন শুদ্ধ নয়? আমার ইচ্ছায় কেন পাপ? আমি কেন নির্বোধের মতো হাত বাড়ালাম অনধিকারের দিকে।

সবিতাদি হাসল। মৃদু, একটুখানি। আমি ভাবলাম এই হাসির অর্থটা কি? একি আমার স্পর্ধার প্রত্যুত্তরে অবজ্ঞার হাসি? নাকি সবিতাদি আমাকে বিশ্বাস করল, নির্ভর করল আমার সতোৎ-সারিত সততায়? আমি তখন চিৎকার করছিলাম মনের ভিতরে, আমাকে ক্ষমা কর সবিতাদি, আমাকে বিশ্বাস কর, কোন অসদুদ্দেশ্যে নয়, তোমাকে শ্রদ্ধা করে, তোমাকে সামান্য সুখী করার উদ্দেশ্যেই কথাগুলো বলেছি।

সবিতাদি হাসল আরো। আমার ভাবতে ইচ্ছে করল এ হাসি তার সমস্ত অস্তিত্বের মুক্তির উপলব্ধি হোক।

হাতের লাল উলবোনা থামিয়ে উঠতে গেল সবিতাদি। উলের গুলিটা কোঁচড় থেকে গড়িয়ে গেল মেঝের অনেক দূর। গোছাতে গিয়ে গিঁট পাকিয়ে জড়িয়ে গেল সব।

সবিতাদি বারান্দায় ডাকল আমাকে। আমরা দুজনে সেদিন অন্তরে

প্রায় প্লাবনের মতো কথার উচ্ছ্বাস নিয়ে নির্বাক দাঁড়িয়েছিলাম কতক্ষণ।

কী অপূর্ব উচ্ছল নীরবতা। কী মুখরিত মৌন। সেই মুহূর্তে সবিতাদিকে আমার মনে হয়েছিল কত তরুণী। আর আমার নিজেকে মনে হয়েছিল দায়িত্বশীল এক পুরুষ। আমি ভালবেসে ফেলেছি। সুতরাং আমার খুব 'সিরিয়াস' হওয়া উচিত। ছ্যাবলামো, ফাজলেমো, রসিকতা, যা আমার মজ্জাগত, ভুলতে হবে।

সেদিন কতক্ষণ আমরা দুজন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। আমি আত্মহারা হয়েছিলাম এলোমেলো অদ্ভুত সব চিন্তার মধ্যে। আর কী আশ্চর্য, কী দৈব, সেদিন কাঁদন কিংবা চিত্রা কিংবা বিরামবাবু কেউই বাড়ি ফিরল না তাড়াতাড়ি, অখণ্ড মৌনের ভিতর দিয়ে দুটি হৃদয়ের এক অন্তরঙ্গ রাখী বন্ধনকে ভেঙে দিতে।

একসময়, যেন পৃথিবীর সমুদ্র পর্বত পাড়ি দিয়ে আসার পথশ্রমে ক্লান্ত অবসন্ন একটা শব্দ অথবা ধ্বনি অথবা কোমল আওয়াজ কানে এল আমার।

—কি ভাবছো?

পাশে দাঁড়ানো সবিতাদিই প্রশ্ন করল আমাকে। জানি। তবু মনে হল এ-কোন মানুষের কণ্ঠস্বর নয়। কোন ফুলের ভিতরকার পাপড়ী খোলার শব্দ, এত অস্পষ্ট, এত অস্ফুট, ক্ষীণ, এমন ক্রন্দনাতুর।

আমি খুব ভেবে কি যেন বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ যেন একটা সুখের দমকা হাওয়া এক ধাক্কায় আমাকে হাসিয়ে দিলে। আমি সলজ্জ হেসে ফেলেছিলাম। হাসতে হাসতে বলেছিলাম, —আমার খুব ভাল লাগছে। অনেকক্ষণ থেকে আমার কি ইচ্ছে করছে জান; এক লাথিতে বারান্দার এই রেলিঙটাকে ভেঙে ফেলি। আমার মনে হচ্ছে ভাঙা লোহার রেলিঙটা ঠিক চড়ুই কিংবা শালিকের মতো উড়তে উড়তে আকাশের দিকে হারিয়ে যাবে। দেখবো।

সবিতাদি আর কোন কথা বলল না। আবার সেই ভীষণ সুন্দর স্তব্ধতা।

একটু পরে সবিতাদি সোজা হয়ে দাঁড়াল রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ানোর অবনত ভঙ্গী থেকে। সবিতাদির বুকের ভিতর থেকে ফুটে উঠল শুকনো কাগজের খড়খড় একটা আওয়াজ। ওটা সবিতাদির আত্মার ভিতরকার কোন আর্তস্বর নয়। কাগজেরই শব্দ। চিত্রার খাতায় যে পাতায় এলোমেলো আঁচড় কাটতে কাটতে সবিতাদির পাশে বসে সবিতাদি যে সব কথা বলছিল তার কিছু কিছু টুকরো অন্যমনস্কভাবে লিখতে লিখতে আমি হঠাৎ, স্বপ্নের ঝোঁকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো, কোন পরিণাম না ভেবে, একেবারে আকস্মিকভাবে লিখে ফেলেছিলাম 'আমি তোমাকে ভালবাসি, খাতার সেই পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে সবিতাদি ভাঁজ করে বুকের ভিতরে, ব্লাউজের মধ্যে রেখেছিল লুকিয়ে।

বারান্দা থেকে আমরা ঘরের ভিতরে এসে বসেছিলাম। সবিতাদি নিজে চা করে নিয়ে এল। চা খাওয়া শেষ হলে হঠাৎ সবিতাদি বলেছিল,—চল, তোমাকে পেঁ ৗছে দিয়ে আসি।

—কোথায়?

—ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত।

এর আগে কোনদিন সবিতাদির সঙ্গে পাশাপাশি রাস্তায় হাঁটি নি। চলতে চলতে সবিতাদি অনেক কথা বলেছিল। তার অনেকটাই শুনি নি। অনেকটা হয়তো ভুলে গেছি আজ। আমি লজ্জায় মাথা সোজা করে রাখতে পারছিলাম না। আমার মনে হচ্ছিল, সমস্ত পৃথিবী এই মুহূর্তে জেনে গেছে আমাদের এই অন্তরঙ্গ ভালবাসার খবর। রাস্তার দুপাশে যত বাড়ি সমস্ত বাড়ির জানলায় বারান্দায় শত শত নর-নারী বুঝি উৎসুক উদগ্রীব উচ্ছ্বসিত চোখে দেখছে আমাদের দুজনের শোভাযাত্রা। কলকাতা শহরের যান্ত্রিক কলরব সেদিন আমার কানে বেজেছিল সানাইয়ের মতো, বিষণ্ণ, সুন্দর রোদনভরা সুরে।

সুজিত নিজের মনেই হাসল। এক এক সময় কী করে যে মনের মধ্যে এই রকম অস্বাভাবিক, অবাস্তব, অলৌকিক অনুভূতি জন্ম নেয়, এ-এক রহস্য।

কোন স্টেশন নয়, রাস্তার মাঝখানে ট্রেনটা থেমে দাঁড়াল হঠাৎ। সুজিতের ভাবনাগুলোও থমকে গেল।

সুজিত মাথা নীচু করে অ্যানা কারেনিনার যে পাতাগুলোর ওপর চোখ রেখে এতক্ষণ ভাবছিল সেটা বুজিয়ে ফেললে। এপাশ ওপাশ তাকাল একবার। আগের থেকে অনেক পাতলা হয়ে এসেছে গাড়ির ভিড়টা। সুজিত একটু গা ছড়িয়ে বসল। কম্পার্টমেণ্টের কোণে কয়েকজন ভদ্রলোক রাজনীতি নিয়ে জোর তর্ক-বিতর্ক করছিল। সুজিত লক্ষ্য করল যার কথাগুলো বেশি যুক্তিহীন তার আস্ফালনটাও তত বেশি। অন্যদিকে যার সঙ্গে সুজিতের নিজের মতামতের ঘনিষ্ঠতা আছে তার পক্ষে লোকসংখ্যার মতো প্রতি-বাদের ভাষাটাও ক্ষীণ। সুজিত দরজার কাছাকাছি একটি মেয়ের দিকে তাকাল। বেশ আকর্ষণীয় স্বাস্থ্য। কিন্তু সুজিতের সেই সব মেয়েকে আদৌ পছন্দ হয় না যাদের পোশাক-পরিচ্ছদে প্রখর উচ্ছলতার সঙ্গে কিছু কিছু অশ্লীলতারও আভাস লেগে থাকে। মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সুজিতের নিজস্ব কিছু অভিমত আছে। অল্প-স্বল্প যে দু-একজনের কাছে সুজিত তার সবিতাদির সম্পর্কে গল্প করেছে তাতে পোশাক-পরিচ্ছদের প্রসঙ্গটাকে সে স্থান দিয়েছে গোড়ার দিকে। সুজিত এইরকম বলে থাকে,—

সবিতাদির চেয়েও অনেক সুন্দরী মেয়ে পৃথিবীতে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ও রকম রুচি-বোধ, আশ্চর্য, জানিস কোনদিন দেখলাম না মুখে কসমেটিক্‌স পেণ্ট করতে। আর কাপড় পরে, অধিকাংশই সাদা, পাড়টা সবুজ, কিংবা—একেই বলে নিরাভরণ সৌন্দর্য। দেহটা যেন অন্তরের আয়না।

সুজিত ফিরে এল তার পুরনো ভাবনায়।

সবিতাদিকে কি অ্যানা কারেনিনা পড়াবো ? এর আগে এক ছুটির দুপুরে সুজিত জঁা ক্রিস্তফের অংশ বিশেষ পড়ে বুঝিয়েছিল যে মহৎ সাহিত্য মানুষকে 'ফ্রাসট্রেশান' থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখে। সবিতাকে সুজিত তাই সময় পেলেই অবিস্মরণীয় বহু সাহিত্যের সারাংশ শোনায়, সবিতার মনের আত্মঅবক্ষয়ের চিন্তাগুলো নিশ্চিহ্ন করে দিতে। অ্যানার সঙ্গে সবিতার চরিত্রের সমতা উপলব্ধি করেই সুজিত বইটাকে শেষ করেছে দ্রুত গতিতে। কিন্তু অ্যানার জীবনের অপঘাত মৃত্যুর অনিবার্যতাকে সে সবিতার জীবনের শেষ অধ্যায় ভাবতে গিয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। শেষটুকু বাদ দিয়ে কি শোনানো যায় না ? কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করে শেষটা কি ? সুজিত মনে মনে ভাবে আর এমন সাহিত্য কিছু আছে কিনা যেখানে অ্যানার মতো চরিত্রের পরিণতি ঘটেছে কোন পরম সার্থকতায়।

গাড়ি এসে থামল হাওড়া স্টেশনে। একরাশ ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে এগোতে গিয়ে সুজিত বার বার বাধা পেল। সে ভাবল শহর জীবনে মানুষের খণ্ড-অস্তিত্বের কথা। শৃঙ্খলা এখানে শৃঙ্খল। এই বিশৃঙ্খল ভিড় প্লাটফর্ম ছেড়ে পথে নামবে। তারপর ঝুলবে ট্রাম বাসের পাদানি পর্যন্ত ছাপিয়ে। অ্যাকসিডেণ্ট ঘটবে। সুজিত চাইছিল তার মনের গতির মতো দ্রুততায় সবিতার বাড়ি পৌঁছে যেতে।

স্টেশনে বড় ঘড়ির তলার কে যেন হাত রাখল সুজিতের পিঠে।

—হ্যাল্লো, সুজিত—

সুজিত পিছনে তাকিয়ে বারীনকে চিনল। স্মার্ট পোশাক। ব্যাক ব্রাশ করা চুল। সেভ্ করা পরিচ্ছন্ন মুখ। সুজিতের চেহারা তখন তার উল্টো। ট্রেন জার্নিতে সারা মুখে একটা ক্লান্তির ধূসরতা। চুল এলোমেলো। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ আর জামা-কাপড়ের অপরিচ্ছন্নতা ও অতিরিক্ত ভাঁজ কেমন একটা গ্রাম্যতার ছাপ ফুটিয়েছে চেহারায়।

—কি খবর ? কোথা থেকে। দেশে গিয়েছিলি ?

—হ্যাঁ। তুই—

—আমি স্টেশনে এসেছিলাম একজনকে তুলে দিতে।

—একজনকে মানে কাকে···

—আমার লেটেস্টকে।

সুজিত হঠাৎ কি যেন বুঝতে পেরে গম্ভীর হল।

প্রেম, নারী জাতি, আধুনিক কবিতা, হিন্দী সিনেমা, রাজনীতি, ইউনিভার্সিটি এই জাতীয় কিছু বিষয়ের ওপর বারীনের চূড়ান্ত সিনিক মন্তব্যের সঙ্গে সুজিতের যথেষ্ট পরিচয় আছে।

—আচ্ছা চলি···

সুজিত এগোতে গেল। বারীন তার জামার কলার ধরে টান দিলে।

—দাঁড়া, কোথা যাচ্ছিস।

—না, আমার দরকার আছে।

—ধ্যাৎ, তোর আবার দরকার কি? আয় আমার সঙ্গে, রেস্তোরাঁতে গিয়ে বসি। কফি খাব।

সুজিতের চা-তেষ্টা পেয়েছিল সত্যিই। তবু সবিতার কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার আগ্রহে কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করল বারীনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে।

দুটো কফির অর্ডার দিয়ে বারীন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। সুজিত সিগারেট খায় না জেনেও তাকে একটা অফার করলে।

—একটা খা, খেলে চেস্টিটি যাবে না।

সুজিত সিগারেট খায় না। মনের মধ্যে সবিতার জন্যে উদ্বিগ্নতা আর বারীনের জন্যে বিরক্তি নিয়েও সাধারণভাবে হাসে।

কফি এলে তাতে প্রথম চুমুক দিয়ে বারীন বলে,—আর একটু আগে তোকে পেলে আলাপ করিয়ে দিতুম। খড়্গপুর চলে গেল ছটা বাইশের ট্রেনে। দারুণ মাল, জানিস।

মাল। সুজিত আবাল্য যে গ্রাম্য পরিবেশে মানুষ সেখানে মাল

কথাটার অর্থ পণ্যবস্তু। শহরের শিক্ষিত যুবকের মুখে ঐ শব্দের ভিন্ন প্রয়োগের বাচ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থ সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা নতুন। বারীনকে এর আগে এই শব্দ কখনো ব্যবহার করতে শোনে নি। এর আগে সুজিতকে ছাড়া-ছাড়া অনেক মেয়ের গল্পই শুনিয়েছে বারীন। প্রায় বলা যায় গড়ে তিন মাস অন্তর সে এক একটি নতুন মেয়েকে ভালবাসে। এবারেরটি হয়তো সত্যিই বারীনের পক্ষে খুব আকর্ষণীয় হয়েছে। সেই উপলব্ধির প্রাবল্যকে সার্থকভাবে প্রকাশ করার জন্যেই কি বারীন মাল ছাড়া অন্য কোন বিশেষণের ব্যবহার ঘটাল না? এ দৈন্য কি জ্ঞানের না বিশুদ্ধ আবেগের?

—আগে যে মেয়েটিকে ভালবাসতিস? তার সঙ্গে···

—ওঃ, তুই মিনতির কথা বলছিস। তাকে তো অনেকদিন ক্যানসেল করেছি। সী ওয়াজ টু মাচ ভালগার। দু-দিন প্রেম গড়াতে না গড়াতেই বলে বিয়ের কথা। আমার কি দায় পড়েছে? হোয়াই সুড আই একটা মেয়েকে বিয়ে করে সারাজীবন ঘাড়ে বইবো? অ্যাম আই এ চাইল্ড, যে সারাদিন ধরে চুষবো একটাই লজেন্স? মেয়েদের কাছ থেকে আমি চাই ফ্রেণ্ডশিপ, নাথিং মোর, নাথিং লেস্।

বন্ধুত্ব কথাটার সঙ্গে সঙ্গে সুজিতের অন্যমনস্ক মনে আবার জাগল সবিতার স্মৃতি। সবিতা সুজিতের কাছে বন্ধুত্ব চায়। সুজিতও প্রতিশ্রুত সবিতাকে অমেয় বন্ধুত্বদানের আনন্দে ভরিয়ে রাখতে। এ বন্ধুত্বে দেহের দরজা বন্ধ। অন্তর অবারিত। বারীনও তাই বলল। তবু কোথায় একটা গরমিল আছে দুয়ের মধ্যে।

—আচ্ছা, বারীন, কোন গভীর স্তরের ভালবাসা, ভালবাসা না বলে বন্ধুত্বই বলি যদি, বন্ধুত্ব কি স্কুলের ব্ল্যাক-বোর্ডের লেখার মতো বার বার লিখে বার বার মোছা যায়?

—দ্যাখ, লর্ড কর্নওয়ালিশের পার্মানেন্ট সেটেলমেণ্ট অনেকদিন বাতিল হয়ে গেছে।

—তাহলে কি ? এই ধরনের ফ্রিবলিটি আমার ভাল লাগে না।
—তাহলে কিছুই নয়। মেয়েদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কিছুই নয়। ওদের সঙ্গে সিরিয়াস বন্ধুত্বও করা যায় না। তার কারণ ওরা পুরুষের চেয়ে অনেক ইনফিরিয়র। সাহিত্য বোঝে না। রাজনীতি করে নিছক ফ্যাশান হিসেবে। বিয়ের পর কলেজে পড়া বিদ্যে উনোনে দুধ গরম করতে করতে ফুঁকে যায়। তবু যদি কারো সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব ঘটেও কিছুটা, তাকে বিয়ে করলেই সব হালুয়া হয়ে যাবে। যে ইলিশের পেটে ডিম থাকে তার স্বাদটা কি রকম পান্‌সে দেখেছিস তো। বিয়ে করলেই মেয়েদের পেটে ডিম গজাবে। তারপর সব পান্‌সে।
কফি খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল। সুজিত বললে,—উঠি।
—উঠছিস কেন ? কথাগুলো তেতো লাগছে বুঝি ? তোর এখনো মেয়েদের 'মা' বলে ডাকবার বয়স কাটে নি। এডোলেসেণ্ট।
বারীন হাসিতে মুখ ভরাল।
কথাগুলো সুজিতের কাছে সত্যিই তেতো খানিকটা। তার চেয়েও তেতো লাগল বারীনের মুরুব্বিয়ানা। যেন নারী-প্রকৃতির যাবতীয় রহস্য ও জ্ঞান তার ধারণার আয়ত্তে। বারীনই কফির দামটা মেটাল। বাইরে হুইলারের স্টলটার কাছে এসে সুজিত তার মনের প্রবল বিক্ষোভ প্রকাশ করে ফেললে।
—আমি বিশ্বাস করি না।
—কিসে ?
—মেয়েদের সম্পর্কে তোর বক্তব্য। আমার কাছে সাহিত্যের চেয়ে রাজনীতির চেয়ে জীবন অনেক বড়। আমি বিশ্বাস করি জীবনে বন্ধুত্ব ঘটে। যার কাছে আমি নিজেকে উন্মুক্ত করতে পারি, যার মানস-লোকের স্পর্শে আমার চেতনার এক্সপ্যানশন, বিস্তৃতি ঘটে, আমার আত্মার যে ঘনিষ্ঠ সহোদর তাকেই বলি বন্ধু। সে রকম বন্ধু লাখে লাখে মেলে নাকি ? মেয়েদের সম্বন্ধে তুই যা বলেছিস তার

কোনটাই বিশ্বাস করি না আমি। আমি অন্তত পৃথিবীতে এমন কয়েকজনকে চিনি যাদের কাছে রাজনীতি রক্তের জিনিস, আঁতুড় ঘরের চার দেয়াল যাদের জীবনের চতুঃসীমা নয়। রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশীওয়ালা' পড়েছিস, তারা হচ্ছে সেই ঘোমটা-খসা নারী, 'হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ বাল্মীকির'। পৃথিবীটাকে অত ছোট করে দেখিস্‌নে বারীন। মানুষের জন্যে খানিকটা অন্তত শ্রদ্ধা রাখিস।

সুজিত শেষ দিকে তোতলাচ্ছিল। উত্তেজিত হলে ওর কথায় তোতলামি আসে। সুজিত তার চেনা জগতের মেয়ের কথা বলবার সময় স্মরণ করেছিল মাত্র দুজনকে। মিতুদি আর সবিতা। যদিও মিতুদির সঙ্গে তার নিজস্ব ঘনিষ্ঠতা খুব গভীর নয়, অন্যদের মুখ থেকে শুনে শুনেই তার শ্রদ্ধার পরিমাণ ভারী হয়েছে। বারীন অদ্ভুত চতুর হাসি হাসল সারা মুখ জুড়ে।

—প্রেমে পড়েছিস ?

ঠাট্টা মিশিয়ে প্রশ্ন করল সুজিতকে। সুজিতও মরিয়া হয়ে উঠেছে বারীনের সঙ্গে পাল্টা লড়ায়ে।

—কেন, কি দরকার ? প্রেমে পড়লেই যে লোকে মেয়েদের স্তব করে এই অর্বাচীন উক্তিকে আর একবার তুই প্রমাণ করবি বলে ?

—হ্যাঁ কাছাকাছিই ধরেছিস। মেয়েদের স্তব নয়। প্রথম প্রেমে পড়লে আর সদ্য রাজনৈতিক দলের সদস্য হলে, তোর বয়সী ছেলেরা রাতারাতি মানবপ্রেমের হোলসেলার এণ্ড রিটেলার হয়ে ওঠে এটা জানিস তো।

—না, জানি না, তোর বয়সটা কত জানতে চাই। প্রাচীন বট না অশ্বত্থ ?

বারীন উত্তেজিত হয় না। হাসির ছলে পরিহাস করায় সে যথেষ্ট পরাঙ্গম।

—বয়সে কি আসে যায়। অভিজ্ঞতাটাই আসল। ওটা বাদ দে, তোর প্রেমের 'গপ্পো' বল। প্রেমে পড়েছিস বুঝি। মুখ দেখে মনে হচ্ছে—

'গপ্পো' কথাটা এমন শীতলতা দিয়ে বারীন উচ্চারণ করল যেন প্রেম করাটা যে বানানো, অবাস্তব গল্প শোনার চেয়ে আর কিছু নয়, এটাই সে ইঙ্গিতে বোঝাতে চায়। সুজিত সবিতার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার কাহিনী ইতিপূর্বে যে দু-একজনকে বলেছে তাতে সে কখনো প্রেমে পড়ার কথা বলে নি, বলেছে একটি মেয়েকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বারীনের কাছে অভিজ্ঞতায় খাটো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় এবং বারীনের প্রতি খানিকটা বিদ্বেষবোধ থেকেই সুজিত উত্তর দিল,—'হ্যাঁ'।

—তাই নাকি? বাঃ। চুমু-টুমু খেতে দেয়?

বারীনের অলক্ষ্যেই সুজিতের মুখ রক্তাভ হল। সুজিতের মনে হল এত তর্ক-বিতর্কের পরেও সে যেন বারীনের কাছে অভিজ্ঞতায় খাটো ও অপরিণত হয়ে থাকছে। 'চুমু' শব্দটা সে মুখ দিয়ে স্পষ্ট করে আজও উচ্চারণ করতে পারে নি, মুখ দিয়ে গ্রহণ করা আরও সাংঘাতিক। সুজিতের চোখে সবিতার ঠোঁট দুটো ভেসে উঠল। করুণ হবার মতো ব্যথা চঞ্চল হল তার বুকের মধ্যে। এলোমেলো ভিড় বার বার ওদের দুজনকে ছাড়াছাড়ি করে দিচ্ছিল। বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছেই সুজিত মানিকতলা যাওয়ার এইট-বি বাসে চেপে বসল। বাসস্ট্যাণ্ডে স্বাভাবিকভাবে 'চলি' কথাটা বলতেও দ্বিধান্বিত হল সে। মনের ক্ষোভকে চাপা দিয়ে মুখের সৌজন্য প্রকাশ করতে পারল না।

হাওড়া ব্রিজ আলোর মালায় সাজানো। গঙ্গার জলে জোনাকির মতো নেচে বেড়াচ্ছে অজস্র আলোর বিন্দু। জাহাজের ভেঁপু বাজল কয়েকবার। দূর সমুদ্রের জলদ-গম্ভীর প্রবাহের মতো শব্দ।

তিরিশের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি লিখেছিলেন ট্রাম হল নিয়মতান্ত্রিক, বাস স্বেচ্ছাচারী। অর্থাৎ বাসের যাত্রাপথ অনেক বেশি স্বাধীন ও স্ববশ। ট্রামের পক্ষে নির্দিষ্ট বাঁধা-ধরা লাইনের

বাইরে অধঃপতন ছাড়া অন্যগতি নেই। এই হিসেবে অনেক আগেই সুজিতের মানিকতলার মোড়ে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু স্ট্রাণ্ড রোড ও বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে সরকারী বাস ও প্রাইভেট মোটরের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটার ফলে সুজিতের গাড়িকে অনেকটা সময় পথের মাঝখানে আটকে থাকতে হল। সুজিত একবার ভাবল গাড়ি থেকে নেমে হেঁটেই মানিকতলা পর্যন্ত যাবে কিনা। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই সে আশঙ্কিত হল এই ভেবে যে, যদি ইতিমধ্যেই গাড়ি চলাচলের পথ পরিষ্কার হয়ে যায় ?

সুজিত ভীষণ রকম অসহায় বোধ করল নিজেকে। বারীনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই এই অনুভূতিটা ক্রমশ পেয়ে বসছে তাকে। বারীন আর এই যান্ত্রিক শহরের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি ?

বারীনের মতো আরও অনেককে সুজিত জানে যাদের চরিত্র সম-পর্যায়ের। ভালবাসার প্রতি এদের এমন ঘৃণা কেন ? অথচ কেন এরা নারীসঙ্গের প্রতি লুব্ধ ? এরা রবীন্দ্রনাথের গান গায়। অথচ অশ্লীলতার খাদ না মিশিয়ে কথা বলতে পারে না। বন্ধুত্ব কথাটার তাৎপর্যকে এরা তেবড়ে-তুবড়ে বাঁকিয়ে মানবিকতাহীন সহানুভূতি-হীন, নিছক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। কেন এমন হয়ে গেল ?

অথচ এই বারীন একদিন কবিতা লিখতো, মানুষকে ভালবাসতো, শ্রদ্ধা করতো, শব্দ দিয়ে সাজানো স্বপ্ন রচনা করতো পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্যে। আমরা এক সঙ্গে জেল খেটেছি। অনশন ধর্মঘট করেছি। লাঠি, গুলি ও মৃত্যুকে ভয় করি নি। হ্যাঁ, আমাদের রাজনীতি বার বার ব্যর্থ হয়েছে আমি স্বীকার করি, দেশের মানুষকে আমরা সঠিক নেতৃত্বের পথ ধরে কোন সম্ভাবনার জগতে এগিয়ে আনতে পারি নি স্বীকার করি। তার ফলে আমাদের ধ্রুব ও অখণ্ড বিশ্বাস অনেক সন্দেহ-সংশয়ে টাল খেয়েছে—সত্যি। আমরা

ক্রমশ রাজনীতির পথ থেকে দূরে সরে যেতে চাইছি তাও সত্যি। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো……

এতক্ষণে এঞ্জিনের শব্দে সমস্ত গাড়িটা কেঁপে উঠল। গাড়ির দু-পাশে জমে থাকা ঠেলা গাড়ি, রিক্শা আর মালবোঝাই লরিগুলো চঞ্চল হল এবার। লরির ড্রাইভার ঠেলা গাড়ির চালককে খিস্তি করে গাল দিল। রিক্শাগুলোকে আটকে দিল পুলিস। দু-একটা প্রাইভেট কার অধৈর্য হয়ে হর্নের কর্কশ ও সুরেলা শব্দে যেন ব্যস্ত ট্রাফিক পুলিসের কানে পৌঁছে দিতে চাইল তাদের আগাম খালাস করে দেওয়ার আর্জি। বাসের কণ্ডাক্টর বার বার সজোরে ঘণ্টা বাজাল, গাড়ির পিঠে হাত চাপড়ে ঢাকের মতো শব্দ তুলল, থেমে থমকে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোতে এগোতে সুজিতের গাড়িটা আগের চেয়ে আরও অনেক যাত্রীদের ভিড় নিয়ে দ্রুতগতি হল। সুজিত এবার ভাবতে লাগল সবিতার চেহারা ও তার সঙ্গে ভাবী কথোপকথনের সংলাপ।

বাস থেকে নেমে সবিতাদের বাড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত পথ হেঁটে আসতে আসতে সুজিত ঠিক করল, খুব আস্তে সিঁড়ি ভাঙবে যাতে জুতোর শব্দ না ওঠে, আর পিছন থেকে সবিতার চোখ দুটো টিপে ধরবে সে। সবিতার কপট অভিমান সুজিতের ভালবাসা জানাবার এই নতুন পদ্ধতির আকস্মিকতায় উবে যাবে।

জুতোর কোন রকম শব্দ না করেই সুজিত দরজাটায় আস্তে ঠেলা দিল। খুলল না। আর একটু জোরে ঠেলল। তবু খুলল না। বোঝা গেল ভেতর থেকে খিল দেওয়া। কড়া নাড়ল একবার। আরও একবার। রান্নাঘরের দিক থেকে বুড়োটে গলার হাঁক এল—কে গা?

বিশুর মার গলা। বিশুর মা ছাড়া আর কেউ নেই নাকি? তাহলে সবিতাদি কি…

বিশুর মা দরজাটা খুলে দিল। সুজিতকে দেখে হাসল একটু।

—আগো বাবু, বলি এতদিন পরে এসলে ?

—এঁ্যা, হঁ্যা, দেরি হয়ে গেল। এরা সব কোথায় ?

—কারা বল দিনি ?

—এই এরা সব। কাঁদন চিত্রা-টিত্রারা।

সুজিত কিছুতেই সবিতার নামটা উচ্চারণ করতে পারল না। যেন দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে তাদের ঘন বন্ধুত্বে কিছু অপরিচয়ের সংকোচ এসে মিশেছে। বিশুর মা কিন্তু জবাব দিল তার না বলা প্রশ্নটারই।

—মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করতেছ তো। তিনি যে বেরুলেন এই ঘণ্টা খানিক আগে। আপনি বোসো না। এসে পড়বে'খন।

—কোথায় গেছে জান না ?

—মা আর বাবু তো এক সঙ্গে বেরুল। ছেলেটার শরীর খারাপ হোছিল। কাল থিকে আছে একটু সুবিধের দিকের! তাকেও তো সঙ্গে নিয়ে বেরোল। আপনি ভিতরে এসে বোসো না।

বিশুর মা সামনের ঘরের আলো জ্বেলে দিল। সুজিত সেটা নিভিয়ে দিয়ে আলো জ্বালল সবিতার শোয়ার ঘরের। বিছানায় গিয়ে বসল। বিশুর মা জিজ্ঞেস করলে,—চা করে দেব ? সুজিত মাথা নেড়ে জানাল, দিতে পার। বসে থেকে চোখ দিয়ে স্পর্শ করল সবিতার ব্যবহার্য বস্তুগুলোকে। চামড়ার সুটকেশের ওপর হলুদ পাড় একটা শাড়ি এলোমেলো ছড়ানো ছিল। সেটার দিকে তাকালেই মনে হয় সবিতা আশেপাশে কোথাও আছে, এখুনিই এসে পড়বে। জানলায় টাঙানো ময়লা শাড়ি, মিন্টুর জামা, বিরামবাবুর ধুতি, গেঞ্জি। হ্যাঙারে ঝুলছে পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির ওপর একটা ব্লাউজ। এঁ্যা, পাঞ্জাবির ওপর ওটা কি ? সাদা ব্লাউজ ? সবিতাদির ? ব্লাউজের বগলের কাছে ঘামের দাগ। কাঁধের কাছে লাল সুতোর একটু নকৃশা। সবিতাদি আর বিরামবাবু একসঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন। এক হ্যাঙারে ঝুলছে

দুজনের পরিচ্ছদ। তাহলে কি···? সাদা ব্লাউজ আর সাদা পাঞ্জাবি কি একটা সংকেত? সবিতাদি কি আমাকে জানাতে চায়,—সুজিত, কাজের খাঁচায় আটকানো বিরামের বদ্ধ হৃদয় এতদিন পরে আবার ভালবাসার আকাশের দিকে ডানা ছড়িয়েছে।

সুজিত এমনভাবে কথাগুলো ভাবল যেন ব্লাউজের সাদা পটভূমিতে লেখা ছিল কথা কটি।

অল্প হাওয়ায় পাঞ্জাবির হাতা দুটো ব্লাউজের গায়ে ঠেকল। সুজিতের চোখে স্পষ্ট হল একটা আলিঙ্গনের ছবি। সবিতার সাদা শরীরটাকে সে প্রত্যক্ষ করল এক আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে অবনত, স্থির, অচঞ্চল। সুজিতের শাঁসহীন শুকনো খোলের মতো শরীরটা মৃত্যুর মতো শীতল এক অনুভূতিতে শিথিল হয়ে এল।

বিশুর মা চা নিয়ে এল। দ্রুত চায়ের পেয়ালাটা শেষ করে সুজিত বললে,—বিশুর মা, উঠছি। এলে বোলো আমি এসেছিলাম।

সারাদিনের সমস্ত জীবন্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো এখন শ্মশানের বিকৃত ভস্মাবশেষের মতো। শহরের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে সুজিত ভাবল, লোকবহুল এই শহরের কোন পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি কি কেঁদে উঠতে পারি? ছেলেবেলায় দোকান থেকে খাবার কিনে ঘরে আসার পথে চিলে ছোঁ মেরেছিল একদিন। কেঁদে উঠেছিলাম। আজ আর তা সম্ভব নয়। এগুলো জমবে বুকের ভেতর। অথচ এত বড় শহরে কোথাও কি একটু ঠাঁই আছে যেখানে ব্যক্তি তার একক বেদনাকে নিয়ে কালিদাসের যুগের মতো বিশ্বব্যাপ্ত শোকের পটভূমি রচনা করবে। ট্রাম, বাস, রিক্শা, মোটর, লরি, অবসরহীন গতিবেগ, প্রয়োজনের কলরব, মাপা কথা, স্বার্থের সম্পর্ক, সময়ের দাম দিয়ে গড়া এই শহরে? সবিতাদিকে আমার কৈশোরের একটি প্রেমের কাহিনী আজও বলি নি। দূর সম্পর্কের এক বোনকে কিছুদিনের জন্যে ভালবেসেছিলাম আমি। তারা যেদিন বর্ধমানের বাসা উঠিয়ে কলকাতায় ফিরে এল সেদিনও আমার

আত্মাকে আজকের মতো বিদীর্ণ মনে হয়েছিল। পুকুর পাড়ের উঁচু তালগাছের নীচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি কথা বলতে পেরেছি সেদিন অখণ্ড নীরবতার সঙ্গে। পুকুরের সবুজ জলের ঢেউ গুনে গুনে, নীলাভ আকাশের অসীম বিস্তৃতির কাছে নিজের ক্ষুদ্রতাকে উপলব্ধি করে, খড়গাদার উপরে শালিকের নাচ দেখে, ধুলো জ্বালানো তীক্ষ্ণ রোদের দুপুরে নিজেকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে আমার আত্মার ক্ষত জুড়িয়ে গেল। এই শহরে কোথাও কি আছে সেই দীর্ঘ তালগাছের তলাকার শীতল ছায়া ?

সুজিত দীর্ঘ পথ হেঁটে ফিরল তার বোর্ডিং হাউসে। হ্যারিসন রোডের ওপরে নিউ ক্যালকাটা লজে। ওর থাকার ঘর দোতলায়। একতলার সিঁড়ির কাছে উঁকি মেরে দেখল ওর নামে কোন চিঠিপত্র এসেছে কিনা। না, আসে নি। দোতলায় যে ঘরে সুজিত থাকে, বড় ঘর সেটা। শয্যা সংখ্যা মোট পাঁচটি। কয়েকজন এখনো ফেরে নি। রাজেন ও বিভূতি রাজেনের বিছানায় বসে তুমুল তর্ক করছিল। বিছানাটা আগোছালো। তার ওপর মুড়ি, লঙ্কা, মুড়ির ঠোঙা, শালপাতা, তেলেভাজার টুকরো ছড়ানো। মেঝেটা নোংরা হয়ে উঠেছে সিগারেটের ছাই আর দগ্ধাবশেষের টুকরোয়।

কাঁধের ব্যাগটা দেওয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে রাখার অবসরে সুজিত ওদের তর্কের বিষয়টা বুঝতে পারল। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পাশাপাশি ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাও টিকে থাকতে পারে। প্রিন্সিপল অব কো-একজিস্টেন্স।

আবার দুটি ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। কনফ্লিক্ট অব ইনটারেস্ট।

সুজিত জামা-কাপড় পালটাল। রান্নাঘরে গিয়ে খাওয়ার কথা জানিয়ে অর্ডার দিল এক-কাপ চা-এর। রাজেনের ঘড়িতে দেখল মোটে সাড়ে আটটা। এখনো অনেক রাত বাকি। এতখানি সময়কে নিয়ে কি করবো ? সবিতাদি হয়তো এতক্ষণে বাড়িতে ফিরে এসেছে।

কি ভাবছে ? কিছু ভাবছে কি ? আমি কি সত্যিই এবার সবিতাদির জীবন থেকে মুছে যাব ? নাকি সবিতাদির জীবনে বিরামবাবুর পাশা-পাশি আমারও কোন সহ-অবস্থানের ভূমিকা থাকবে ? আমাদের মধ্যেও কি স্বার্থ-সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে কোনদিন ?

সুজিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। কিন্তু গত কয়েক বছরে চূড়ান্ত কোন মানসিক সংকটের মুহূর্তে সুজিত ঈশ্বরের মতো কোন অদৃশ্য শক্তির কাছে চিত্তের শান্তি প্রার্থনা করেছে। চা খেয়ে বারান্দায় এল সুজিত।

নীচের চলমান শহরের আসুরিক গর্জনের দিকে তাকাতে ভয় পেয়ে সে তাকিয়ে রইল আকাশের সুদূর ধূসরতার দিকে।

পাচ

সকালের ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁত মেজে বারান্দায় গিয়ে বসেছিল বিরাম। আজ তার কাজের তাড়াটা বেশি। পাশে চার-পাঁচটি মোটা-সোটা ফাইল। প্রায় ছাত্র জীবন থেকেই খবরের কাগজের উল্লেখযোগ্য লেখা বা কাটিং সংগ্রহ করে রাখা তার অভ্যাস। পরবর্তীকালে সাংবাদিক জীবন শুরু করার পক্ষে সেগুলো যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। বিরামের ফাইলগুলো নানা পর্যায়ে বিভক্ত। একটি ফাইলে থাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের ওপর দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা লেখকদের রচনা সংগ্রহ। অন্য একটিতে থাকে কেবল বাংলার লোকশিল্প, লোকগীতি বা লোকচিত্রের ওপর প্রবন্ধ এবং শিল্প-নিদর্শনের মুদ্রিত অনুলিপি। আর একটিতে থাকে দেশ-বিদেশের তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কাটিং। অন্যটিতে বিবিধ বিষয়ের ওপর এলোমেলো সংগ্রহ। বিরামের নিজের প্রবন্ধাদিরও একটি স্বতন্ত্র ফাইল আছে।

কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্যে বিরাম আজ তার সব কটি ফাইল নামিয়ে ঘাঁটছিল। সবিতা মিণ্টুকে কোলে নিয়ে বারান্দায় এল চায়ের কাপ হাতে। বিরাম অনেকক্ষণ কাপে চুমুক দিল না। ব্যস্তভাবে ফাইলের কাগজগুলো পরীক্ষা করছিল।

—চা যে ঠাণ্ডা হয়ে এল তোমার।

সবিতার কণ্ঠস্বর ঠাণ্ডা। এমন কি তার শরীরও। আজ খুব ভোরে উঠে স্নান সেরেছে সে। কাল সমস্ত রাত কেটেছে নিদ্রাহীনতায়।

বিরাম চায়ে প্রথম চুমুক দিতেই সবিতা বললে,—শোন।

সবিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বিরামের ভুরুতে সামান্য একটু ভাঁজ পড়ল।

—রাত্রে ঘুম হয় নি তোমার?

সবিতা মৃদু হাসল,—কেন কিসে বুঝলে?

—চোখের কোণে কালি জমেছে।

—হ্যাঁ।

—বারান্দায় উঠে এলে না কেন? হজম হয় নি বুঝি। কাল বেশ গুরুপাক খাওয়া হয়েছে। আর সবই তো ঐ ভেজিটেবল ঘিয়ে রাঁধা।

বিরাম গত রাত্রে বারান্দায় শুয়েছিল। সবিতা নিজের শোবার ঘরে। গত রাত্রে সবিতার ভাল ঘুম হয় নি এটা বিরাম ঠিকই বুঝেছে। কিন্তু তার সঠিক কারণটাকে উপলব্ধি করার মতো অনুশীলন বা আগ্রহ কি আছে বিরামের? সবিতা তার ভিজে মুখের ওপর মনের ম্লান আভা ফুটিয়ে ভাবল, এই হল বিরাম। আর এই হল আমাদের বিরোধের উৎস। ঘুম না হওয়ার পক্ষে গরম আর বদহজম ছাড়া আরও কোন কারণ থাকতে পারে এটা কি বিরামের অভিজ্ঞতার বাইরে? ছাত্রী জীবনে বিরামের সঙ্গে ভালবাসা-বাসির শুরুতেও যে কত রাত্রি এমনি না ঘুমিয়ে কেটেছিল বিরামকে কি আজ তা বলে দিলেও মনে করতে পারবে? নাকি বিরাম সবই

জানে। জেনেই উপেক্ষা করতে চায় আমাকে। পরোক্ষে জানাতে চায় নতুন করে ভালবাসার বা ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার পক্ষে দুরাশা। নির্লিপ্ততাই বিরামের শাসন। ওর সৌজন্য, ভদ্রতা, শিষ্টাচার এগুলোই আঘাত করে আমার মর্মমূলে।

বিরাম রুক্ষ, তিক্ত, কর্কশ স্বরে কেন বলতে পারল না যে আমার ঘুম না হওয়ার কারণ সুজিত, সুজিতের একা ফিরে যাওয়ার, সুজিতকে না দেখে একা হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণাবোধ।

সবিতা স্নান সেরে পরা শাড়িটা শরীরে ভাল করে গুছিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে বারান্দায় এল আবার।

—শোনো। এই টাকাটা রাখ। কাঁদনকে দিয়ো বাজার করতে। আমি একটু বেরুচ্ছি। ঘণ্টা দেড়েক পরে ফিরবো।

বিরাম টাকাটা হাতে নিল না। মাথা নীচু করে একটা ছাপানো লেখা পড়তে পড়তেই বিরক্ত স্বরে বললে,—বাড়িতে আর কেউ নেই বুঝি ?

—আর কে থাকবে। চিত্রা আছে।

—তাহলে তার কাছে টাকাটা রেখে যেতে অসুবিধে কি ?

বিরাম বাঁ হাতের আঙুলের ঝটকায় একটা ফাইলের ওপরে রাখা ময়লা নোটটাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আবার মৃদু স্বগতোক্তি করল—কাজের সময়েই যত ডিসটারবেন্স !

একটু বাদে বিরাম আড়চোখে তাকিয়ে দেখল সবিতা টাকাটা উঠিয়ে নিয়ে চলে গেছে। রেগেছে একটু। তা রাগুক। ওদের এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব! সাধারণ এই বোধটুকু পর্যন্ত নেই যে একটা লোক কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে চিন্তা করছে, তাকে বিরক্ত করা অন্যায়। এটা সবিতার এক-আধদিনের দোষ নয়। এইটেই চরিত্র ওর। কোন ইনটিগ্রিটি না থাকার ফল। শুধু মনের একরাশ মেয়েলী বিহ্বলতা নিয়ে, কৃত্রিম বেদনা নিয়ে হাওয়ার ওপর হাঁটছে। তার ফলেই ওর আর আমার চিন্তার মধ্যে, পরিকল্পনার মধ্যে, চরিত্রের

মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। আমি চাই খ্যাতি, সুনাম, যশ, সামাজিক প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা। গত দু'তিন মাস থেকে আমার খাটুনির মাত্রা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। সকালের ঘুমভাঙা থেকে রাত্রের ঘুমের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি চিন্তা করি আমার আপিসের কাজ, আমার ·নিজস্ব লেখা-জোখা, পূর্ব নির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেণ্ট রক্ষা করা। সমাজের উচ্চশ্রেণীর সেই সব ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলা ও বজায় রাখা যাদের হাতের মুঠোয় সমাজের অধিকাংশ মানুষের উন্নতির বা সার্থকতার চাবিকাঠি। কোন অলৌকিকত্বে আমার বিশ্বাস নেই। আমি বিশ্বাস করি পরিশ্রমে, অধ্যবসায়ে, ধৈর্যে। ছাত্রজীবন থেকে অথবা বলা যায় বাবার মৃত্যুর পর থেকে জীবনের নগ্ন, ভয়াবহ, করুণ, ক্লিষ্ট, কদর্য যে সব দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দশা আর দুর্ভোগের স্তর পার হয়ে এসেছি তারা নতুন করে আর আমাকে হতাশায় বিঁধতে পারবে না। আজ আমার প্রত্যেকটি কাজের পেছনে থাকে উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি শব্দ, আমি যা লিখি, তার জন্যে মূল্য মেপে রাখি, কারণ, এই শব্দগুলো আমাকে অর্জন করতে হয়েছে ক্ষুধা, রক্ত আর কান্নার বিনিময়ে। সবিতা কিন্তু কোনদিনও আমার জীবনের গূঢ় ও গভীর স্তরের এই সব উচ্চাশাকে সহানুভূতি, সমবেদনা বা সহযোগিতা দিয়ে স্পর্শ করতে পারে নি। ও আচ্ছন্ন হয়ে আছে আত্মকেন্দ্রিকতার মোহে। শুধু কিছু মেটিরিয়েল বা পার্থিব সুখ সুবিধা পেলেই প্রবল খুশিতে ও জীবনকে ধন্যবাদ জানাবে। স্বামীকে ও চায় ওর উড়ো আঁচলের ধ্বজা উড়িয়ে বেড়াবার বন্ধু। জীবনকে ও এখনও মনে করে ইউনিভার্সিটির করিডোর। ভালবাসাকে ভাবে রজনীগন্ধার মালা জড়িয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখার ফটোগ্রাফ। জীবন সম্পর্কে এই রকম অলীক, ভ্রান্ত, ফাঁপা আর কৃত্রিম ধারণার উপাদান ও সংগ্রহ করেছে ছাত্রী জীবনে পড়া কোন ভাবালু উপন্যাস কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' থেকে। কিন্তু জীবনটা কি রঙিন মলাটে আটকানো ছাপা হরফের উপন্যাস?

ফাইলের মধ্যে প্রয়োজনীয় লেখা খুঁজতে গিয়ে বিরাম এই জাতীয় চিন্তার মধ্যে এসে গেল। অনেক সময় গভীর চিন্তার দীর্ঘ প্রবাহ, শব্দের বা অক্ষরের আকারে নয়, শুধু অনুভূতির মাধ্যমে এক ঝলকে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। শব্দ বা অক্ষরের আকারে তাদের অনুবাদকে মনে হয় অসংলগ্ন। নিজের সজ্ঞান ইচ্ছার বা উপলব্ধির অজ্ঞাতসারেও চিন্তার এই ধারা প্রবাহিত হতে পারে। বিরাম ভেবে চলল।

মধ্যযুগীয় বিধিনিষেধের অন্তঃপুর থেকে মুক্তি লাভের আকস্মিক অহংকার আজ মেয়েদের আবার টেনে নিয়ে চলেছে নতুন ধ্বংসের দিকে। কোটি কোটি বর্ষের সাহিত্য, চিত্রকলা, কোটি কোটি মানুষের ধ্যান ধারণা, বিত্ত্বা ও বেদনার যোগফলে গড়ে ওঠা নারীত্বের যে স্নিগ্ধ কোমল, বিশুদ্ধ ও বিমূর্ত সৌন্দযরূপ, তাকে তারা নিজের হাতেই ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে চায়।

এই সময়ে বিরামের চোখে ভেসে উঠল ম্যাডোনার ছবি। ম্যাডোনার সঙ্গে মিলিয়ে একটা ব্যঙ্গের আভাস মাথায় এল তার। শব্দ দিয়ে নয়, অনুভূতির সাহায্যেই উচ্চারণ করল কথাটা; ম্যাডোনার বদলে ম্যাডাম।

শহর জীবনে আজ একটা নতুন আর ভয়ংকর শব্দের আমদানি হয়েছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ। সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় মেয়েদের দিক থেকেই এই ব্যাপারে বেশি আগ্রহ। এর কারণ কি? মেয়েরা মা হতে লজ্জা পায়? মা হওয়ার অর্থ কি পুরুষের দাসত্ব স্বীকার করা? গর্ভে সন্তান ধারণ করাটা তাদের ঝাঁকা-মুটের সমপর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যাবে এই ভয়? শিক্ষার সঙ্গে এত ক্ষুদ্রতা, দীনতা মেয়েরা আত্মস্থ করল কি করে? চাকুরিজীবী হওয়ার মধ্যে, ট্রামে-বাসে পুরুষের ধাক্কা খেয়ে আপিসে হাজিরা দেওয়ার মধ্যে, পুলিসের টিয়ার গ্যাস খেয়ে রাজনীতি করার মধ্যে যাদের আত্মবিকাশ ঘটে, চিত্তের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায়, তারা আপন সংসারের একটি মাত্র স্বজনের জীবনে সেবা, সাহায্য, সমবেদনা যোগাতে গিয়ে দাসত্বের

জ্বালা অনুভব করে কেন? অবশ্য আরও কারণ থাকতে পারে। পুরুষ এতকাল যৌন-সম্ভোগের যে উচ্ছৃঙ্খল আধিপত্য ঘটিয়ে এসেছে সমাজে, হয়তো মেয়েরা নতুন-জাগা বিদ্বেষের বশে তারই প্রতিষেধক হিসেবে সুধাভাণ্ডকে বিষকুম্ভ করে তুলতে চাইছে। ভালবাসা স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত গাছ না হয়ে পালিশ করা কাঠের টেবিলে রূপান্তরিত হতে চলেছে আজ। সবিতার ওপর ভীষণ রকম বিরক্ত হয়েছিল বলেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিরামের মগজে, পর পর, প্রায় প্রবন্ধাকারে, এই ভাবনাগুলো এসে গেল।

একটি বহুলপ্রচারিত মাসিক পত্রিকার মহিলা বিভাগে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখবার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়েছে সে কয়েকদিন আগে। স্বনামে নয়। ছদ্মনামে। পত্রিকাটির আর্থিক সঙ্গতি যথেষ্ট হওয়ার ফলে পারিশ্রমিক পাওয়া যাবে নিয়মিত এবং মনোমতো। আর্টপেজী ডবল ক্রাউনের আড়াই পাতা প্রবন্ধের জন্যে ২৫৲ টাকা। আগামী দু-এক দিনের মধ্যেই প্রবন্ধটি তৈরি করার তাড়া থাকায় বিরাম আজ সকাল থেকে ব্যস্ত হয়ে তার ফাইলের সংগ্রহগুলি নিয়ে বসেছিল। মোটামুটিভাবে তিনটি সংখ্যার লেখার কথা এখন থেকেই ভেবে রেখেছে বিরাম। প্রথমটিতে লিখবে ইংরাজি ভাষায় প্রথম বাঙালী মহিলাকবি তরু দত্ত প্রসঙ্গে, দ্বিতীয়টি সরোজিনী নাইডুর কবি প্রতিভা ও দেশপ্রেম প্রসঙ্গে, তৃতীয়টি চিত্রশিল্পী সুনয়নী দেবী প্রসঙ্গে।

বিভিন্ন নতুন পুরনো পত্র-পত্রিকা থেকে তরু দত্তের ওপরে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ বিরামের সংগ্রহে ছিল। এতক্ষণ সেইগুলিই খুঁজছিল সে। ইতিমধ্যে সেগুলি খুঁজে পেয়ে, কাগজপত্র গুছিয়ে এবার সে লেখায় বসবে স্থির করল।

বাজার করার টাকা আর মিন্টুকে চিত্রার হেফাজতে রেখে সবিতা বাইরে এল। সকাল সাড়ে আটটা বাজে এখন। অথচ কী তীব্র

তীক্ষ্ণ রোদের ঝাঁজ। হয়তো গত রাত্রের নিদ্রাহীনতায় সবিতার শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল বলেই রোদের উত্তাপটা অতিরিক্ত ঠেকল। সবিতা ভেবেছিল বিরাম প্রশ্ন করবে, কোথায় বেরুচ্ছ ? সবিতা উত্তরটাও ভেঁজে রেখেছিল। বিমলার কথা বলবে।

সবিতা মানিকতলার মোড় থেকে শেয়ালদাগামী একটা বাসে চাপল। তার গন্তব্যস্থল সুজিতের বোর্ডিং-হাউস।

সুজিত সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত শুয়েছিল। কিন্তু ঘুমিয়ে ছিল না। নিদ্রা এবং জাগরণের একটা মাঝামাঝি স্তরে সজাগ ও আচ্ছন্ন হয়েছিল তার চেতনা। সুজিত ভেবেছিল রাত্রে তার চোখে ঘুম আসবে না কিছুতেই। কিন্তু ট্রেন-জার্নির শারীরিক ক্লান্তি এবং মনের নৈরাশ্যজনিত অবসাদ তাকে সহজেই, প্রায় বিছানায় শোয়ামাত্র, গাঢ় নিদ্রায় অচেতন করে দিয়েছিল। গাঢ় ঘুমের আচ্ছন্নতার ভেতরেও সুজিত সমস্ত রাত উপভোগ করেছিল একটা অলীক, অসম্ভব, তৃপ্তিদায়ক সুখ-স্বপ্ন। যার রেশটুকু এখনও লেগে রয়েছে তার মনে। কিন্তু স্বপ্নের বিষয় বা কাহিনী অংশটুকু জেগে ওঠার সঙ্গেই বিলীন হয়ে গেছে। স্বপ্নের সেই সুখকর জগতে আবার ফিরে যাওয়ার বেদনাদায়ক আগ্রহেই সুজিত তার চোখে আহ্বান জানাচ্ছিল ঘুমকে।

স্বপ্নের অবশিষ্ট রেশটুকু থেকে সুজিতের মনে কেবল ভেসে উঠেছিল কয়েকটি টুকরো এবং অসংলগ্ন ছবি। সবিতার মুখ, ন্যাড়া ও শুকনো একটা গাছ, আলতা দিয়ে লেখা কতকগুলো অশ্লীল চিঠি পড়ছে সুজিতের বাবা, নিত্যানন্দদার বলিষ্ঠ চেহারা আর জ্বলন্ত চোখ, পুরীর সমুদ্রতীরের কোন এক হোটেলে ঘুমিয়ে আছে সুজিত আর সবিতা, ঘুম ভাঙার পর সবিতার-হাসির শব্দ আস্তে আস্তে সাবানের সাদা ফেনার মতো সারা ঘরে ঘুরপাক খেয়ে সমুদ্রের স্বচ্ছ নীল আর

শীতল স্রোত হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলল দুজনকে। সবিতার শরীরের নীচের আধখানা মৎস্য-কন্যার মতো। সুজিত তার স্বপ্নকে ফিরে না পেয়ে অনেকবার চেষ্টা করল স্বপ্নের এই টুকরো অসংলগ্নতাকে একটা সম্পূর্ণ রূপ দেওয়ার এবং এই অসংলগ্ন দৃশ্যের উৎসকে খুঁজে পাওয়ার।

সবিতাদির সঙ্গে আমার দেখা না হওয়ার জন্যে তার নিজস্ব মাধুর্যেভরা মুখটাকে দেখবার আগ্রহ আমার মধ্যে জাগা স্বাভাবিক। মানিক-তলা থেকে শেয়ালদার কাছাকাছি আমাদের এই বোর্ডিং পর্যন্ত আমি হেঁটে এসেছিলাম। কাশিমবাজার রাজবাড়ির সামনে পাতা ঝরা একটা জীর্ণ দেবদারু গাছ আমার চোখে পড়েছিল বটে। ঐ গাছের সঙ্গে আমি আমার বর্তমান অস্তিত্বের তুলনা করেছিলাম। সারা পথে আমার চোখে পড়েছিল আলতায় লেখা অসংখ্য পোস্টার। তার অধিকাংশ খাদ্য আন্দোলনের। বাকিগুলি শান্তি আন্দোলনের। ঐ সময়ে আমি হয়তো ভেবেছিলাম সবিতাদি ও বিরামবাবুর জীবনে সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরে আসার পর সবিতাদিকে লেখা আমার চিঠিগুলো বাবার কাছে পাঠিয়ে আমাকে শাসন করবেন বিরামবাবু। বাবা রাজনীতি ভালবাসেন না। কমিউনিস্টদের লাল রঙের প্রতি তাঁর ভীষণ বিদ্বেষ ও আতঙ্ক। সেইজন্যেই কি আমার চিঠির অক্ষরগুলো আলতায় লেখা হয়ে গেল? কিন্তু নিত্যানন্দদা এই স্বপ্নে এলেন কেমন করে? খাদ্য আন্দোলনের কথায় আমি তাঁকে মনে করেছিলাম। নিত্যানন্দদা আমাদের জেলার জনপ্রিয় নেতা। কৈশোর থেকে আমাদের তিনি রাজনীতি শিখিয়েছেন। বজ্রের মতো কঠোর আর কুসুমের মতো কোমল কথাটি তাঁর প্রসঙ্গে ভীষণ খাটে। পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে পার্টির সবচেয়ে বিশ্বস্ত একজন কর্মীকে কঠোর দণ্ড দেওয়ার সময় তিনি কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় দণ্ডাদেশ পাঠ করেছিলেন বলে শুনেছি। সেটা ১৯৪৯ সালের ঘটনা। পরে সে দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করা হয়

নানা কারণে। আমি কি ভেবেছিলাম বাবা ঐ চিঠিগুলো নিত্যানন্দদার হাতে দেবেন আমার শাস্তির যথাযথ ব্যবস্থা করার জন্যে ? স্বুজিত সামান্য হাসল।

—আপনাকে নীচে একজন মেয়েমানুষ ডাকছে !

বোর্ডিং হাউসের বছর চোদ্দ বয়সের চাকরটা এসে জানাল স্বুজিতকে। মেয়েমানুষ ! অর্থাৎ ভদ্রমহিলা। আমার সঙ্গে দেখা করবে এমন ভদ্রমহিলা এই কলকাতা শহরে কে আছে—এক সবিতাদি ছাড়া ? কিন্তু সবিতাদি······? স্বুজিত বিছানায় তখুনি উঠে বসে লুঙ্গির প্রান্ত দিয়ে চটপট মুখটাকে মুছে ফেলে। সেই সঙ্গে চোখের পিচুটি। লুঙ্গি ছেড়ে পায়জামাটা গলিয়ে নিল পায়ে। মাথা দিয়ে গলায় গেঞ্জিটা নামাতে গিয়ে গালে ব্যথা অনুভব করল। চুল আঁচড়াতে গিয়ে চোখে পড়ল গালে ব্রণ উঠেছে একটা। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা সবিতাকে দেখে স্বুজিতের মনে হল সে তখনও ঘুরছে তার মরীচিকাময় স্বপ্নের জগতে। সবিতাদি ? সবিতাদি সত্যিই আমাদের এই বোর্ডিং-হাউসের নীচের তলায় ? অবিশ্বাস্য অথচ সত্য ! সবিতার সামনে স্থির দাঁড়িয়ে স্বুজিত কিছুক্ষণ বোবা হয়ে রইল। চঞ্চল কেবল তার চোখ।

সবিতার ভিজে চুলের দিকে তাকিয়ে স্বুজিতের মনে পড়ল স্বপ্নের সমুদ্রের কথা। অনেকক্ষণ জলে সাঁতার কাটার পর হাত-পা শরীরের চামড়ায় যেমন একটা সাদা, শিথিল, কুঞ্চিত বিবর্ণতা ফুটে ওঠে সবিতার মুখে তার স্বুস্পষ্ট চিহ্ন। মৃত্যুর পরে এমনি বর্ণহীন, অভিব্যক্তিহীন পাংশু আকৃতি পায় মানুষ। স্বুজিতের মন থেকে হঠাৎ কখন উবে গেছে গতরাত্রির জটিল বেদনাবোধ।

সবিতা হাসল। এই তার স্বকীয় মাধুর্যেভরা হাসি। যার প্রতিক্রিয়া বিষের মতো। মুহূর্তে দুর্বল, অবশ, দ্রবীভূত করে দিতে পারে অন্যের অন্তর্জগতের স্বুরক্ষিত ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বের সমস্ত গর্ব, অহংকার,

স্বাতন্ত্র্য। সবিতা হেসে সুজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু যেন খুঁজল, চোখে গভীর পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি নিয়ে। সুজিতের চোখ ঈষৎ নত হয়েছিল মাটির দিকে। এই ক-দিনে আশ্চর্য রকম কালো ও রুগ্ন হয়েছে সুজিত। মুখটা কত ছোট। অথচ সবিতার মনের আকাঙ্ক্ষায় বা স্বপ্নে সুজিত কত বড় ও শ্রেষ্ঠ। সবিতা কি সেইটাই খুঁজছিল?

—কাল চলে এলে কেন? সুজিত......

শরীরে কোথায় যেন একটা কাঁপুনি বয়ে গেল সুজিতের। আমি অবিশ্বাস করেছিলাম সবিতাদিকে। অথচ সবিতাদির সেই পরিচিত ঘনিষ্ঠ করুণ বিষণ্ণ সম্বোধনের মধ্যে কোথাও এতটুকু পরিবর্তন ঘটে নি তো।

—কাল চলে এলে কেন? কী হয়েছে তোমার? সুজিত......

—আমার? না কিছু হয় নি।

—এত বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছিলে? এই করে শরীর খারাপ হয় তোমার।

সুজিত হাসল। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকার অপরাধ স্বীকার করল যেন হেসে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, হাসলেই মূল্যহীন হয়ে যাবে তার ব্যক্তিত্ব। সহজ, সুলভ হতে দেবে না সে নিজেকে। নিজেকে গম্ভীর ও নিস্পৃহ করে তোলার চেষ্টা করল সুজিত।

—খুব অভিমান করেছ না? রেগে তো দেখছি টং হয়ে আছ? খুব রেগেছ? এই, তাকাও তো মুখের দিকে।

সুজিত তাকাল। তাকিয়ে ভাবল আমার মুখে আমি নিশ্চয় সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি আমার করুণ দৃঢ় অভিমান। মেয়েদের কাছে ছেলেরা করুণ হতে ভীষণ ভালবাসে। কিন্তু মেয়েরা সব সময় করুণ মুখকে করুণা করে না।

সবিতার হাতে নষ্ট করার মতো সময় ছিল কম। সবিতা ভাবল,

সুজিতের কাছে নরম হলে প্রচুর সময় লাগবে ওর অবুঝ অভিমান বা মনের ঘা সারাতে। তা ছাড়া আরও একটা জিনিস সবিতাকে শান্তি দিল না। সুজিতের মুখমণ্ডলের রুক্ষতা। চোখের কোণে সামান্য কালিমা, ঈষৎ কোটরে নেমে যাওয়া চোখ, হলুদ কষ জমা দাঁত, সারা মুখে ঘামের তৈলাক্ত প্রলেপ আর লাল ব্রণ সব মিলিয়ে সুজিতের মুখটাকে অপরিচিত ও অপ্রিয় লাগছিল।

—শোনো, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। তুমি যদি নাও শুনতে চাও, আমাকে বলতে হবে। আমি নীচে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি তাড়াতাড়ি মুখটা ধুয়ে এস।

সুজিত ওপরে গিয়ে দাঁতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে গণেশকে দেখে একটা ধমকানি দিলে।

—মেয়েমানুষ কি রে? এবার থেকে ভদ্রমহিলা না বললে চাঁটা খাবি।

বিভূতির সঙ্গে সুজিতের বন্ধুত্ব আর সবায়ের চেয়ে নিবিড়। বিভূতির কাছে সুজিত তার মনকে অনেকবার উন্মুক্ত করেছে। বিভূতি সুজিতের পাশে এসে দাঁড়াল জিজ্ঞাসু চোখে।

—কে?

সুজিতের সারা মুখে নিম টুথপেস্টের ফেনা। তাই কথায় না বলে হেসে এবং চোখের ভঙ্গিতে সে জবাব দিল বিভূতিকে।

—আলাপ করিয়ে দিবি?

'না' বলতে গিয়ে সুজিতের গলায় পেস্টের তেতো ফেনা নেমে গিয়ে বিষাদে কুঁচকে দিল মুখটাকে।

দাঁত মেজে, মুখটা সাবানে ধুয়ে সুজিত আগের চেয়ে অনেক পরিচ্ছন্ন হয়ে নীচে নামবার সময় বিভূতিকে বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে সবিতাকে দেখার পরামর্শ জানিয়ে গেল। দেখার কথা একা বিভূতির। কিন্তু সবিতার সঙ্গে একটু হেঁটে পিছনে তাকিয়ে সুজিত দেখল বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে তিন চারজন। তার মধ্যে রাজেনও আছে। সুজিত তৃপ্ত হল এই দৃশ্যে। সবিতা বললে,

—আমাকে একটু এগিয়ে দেবে চল।

পথে যেতে যেতে কথা হল ওদের। কথা বলল সবিতাই বেশি। সুজিত শুধু শুনল সবিতার নরম, কোমল, ক্লান্ত, বিষাদ মাখানো কণ্ঠস্বর, যা পথের কোলাহল, যানবাহনের কর্কশ ঘর্ঘর ছাপিয়ে তার হৃদয়কে স্পন্দিত করছিল। আর সবিতার প্রত্যেকটি কথাকে সে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে বিচার করলে সেই সঙ্গে।

সত্যিই কাল অপেক্ষা করা উচিত ছিল আমার। আমি সবিতাকে আঘাত দিয়েছি অকারণে। আমি কেন ভাবতে পারি না সবিতাদির সামাজিক জগতে আমি ছাড়াও আরও অনেক স্বজন-পরিজন আছে, তাদের প্রতি দায়-দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্য আছে। সবিতাদি বিরামবাবুর সঙ্গে কাল রাত্রে গিয়েছিল ওদের এক নিকট সম্পর্কের ভাইঝির অন্নপ্রাশনে। আমার মনের মধ্যে এত পাপ বা গ্লানি কেন? আমি ভাবলাম সবিতাদি বিশ্বাসঘাতকতা করল আমার সঙ্গে? সবিতাদি কত সরল আর নিষ্পাপ। আমি যে ওকে ঠিকমতো বুঝতে পারি না, ওর অন্তরের অনেক অতল বেদনা ও শূন্যতাকে উপলব্ধি করতে পারি না—সবিতাদির এ অভিযোগ কি কিছুটা সত্যি নয়? সবিতাদিকে শান্তি দেব, সুস্থতায় ভরিয়ে রাখব, বেঁচে থাকার উৎসাহ দেব—এই কী আমার জীবনের ব্রত বা সংকল্প নয়? অথচ আমি কেন নতুন করে সমস্যা বা কষ্টের আবর্ত তৈরি করছি তার জীবনে। না, এ ভুল আর কখনো হবে না। দেখো, আর কখনো হবে না।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত এসে সবিতা বললে,—এবার বাসে উঠবো। তাহলে কাল ঠিক পাঁচটার সময় ময়দানে থাকছো তো? মনুমেণ্টের নীচে বইয়ের স্টলে থেকো। দেখা হবে। চলি।

সবিতা বাসে চাপল। সুজিত দাঁড়িয়ে থেকে দেখল সেই প্রস্থান। সবিতার আঁচলের কিছুটা অংশ বাসের জানলা দিয়ে উড়ছিল। সার্কুলার রোডের প্রশস্ত সীমা আর চৈত্রের জ্বলন্ত আকাশের মৌন,

মহান বিস্তৃত পটভূমিকায় সুজিতের অহেতুক মনে হল ক্রমবিলীয়মান ঐ সাদা কাপড়ের অংশটুকু তার আত্মা। মানুষের আত্মা মৃত্যুর মুহূর্তে কী ভাবে দেহ থেকে শূন্যলোকে বিলীন হয়ে যায় সেটা স্বচক্ষে দেখার কৌতূহল সুজিতের মধ্যে শৈশব থেকে প্রকট।

আজ একটা সিগারেট খেলে কেমন হয়?

সুজিতের মনের মধ্যে একটা গানের লাইন গুমরে উঠল। 'আজ প্রভাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার।'

সত্যি, সবিতাদির আকস্মিক আবির্ভাব তার ভিজে চুলের মতো আমাকে স্নিগ্ধ সুন্দর করে দিয়ে গেল।

আজ একটা সিগারেট খাবোই।

ছয়

সকাল থেকেই মনটা যেন হালকা পালক। কত কিছু করতে ইচ্ছে করছে। আবার কিছুই না করে হাওয়ায় ভেসে ভেসে বেড়াতেই যেন সুখ। ইউনিভার্সিটিতে শুরু হয়েছে নির্বাচনের তোড়জোড়। সুজিতের ওতে মন নেই। ইউনিয়নের কোন কোন ছেলেকে ভাল লাগে। ইউনিয়নকে আর ভাল লাগে না। কিছু মেয়েও মেতে উঠেছে রাজনীতিতে। মেয়েরা মাততে পারে। কিন্তু ওদের দলে করবী কেন? ক্লাস করতে আসে গাড়িতে। কামু, বোদলেয়রকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখে। এক শাড়ি সপ্তাহে দুবার পরে না। নানা রকমের জুতো, ব্যাগ, খোঁপা, ব্লাউজের ডিজাইনের যেন এক জীবন্ত বিজ্ঞাপন। করিডোর দিয়ে যখন হাঁটে পিছনে দশটা ছেলে। বালীগঞ্জে বিরাট বাড়ি। বাবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বড় অফিসার। দিদির বিয়ে হয়েছিল দিল্লীতে। থাকে আমেরিকায়। করবীরও কদিন বাদে ঐ রকম একটা কিছু হবে। অক্সফোর্ডের টানে

ইংরেজী বলে অনর্গল। লেখে আরও স্মার্ট। ছেলেবেলা কেটেছে হায়দ্রাবাদে। তাই বাংলা উচ্চারণে অবাঙালী সুলভ টান। তবু বাংলাতেই বক্তৃতা করে ছাত্র-আন্দোলন বিষয়ে। ইউনিয়ন চাইছে এবারে ওকেই ম্যাগাজিন এডিটার করবে। শেষের কবিতার কেটীকে মনে পড়ে যায় ওর আঁকা ভুরু আর রঙ মাখা ঠোঁটের দিকে তাকালে। সুজিতের এক ক্লাস উঁচুতে পড়ে।
সেই করবী হঠাৎ গায়ে পড়ে আলাপ করতে এল। সামনে যেহেতু নির্বাচন ?
পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল করবী। সুজিত ছিল একটু এগিয়ে। কানে এল—আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন ? সুজিত প্রথমে ভেবেছিল করবীর এ-প্রশ্ন অন্য কাউকে। তবু কি রকম আবছা একটু কৌতূহলে ঘাড় ফেরাতে গিয়ে বুঝতে পারল করবীর পাশে বা পিছনে কেউ নেই, সুতরাং প্রশ্নটা তাকেই। সুজিত ভদ্রতা বশতঃ দাঁড়াল। করবী ওর পাশে।
— আপনি বড্ড self-centered.
— কি করে জানলেন ?
— আপনাকে দেখে। আমাদের মতো সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গেও আপনার কথা বলতে লোভ হয় না ?
সুজিত শুনতে শুনতেই মনে মনে বলল, আপনি খুব একটা অসুন্দরী নন ঠিকই, তবে প্রসাধনের ঘটাটা একটু কমালে সৌন্দর্যের সঙ্গে সুরুচির মিলটা ঘটতো। সুজিতের ইচ্ছে করছিল খুব স্মার্ট একটা উত্তর দেওয়ার। বললে—আঙুর ফলকে মিথ্যে টক বানাতে চাই না।
— তার মানে ?
— না পেলেই তো আঙুর ফল টক। আর আপনারা এত উঁচুতে থাকেন যে হাই-জাম্প দিয়েও সেখানে পৌঁছনো যাবে না।
— আপনার তাহলে মাঝে মাঝে লোভী শৃগাল সাজতে ইচ্ছে করে ?
— করে কিনা জানি না, তবে করাটা অস্বাভাবিক কি ?

— আর লোভী শৃগালের দাঁতে পড়াটাই বুঝি আঙুর ফলেদের বেলায় খুব স্বাভাবিক ?

—সৌন্দর্যই লোভকে জাগায়। আঙুর ফলেরা আর একটু কম রসালো হলে শিয়ালরা হয়তো অতটা লোভী নাও হতে পারতো।

—আঙুর আঙুরই। সে কখনো টক কুল হবে না। যাক্ গে, আচ্ছা য়ুনিভার্সিটির ক্লাস আর প্রেম এ ছাড়া আপনি আর কি করেন ?

— হোয়াট ডু ইউ মিন ?

—য়ুনিভার্সিটির ক্লাস আর প্রেম এ ছুটো বাদে আর কি কি ব্যাপারে আপনার interest আছে জানতে চাইছি।

— প্রেমের সংবাদটা কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন ?

— সোর্স জেনে কি দরকার। সংবাদটা তো মিথ্যে নয় ?

— মিথ্যে।

— মিথ্যে ? আত্মগোপনের চেষ্টা করছেন না তো ?

—করতাম, যদি প্রেম-করায় রাজনৈতিক অপরাধের মতো হাতে হাত কড়ার ভয় থাকতো। কোথা থেকে জেনেছেন বলুন।

—সোর্স খুবই রিলাইয়েবল এটুকু বলতে পারি।

—আমি নামটা জানতে চাই।

—পরিমল। ঘরের শত্রু বিভীষণ।

—মানে কাঁদন ?

সুজিত কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেল।

—কাঁদন বললেও ঠিক বলে নি। ওর দিদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রেমের নয়। বন্ধুত্বের।

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল করবী। একটু তীর্যক্ হাসি। যেন সুজিত খুব একটা ছেলেমানুষের মতো কথা বলেছে। আর সেই ছেলে-মানুষীটা বুঝিয়ে দেবার জন্তেই করবী যেন হাসি থামিয়ে বললে,

—বন্ধুত্ব বাদ দিয়ে আবার প্রেম হয় নাকি ?

—দেখুন, এ আলোচনাটা বন্ধ থাক্। পরিমলের দিদিকে আপনি দেখেন নি। চেনেনও না। ফলে আপনার পক্ষে ব্যাপারটা বোঝা সম্ভব নয়। সবিতাদি একটা এক্‌সেপসনাল ক্যারেক্টার। পরিমলের সঙ্গে আপনার কি করে আলাপ হল ?

—ওতো পার্টি মেম্বার। ওর কাছ থেকেই আপনার কথা কিছু কিছু শুনেছি। আপনি ভাল রবীন্দ্র সংগীত গাইতে পারেন, তাও জানি।

—ভাল গাই কিনা জানি না, তবে ভাল লাগে বলে গাই মাঝে মাঝে।

কলরব তুলে একদল ছেলেমেয়ে এই সময়ে করবীর সামনে এসে দাঁড়াল।

করবীকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যেন যাবে তারা।

করবী তাদের সঙ্গে কিছু কথা বলে সুজিতের দিকে তাকালে সুজিত বলে,

—আপনার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল মনে হচ্ছে।

করবী খুব মিষ্টি করে হাসে। সিনেমার নায়িকাদের মতো হাস্যময়ী মনে হয় তাকে। করবী বলে,

—ছিল। একদিন আসুন না আমাদের বাড়িতে। পরিমলের সঙ্গে। কথা বলা যাবে। গানও শুনবো। আমাদের বাড়িতে অনেক ভাল ভাল রেকর্ড আছে। ভাল লাগলে শুনতে পারেন। পুরনো গান। মালতী ঘোষালের গান, কি দারুণ, তাই না ? অতুল প্রসাদও আছে। ফৈয়াজ খাঁও, আপনি ক্লাসিকাল ভালবাসেন না ?

—খুবই।

—তাহলে আসুন একদিন। বেশ আড্ডা দেওয়া যাবে। চলি, এখন।

চলে যাবার আগে করবী আবার বলে গেল—আসবেন।

সুজিত অনেকক্ষণ ধরে ভাবল করবীর বাইরের সাজগোজ আর ভিতরের ব্যবহারের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা নিয়ে, বৌবাজারের রাস্তা

ধরে হাঁটতে হাঁটতে। বগলে বই। হাতে বাদামের ঠোঙা। কাঁদন প্রসঙ্গেও সে ভাবছিল। কাঁদন কিন্তু একদিনও বলে নি করবীর কথা। অথচ তার সঙ্গে সবিতার সম্পর্কের কথা করবীকে জানিয়েছে। কাঁদনকে বোঝা যায় না। ক্রমশ যেন জটিল হয়ে উঠছে। কাঁদনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রেই তার পরিচয় সবিতাদিব সঙ্গে। সেই কাঁদন আজকাল সুজিতকে এড়িয়ে চলে। কদাচিৎ কথা বলে। সুজিতের চিন্তাধারা বুর্জোয়া বলে? দেশ, রাজনীতি, মার্ক্স, শান্তি আন্দোলন, মজুরী বৃদ্ধি, ছাঁটাই এসব নিয়ে আলোচনা তর্ক করে না বলে? ন্যাকা ন্যাকা সুরে রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে আর অর্থহীন, পরিণামহীন জোলো প্লেটোনিক প্রেম নিয়ে মশগুল হয়ে আছে বলে? তাহলে করবীর সঙ্গে মেশে কি করে? করবী ওদের দলকে মোটা টাকা মাঝে মাঝে দান করে বলে? তাহলে করবীও আশ্চর্য। উৎকট বেশভূষা, অথচ ফৈয়াজ খাঁ, অতুলপ্রসাদ আবার বোদলেয়র চর্চা। সবটাই কি ফ্যাশন? না···। হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়েছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে। সুজিতের সবচেয়ে প্রিয়বন্ধু অসীম থাকে ওয়েলিংটনের পোস্ট গ্রাজুয়েট হস্টেলে। আজ ক্লাসে আসে নি। কেন তার খোঁজ নিতেই আসা। যদি থাকে সঙ্গে নিয়ে মেট্রোয় যাবে। ওকে বলবে আজ সকালের কথা। সবিতাদির সমস্ত খবর কলকাতায়, শুধু কলকাতা কেন, পৃথিবীতে একমাত্র জানে ঐ অসীম।

অসীমের ঘরের দরজায় তালা। নেমে আসতে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখা বিজনের সঙ্গে। বিজন চেনে সুজিতকে। কিছু না জেনেই প্রশ্ন করল বিজন—

—অসীম?

—হ্যাঁ।

বিজন রহস্যপূর্ণ দৃষ্টিতে হাসল।

—কি হয়েছে?

—আছে, ঘরেই আছে। এখন ডাকবেন না।

—সেকি ঘরে তালা দেওয়া, অথচ আছে কি করে?

—আসুন আমাদের ঘরে। বলছি।

বিজন বাথরুম থেকে স্নান করে এসেছে। তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে বললে—একা নয়, ঘরে আরও একজন আছে।

—কে?

—লতিকা। দুপুর থেকে।

—ঘরে তালা দিল কে?

—আমাদেরই কেউ দিয়ে দিয়েছে।

হাতের শূন্য বাদামের ঠোঙাটা অন্যমনস্কভাবে নাড়তে নাড়তে একটা ছোট্ট গোল বাদাম বেরিয়ে এল। লক্ষ না করেই সেটা খেতে গিয়ে মুখ ভরে গেল বিস্বাদে। পোকা লাগা বাদাম। উঠে জানালা দিয়ে একদলা থুতু ফেলে এল বাইরে। এক গ্লাস জল খেল। বিজন প্যান্ট জামা পরে ঘাড়ে পাউডার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে সুজিতকেও একটা অফার করল। সুজিত ঠিক করেছিল সিগারেট ধরবে আরো পরে। কিন্তু আজ সকালেই একটা খেয়েছে। মুখের বিস্বাদ, কিংবা মনের বিস্বাদ যে কোন একটা ভুলতে এখন মনে হল একটা সিগারেট সে খেতে পারে। আশ্চর্য, অসীম তার এতদিনের প্রিয় বন্ধু। নিজের সব কথা অকপটে খুলে বলেছে তাকে। অসীম কখনো বলে নি যে লতিকার সঙ্গে তার প্রেম চলেছে। সকলেই কত সতর্ক, সাবধানী। সুজিত মনে মনে হিসেব কষতে লাগল এবার থেকে অসীমের সঙ্গে কতটা অন্তরঙ্গ হবে।

বিজন বললে,—চলুন, বেরুব।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সুজিত প্রশ্ন করলে বিজনকে,

—জানাজানি হয়ে গেলে কি হবে?

—it's an open secret, অনেকেই করে। দারোয়ানদের কিছু বকশিশ দিতে হয় মাঝে মাঝে।

বিজন চলে গেল। সুজিতের একা সিনেমা দেখতে ভাল লাগে না। শেষ সিনেমা দেখেছে কবে, কার সঙ্গে মনে করার চেষ্টা করল। সবিতার সঙ্গে দেখেছিল পুশকিনের 'কুইন অব স্পেড্স'। শেষ ছবি তারও পরে। ওঃ 'কুইন অব স্পেড্স' দেখার রাতটা, এখনও মনে করলে, বুকে কি যেন নেচে ওঠে। আগে নাচতো সুখ, এখন কষ্ট।

ঐদিনই প্রথম হাত ছোঁয়া সবিতাদির। ছবি দেখতে বসার সময় থেকেই একটা প্রবল বাসনা ধাক্কা দিচ্ছিল বুকের দরজায়।

সবিতাদির হাতটাকে মুঠোয় নেব। কতবার চেষ্টা করেছিলাম। ছবি শেষ হতে চলেছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে ইচ্ছে করে সেটা ফেলে দিলাম। তারপর যেন তুলতে হবে। তুলবার সময় যেন অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার ডান হাতটা সবিতাদির হাতে গিয়ে ঠেকল। কই, সবিতাদি তো হাতটা সরিয়ে নিল না। তাহলে! লুণ্ঠিত রুমাল উঠে এল। কিন্তু আমার কুণ্ঠিত হাত লুব্ধের মতো একই জায়গায় রয়ে গেল। বুকে জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছিল। ধীরে ধীরে নিশ্বাসটা সহজ হয়ে এল। কিছু ভাববে নাতো যদি হাতটাকে এখন মুঠোয় চেপে ধরি? ভাববে নাতো আমার সমস্ত বন্ধুত্ব, মেলামেশার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য—যুবকের পিপাসা। না, তা ভাববে না, সমর্থন না থাকলে এতক্ষণে হাতটা সরিয়ে নিত। আমি তারপর সবিতাদির হাতটাকে মুঠোয় ভরে নিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল একমুঠো ফুল ফুটেছে আমার করতলের ভিতরে। আরও এক মুঠো ফুটছে বুকের ভিতরে। আমি যেন ক্রমশ বড় হয়ে উঠছি। এই ছোট্ট নিউ এম্পায়ারের মধ্যে আমাকে আঁটবে না। কেউ যদি আমাকে জাপটে না ধরে আমি আকাশ পর্যন্ত উঠে যাব। আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে কি যেন বাজছে। সেতার? না স্বরোদ? না বাঁশী। আমার ইচ্ছে করছিল গান গাই। অনেকগুলো ইংরেজী বাংলা কবিতার লাইন ঘুরঘুর

করছিল চিন্তার মধ্যে। সে এক অদ্ভুত বেদনাময় অভিজ্ঞতা। অনুভূতির এক নতুন জন্ম শরীরে।

একা সিনেমা দেখতে ভাল লাগবে না। তাহলে কোথায় যাব। হতচ্ছাড়া অসীম, আমার সারাদিনের প্ল্যানটাকে আপ্‌সেট করে দিলে। হতচ্ছাড়া লম্পট। লম্পট কেন বললাম? প্রেম করছে বলে? প্রেম তো আমিও করছি। না, আমারটা প্রেম নয়, বন্ধুত্ব। সত্যি বন্ধুত্ব? নিশ্চয়ই তা ছাড়া কি? তাহলে অসীমের জন্যে ঈর্ষা অনুভব করছি কেন?

পাঁচরকম ভাবতে ভাবতে কখন ট্রামে চেপে বসেছে সুজিত। নেমেছে এ্যাসপ্লানেডে। তারপর যথারীতি মেট্রোর সামনে গিয়েও দাঁড়িয়েছিল। খুব ভিড় নেই। অথচ ছবিটার খুব নাম। তার মানে আরম্ভ হয়ে গেছে। ছবি হয়তো আরম্ভ হয় নি। ট্রেলার চলছে। সুজিত ঠিক করল শো কেসের ছবিগুলো দেখবে। দেখে যদি ভাল লাগে, ঢুকবে। নাহলে একা একা গিয়ে বসবে কার্জন পার্কে। কিংবা হাঁটতে হাঁটতে পার্ক স্ট্রীটে ঘুরবে। পার্ক স্ট্রীটের রাত্রিটা যেন অন্যরকম। একই কলকাতা। তবু ওখানকার আলো অনেক নীল। মানুষ অনেক উচ্ছল। ছনছনে যুবতী স্ত্রীর হাত বগলে নিয়ে লম্বা ঢ্যাঙা সাহেবগুলো যখন যায়—তখন কি রকম বিস্বাদ বৈচিত্র্যহীন মনে হয় বাঙালী পাড়ার জীবনকে।

পিছন থেকে কে যেন একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় মারল সুজিতের পিঠে। তাকিয়ে দেখল—বারীন। কিছু বলার আগেই হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল মেট্রোর ভিতরে।

মূল ছবি তখনো শুরু হয় নি। বিজ্ঞাপন আর পরবর্তী ছবির ট্রেলার চলছে। সুজিত ফিসফিসিয়ে বললে—আরেকটা টিকিট কার জন্যে কেটেছিলি?

বারীন মুখ টিপে চোখ বুজিয়ে বিচিত্র, গর্বিত একটা ভঙ্গী করে বললে,—একজনের আসার কথা ছিল।

সুজিত বিদ্রূপ করে বললে,—কত নম্বর সুইট হার্ট ?

—এখনো নম্বর পড়ে নি। কাল আলাপ হয়েছে। আজ আসতে বলেছিলাম। অবশ্য মনে হয়েছিল আসবে না।

—কেন ?

—এক ব্যাটা ইঞ্জিনিয়ার লেজুড় হয়ে আছে। ড্রিঙ্কবাজ।

—কে ?

—দুজনেই।

—আমাকে দেখতে না পেলে কি করতিস্।

—কাউকে পটাতাম। খুঁজছিলাম তো। জুটল না। তোকে না পেলে দুটোই ছিঁড়ে ফেলে দিতাম। পয়সা খরচ করে সিনেমায় বসে ছায়ার মানুষরা এ ওকে চুম খাবে, ও-একে জড়িয়ে ধরবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওসব দেখা যায় নাকি ? সিলি, ভাল্‌গার। মেয়েদের নিয়ে কোথাও যাবার জায়গা কম বলেই সিনেমায় আসি।

সুজিত বারীনের ইচ্ছে-অনিচ্ছের তাৎপর্য বুঝতে পারে না। ওর ভালবাসা বোধটাই বা কি ধরনের তাও দুর্বোধ্য। যাদের ভালবাসতে চায়, তাদের সম্পর্কেই নোংরা মন্তব্য করে ? দু-তিন বছরের মধ্যে বারীন কি আশ্চর্য রকম বদলে গেছে। পার্বত্য গুহার মতো রহস্যময়, অন্ধকার, আর কর্কশ।

ইন্টারভ্যালের আলো জ্বলে উঠতে লাগল একে একে। নানা রঙের আলো। বেশ লাগে দেখতে। ইন্টারভ্যালে অনেকেই উঠে দাঁড়িয়েছে। বাইরে যাবে। পান-সিগারেট খেতে। চানাচুর কিনতে। অনেকে আবার ঢুকছে। বাইরে বসেছিল। ট্রেলার আর বিজ্ঞাপন না দেখে সিনেমা দেখতে বসলে যেটুকু মাথা ধরে, চোখ টাটায়, তাকে কিছু কমানো যাবার আশায়। এখন আসছে। অধিকাংশই স-মহিলা। সকলেই কি স্ত্রী বা বান্ধবী ? কোথা থেকে পায় ? নারী পুরুষ সকলেরই অভিজাত বেশবাস। যেন এই মাত্র সোজা থিয়েটারের গ্রীনরুম থেকে টাটকা মেকআপ

নিয়ে বেরুল। মেয়েদের রূপচর্চাটা কলকাতায় ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠছে, তাই না।

সবিতাদিকে ভাল লাগে, এই জন্যে যে কোনদিনও রুচিকে অপমান করে নি, না পোষাকে, না প্রসাধনে।

—যাবি?

বারীন পিঠে ধাক্কা মারল।

—কোথায়?

—সিগারেট খাস না বুঝি।

—খাই। তবে এই ভিড় ঠেলে যেতে পারব না।

বারীন উঠল না। সে যেন ছটফট করছে। বারীন বোধ হয় উঠতে চাইছিল তার বান্ধবী এসেছে কিনা দেখতে। তারপর হয়তো বুঝল এলেও উপায়হীন। টিকিট নেই।

সামনের যে কটা সিট খালি ছিল ভরে গেছে। সামনের রুদ্ধ বাতাস ভরে উঠেছে সুগন্ধে। অধিকাংশ বাঙালী মেয়েদের খোঁপায় রজনী-গন্ধার মালা জড়ানো। সুগন্ধের মধ্যে কি আছে কে জানে। মনটাকে ব্যথিয়ে তোলে। ভিজে কাপড়ের মতো নিংড়োতে থাকে। জল পড়ে। শূন্যতায় বুক ভরে ওঠে। সিনেমার হলে সব নারীই কি রূপসী? এলোমেলা এদিক ওদিক তাকিয়ে সুজিত মহিলাদের রূপ, রস, ভঙ্গী, হাস্য লাস্য, বর্ণ ও গন্ধের ঘ্রাণ নিতে নিতে এইসব ভাবছিল।

হঠাৎ বারীন পাশ থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ করল।

—কি রে?

—ঐ মেয়েটা আবার ওর সঙ্গে জুটেছে?

—কার কথা বলছিস।

—করবী সেন। তোদের ইউনিভার্সিটির মেয়ে।

—কই? কোথায়? তুই চিনিস নাকি?

—চিনি মানে, ওকে বিয়ে করতে রাজী হলে রাজা হয়ে যেতাম।

—তার মানে।

—আর একটু এগোলে বিয়েই হয়ে যেতো। কেটে পড়েছি।

সুজিতের ইচ্ছে করল একটা তীব্র চীৎকারে ওকে থামিয়ে দিতে।

পৃথিবীর সমস্ত মেয়েকে ও চেনে। সকলের সঙ্গেই ওর প্রেম! অথচ কাউকেই ভাল লাগে না ভালবাসে না। বিয়ের নামে নাক-সিঁটকোনো। করবী সম্পর্কে সবাই যা জানে, সুজিত তার চেয়ে বেশী জানে না। তবু কেমন একটা অসহায় ক্রোধে ওর ইচ্ছে করল প্রতিবাদ করতে। সুজিত সত্যিই বিশ্বাস করতে রাজী নয়, করবী ওকে ভালবাসতে পারে। যতই স্মার্ট হোক, ইংরেজী শিখুক, দেখতে মোটামুটি ব্রাইট হোক, বারীনকে করবী গ্রহণ করতে পারে না, যার বাবা জাঁদরেল সরকারী কর্মচারী, দিদির বিয়ে হয়েছিল দিল্লীতে, এখন আমেরিকায়।

—কখনো গেছিস?

—কোথায়।

—করবীর বাড়িতে।

—আমার সঙ্গে আলাপ নেই।

বলেই সুজিতের মনে হল মিথ্যে বলা হল। অবশ্য যেটুকু পরিচয় হয়েছে আজ তাকে কি আলাপ থাকা বলে। যাক্ গে।

—আলাপ হয়ে যাবে একদিন। আলাপ হলেই বাড়িতে ডাকবে। বাড়িতে গেলেই হুইস্কি খেতে দেবে। পড়ার ঘরে নিয়ে যাবে। পড়ার ঘরের আলো নিভে যাবে।

আবার আলোগুলো নিভতে শুরু করেছে। এবার ছবি শুরু হবে। রেবেকা। উপন্যাসটি সুজিতের পড়া আছে। আলো নেভার সঙ্গে সঙ্গেই বারীনের গল্পও খাদে নেমে আসছিল। সুজিত এখন ওর মুখটা দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু দেখতে না পেলেও ও জানে এই জাতীয় নোংরা আলোচনায় ওর সমস্ত মুখটা কী রকম যেন হিংস্র

কুটিল হয়ে ওঠে। চোখ ছুটো চকচক করে ওঠে বুনো জন্তুর মতো। গলায় যেন সাপের শিস্ টানার শব্দ।

সুজিত মনে মনে একটা কথা উচ্চারণ করেই ফেলল। জানোয়ার। এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন বারীনকে কঠোর শাস্তি দিয়ে সে মুক্তি পেল। ঝুঁকে বসল সামনের দিকে। আশ্চর্য, চারিদিকে এত সুশ্রী, সুবেশী, মহিলা। অথচ ঠিক তার সামনেই এক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রৌঢ়।

ছবি আরম্ভ হয়ে গেছে। হিচককের ছবি। চোখকে টেনে রাখে। সুজিত ছবির মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিল।

প্রিন্সেস হোটেলের ডাইনিং রুম। খেতে খেতে কথা বলছে নায়ক-নায়িকা।

লরেন্স অলিভিয়ার, আর জন ফনটেনি।

বয়স্ক নায়কের চোখে সুগভীর তৃষ্ণা। গোপন করা। তরুণী নায়িকার চোখে যৌবনের উদ্‌ভাসিত আভা। লজ্জা দিয়ে ঢাকা।

নায়ক—বাবা কি ছিলেন ?

নায়িকা—পেণ্টার।

নায়ক—বাঃ, খুব ভাল ?

নায়িকা—আমার তো মনে হত। কিন্তু সাধারণ লোকে তাঁকে বুঝতে পারত না।

নায়ক—হ্যাঁ, এটা তো চিরকালের সমস্যা।

নায়িকা—বাবা গাছ আঁকতেন। একটাই গাছ।

নায়ক—তার মানে, একটা গাছের ছবিই বার বার আঁকতেন।

নায়িকা—হ্যাঁ, দেখুন, বাবার একটা মজার থিওরী ছিল। বলতেন যদি তুমি ঠিক জিনিসটি, ঠিক জায়গাটি, ঠিক মানুষটি খুঁজে পেয়ে থাক, তাকে ছেড়ো না। এটা কি খুব বাজে কথা ?

নায়ক—আদৌ নয়। আমি নিজেও এতে বিশ্বাসী। বাবা যখন গাছ আঁকতেন তুমি তখন কি করতে ?

—ওটা তো একটা রাস্‌কেল। ওতো করবীর পয়সায়—

পিছন থেকে সহসা সাপের মতো হিসহিসে গলা বেজে উঠল বারীনের।

সুজিত কোন সাড়া দিল না। ভাবল সাড়া না দিলেই ও চুপ করে যাবে।

বারীনও হঠাৎ ঝুঁকে বসল সামনের চেয়ারে সুজিতের সমান্তরাল হয়ে।

—ওর ছোট বোনটা কিন্তু দারুণ। ফ্লেম। পটাবার মতো মেয়ে। করবীটা ভাল্‌গার হয়ে যাচ্ছে। ঐ ইডিয়েটটা, সমীর নাগ, দাঁত মাজে না, গোঁফ কামায় না, ওকে নিয়ে সিনেমা দেখছে, বাবার পয়সায় মদ খাওয়াছে করবী? প্রোলেটারিয়েট হতে হবে বলে ওর সঙ্গে মেশা? ন্যাস্টি।

সুজিত ফিসফিসিয়ে বলল—আমাকে ছবিটা দেখতে দে।

—বুড়ো অলিভিয়ারকে কি দেখবি। ছোকরা সেজেছে মেকআপ নিয়ে। ওতো পড়া গল্প। দেখার কি আছে। প্রেমের ন্যাকামী।

—তাহলে উঠে যা।

—করবী গাড়ি নিয়ে এসেছে নিশ্চয়ই।

—জানি না।

—ট্যাঁক খালি। ওদের বাড়িতে গেলে হুইস্কি খাওয়া যেত। ছোট বোনটাকেও দেখতাম।

—প্লীজ বারীন, চুপ কর।

সামনের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক সুজিতের দিকে তাকাল। রোগা। লম্বা চোয়াড়ে মুখে এক চাপ পাকা গোঁফ। কোন কথা বললেন না ভদ্রলোক। শুধু একবার অগ্নিদৃষ্টি হেনে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। একেই তো বলে সভ্যতা।

বারীন আবার পিছনে চলে গেল। সুজিত ছবি দেখায় মন দিল। মাঝে মাঝে সারা হলটা গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যায়, এমন

একটা দৃশ্য আসে। মাঝে মাঝে আলো ফুটে ওঠে। আলো ফুটে উঠলেই ছবি দেখতে দেখতেও অল্প দূরে বসে থাকা এক যুবতীর ঘাড়টা কেবলই সুজিতের চোখে পড়ে। সরু একটা হার রয়েছে গলায়।

ঠিক সবিতাদির মতো। মসৃণ। মাখন মাখন। সবিতাদি এখন কি করছে কে জানে। এই সুন্দর ছবিটা ইডিয়েট বারীনের পাল্লায় পড়ে না দেখে উচিত ছিল সবিতাদির সঙ্গে দেখা।

সাত

মনুমেণ্টের নীচে বিছানো কয়েকটা বুকস্টলের একপাশে দাঁড়িয়ে সুজিত একটা মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল।

সুজিতের আসার কথা পাঁচটায়। কিন্তু এসে গিয়েছিল পাঁচটার আগে। তখনো ময়দানে জমায়েত শুরু হয় নি। বক্তৃতার মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। মাইক পরীক্ষা হচ্ছে 'ওয়ান, টু, থ্রী, ফোর, হ্যালো টেস্টিং' ইত্যাদি শব্দের বারংবার পুনরাবৃত্তিতে। ঘাসহীন, ধুলো ভরা মাঠের কিছুটা অংশ খন্‌খনে রোদে দেখাচ্ছে ধারালো ছোরার মতো ঝকঝকে। সুজিত মনুমেণ্টের ঘন কালো ও দীর্ঘ ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও অনুভব করছিল যেন রোদের উত্তাপে তার মাথার ব্রহ্মতালুটা গলে যাচ্ছে। সুজিত বার বার নিজেকে দোষারোপ করল এই জন্যে যে তার উচিত ছিল কলেজ থেকে ফিরে কলের জলে গা-ধুয়ে তবে বেরুনো। কিন্তু সবিতার সঙ্গে মিলিত হওয়ার দুর্নিরোধ্য তাড়নায় সুজিত বোর্ডিং-এ কলেজের বইগুলো রেখেই বেরিয়ে পড়েছে। তার কেবল মনে হচ্ছিল মিটিং-এর বিরাট জনসমাবেশের একপাশে সবিতাদি একা একা তার জন্য প্রতীক্ষা করছে শূন্য ও সুদূর দৃষ্টিতে।

পত্রিকাটি নাড়া-চাড়া করে শেষ পর্যন্ত দেখে সুজিত অন্য একটা বইয়ে হাত দিল। কবিতার বই। শান্তির ওপর লেখা বাংলাদেশের একটি কবিতা সংকলন। সুজিত কবিতা ভালবাসে বলেই এই বইটি সম্বন্ধে তার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। পয়সার অভাবে কেনা এবং সময়ের অভাবে দেখা হয় নি। সুজিত যখন কয়েকটি কবিতা গভীর মনোনিবেশে পড়ছিল, সেই সময় তার পিঠে হাত রাখল কাঁদন।

—আরে, কাঁদন···কি খবর?

কাঁদনের দিকে তাকাতে গিয়ে সুজিতের চোখে পড়ল ময়দানে লোকসমাগম শুরু হয়ে গেছে।

—তারপর তোর কি খবর বল। কাল বাসায় গিয়েছিলি শুনলাম। আমরা গিয়েছিলাম সিনেমা দেখতে। গর্কির 'মাদার'। দেখেছিস?

—না, দেখি নি। কি রকম? ভাল? পুডভকিনের তোলা—না?

—হ্যাঁ। কি পড়ছিস? ও এই বইটা। এতে তো আমারও একটা লেখা আছে। দেখেছিস? পড়লি?

—না রে, তাই নাকি? বাঃ বাঃ, তুই তো নামকরা কবি হতে চল্‌লি রে। সুজিত যতক্ষণ কবিতাটা পড়ল কাঁদন ঝুঁকে রইল লেখাটার ওপর। পড়া শেষ করতেই কাঁদন জিজ্ঞেস করলে, কেমন লাগল? সত্যি করে বলবি।

—না, বেশ ভাল হয়েছে। তুই তো থাকিস শহরে, অথচ গ্রামের ইমেজগুলো আশ্চর্য ব্যবহার করেছিস তো? বিশেষ করে এই লাইনটা আমার খুব গভীর মনে হল।—

'প্রেয়সী নদীর কণ্ঠ গাবে শান্তি গান
জননী ধরিত্রী দেবে শান্তি-র সুগন্ধ মাখা নবান্নের ধান
নির্ভীক স্বাধীন মুক্ত অরণ্যের বজ্রবাহু শাখা
ওড়াবে সূর্যের দিকে লক্ষ লক্ষ শান্তি-র পতাকা।'

—কিন্তু কাঁদন, তুই তো এ ধরনের লেখা লিখিস নি কখনো? তোর অন্য লেখাগুলো কেমন যেন দুর্বোধ্য-দুর্বোধ্য লাগত আমার, সত্যি বল্‌ছি। এইটাকেই তোর সবচেয়ে আন্তরিক লেখা বলে মনে হচ্ছে আমার। আগের গুলো এলিয়টের চুরি, তাই নয় কি?

কাঁদন নৈর্ব্যক্তিক হাসি হেসে জবাব দিলে,—নারে না, অত সহজ নয়। আমি যা লিখি সেটাই লিখবো। এটা হঠাৎ লিখে ফেললাম 'শান্তির' জন্যে। অত নাম-করা লেখকদের সঙ্গে আমার লেখা ছাপতে চাইল। সম্মান বা স্বীকৃতি তো একটা। ক-দিনে লিখেছি জানিস? এক রাত্রে। যা আমি জীবনে কোনদিন লিখি নি। গাদাগাদা কাটাকাটি না করলে আমার লেখা হয় না।

কাঁদন বেশ নিবিড়তার ভঙ্গিতে সুজিতের সঙ্গে কথা বলতে চাইল।

—দিদি আসবে?

—হ্যাঁ, আসবে। কটা বাজে এখন?

কাঁদন দূরের একজনের ঘড়ি দেখে জানালে, পাঁচটা সাতচল্লিশ।

—পাঁচটা সাতচল্লিশ! তাহলে মিটিং শুরু হবে কখন? সবিতাদির ঘড়িতে কি এখনও পাঁচটা বাজে নি? এইজন্যেই রাগ হয়।

মিটিং শুরু হল ছ-টায়। লাল পতাকা আর ফেস্টুনে, কালো কালো অগণিত মাথায়, সম্মিলিত কণ্ঠের 'জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে, নগ্নকায়, ন্যুব্জপৃষ্ঠ, রুগ্ন, কৃশ বুভুক্ষু কৃষকের দূরাগত মিছিলে, মেয়েদের উজ্জ্বল পরিচ্ছদ ও উচ্ছল চলাফেরায়, খবরের কাগজের রিপোর্টার, মধ্যবিত্ত, শিক্ষক, শিক্ষিকা ও কেরানীদের সমাবেশে, বিভিন্ন ফ্রন্টের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী এবং সহানুভূতিশীল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ছোটখাট জটলায়, ছাত্র ও তরুণদের ইতস্তত কাজ ও কলরবে ময়দান জুড়ে নেমে এল এক গম্ভীর ও গাঢ় উত্তেজনা। উদ্বোধন সংগীত শুরু হল মঞ্চে সমবেত কণ্ঠে। সুজিত অধীর হয়ে উঠল সবিতার

জন্যে। একা একা দাঁড়িয়ে সুজিত পরিচিতদের বার বার একই উত্তর দিয়ে চলল, হ্যাঁ, ওদিকে যাব, যাচ্ছি, একটু বইপত্র দেখছি। কাঁদন ইতিমধ্যে চলে গেছে। সুজিত লক্ষ্য করল রাজনৈতিক মহলে কাঁদন খুব পরিচিত।

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, দশ, এগারো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুলের গাঁট গুনলো কিছুক্ষণ সুজিত। একশ গুনবো। এর মধ্যে না এলে ওদিকে চলে যাব। পঞ্চাশ পর্যন্ত দ্রুত গতিতে গুনে সুজিত বাকিটার বেলায় গতি থামিয়ে দিলে। ইতিমধ্যে একটি সুন্দরী মেয়ের দীপ্ত ও প্রাণময় যৌবন তাকে অন্যমনস্ক করেছিল। হিসেব হারিয়ে সুজিত তখন পঁয়ষট্টির পর নতুন করে ষাট গোনা শুরু করেছে, সবিতার সাড়া পেয়ে চমকাল।

—অনেকক্ষণ এসেছ, না? বড় দেরি হয়ে গেল? মিণ্টুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবে আসতে হল। তারপর বাসটা আটকাল কিছুক্ষণ ওয়েলিংটনের মোড়ে। বড় একটা প্রসেশান আসছে। অত রাগ ক'রো না বাবা। চল।

সবিতা ও সুজিত ময়দানের দক্ষিণ দিকের ফাঁকা অংশে ঘাসের ওপর পাশাপাশি বসল। তখন বক্তৃতা শুরু হয়ে গেছে। সুজিত বললে,—একটা বাদামওলাকে ডাকি।

—না, ওগুলো খেয়ো না। তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি।

সবিতা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কয়েকটা চকোলেট বার করল। দুজনেই মুখে দিল দুটো।

—কাঁদনের সঙ্গে দেখা হল।

—কখন এসেছে? কোথায় গেল?

—তুমি একে চেন, শান্তি কমিটির একজন উদ্যোক্তা, ঐ যে মোটা-সোটা বেশ স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক, খুব উৎসাহী, ত্রিলোকেশবাবু, ত্রিলোকেশ দত্ত, উনি এসে ডেকে নিয়ে গেলেন।

সুজিত-সবিতা যেখানে বসেছিল ক্রমে সেখানেও অনেকে এসে

বসতে লাগল। সুজিত বললে,—সবিতাদি, ডানদিকে তাকাও, ঐ যে প্যাণ্ট পরা, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, খাড়া চেহারা, কথা কইছেন উনি কে জান ? কবি উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়। ওর লেখা পড়েছ ? ইদানীং সাংঘাতিক লিখছেন। ওর প্রোজ স্টাইল অনবদ্য।

ওরা দুজনেই একবার মঞ্চের দিকে তাকিয়ে বক্তৃতায় কান দিচ্ছিল আর একবার চোখ দিয়ে দেখছিল চারপাশের লোকজনের চলাফেরা, টুকরো কথা, বেশ-ভূষা, অঙ্গভঙ্গি। কখনো ফিরে আসছিল নিজেদের কথায়।

—তুমি আমার চিঠিটা পেয়েছিলে তো ? সত্যি, তিন-চারটে চিঠি ছিঁড়েছি আমি। তোমাকে তো চিঠিতে সব লিখি নি। আমাদের বাড়ির ভেতর ভাঙন ধরেছে নানা দিক থেকে। বাড়িতে গিয়ে আমি শান্তি পাই না। আমার এক এক সময় কি মনে হয় জানো সবিতাদি, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে চাকরিতে ঢুকে পড়ি। আর হয়তো আমার পড়া হবে না!

সবিতা সুজিতের ব্যক্তিগত এই সব দুঃখ-কষ্টের কাহিনী শুনছিল বটে কিন্তু হৃদয় দিয়ে অনুভব করছিল না। মাঝে মাঝে ঘাসের নরম ডগা ছিঁড়ছিল লম্বা আঙুলের নখে। সুজিতের চোখে পড়ল সবিতার হাতে রিস্টওয়াচটা নেই।

—তোমার রিস্টওয়াচটা কি হল সবিতাদি ?

—ও, সেটা খারাপ হয়ে গেছে ক-দিন, সারাতে দেওয়া হয়নি। মাসের শেষ এসে গেল। এবার দোব।

সুজিত সবিতার সাদা হাতের দিকে তাকাল। কয়েকগাছা সরু চুড়ি। অযত্নে সোনার চেয়ে ম্লান। হাত দুটোর চেয়ে ঘাড়টা ফর্সা। ঘাড়টা এত ফর্সা হয় কেন ? খোঁপার আড়ালে থাকে বলে ? ঘাড়টা ঢালু আর পিছল। সরু হারটা ভারী সুন্দর মানায় ওখানে। কিন্তু আঙুলগুলো…সুজিতের অদম্য ইচ্ছে করল সবিতার আঙুলগুলো ছুঁতে। আর এই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে

আরক্ত হল তার মুখ, কথা থেমে গেল। মিটিঙের মাইক্রোফোন গর্জে উঠল যেন তার কানের পাশেই।

"......সারা দেশ জুড়ে এই যে ক্ষুধার রাজত্ব, অন্নের ক্ষুধা, বস্ত্রের ক্ষুধা, অর্থের ক্ষুধা, শিক্ষার ক্ষুধা, জ্ঞানের ক্ষুধা, বন্ধুগণ, আপনারা প্রত্যেকে নিজের নিজের জীবন-যাপনের কথা ভেবে দেখুন...

সুজিত সবিতার দিকে তাকিয়ে দেখল সবিতা স্থির ও মগ্ন হয়ে শুনছে। তার আঙুলগুলোও স্থির। সবিতা একবার তাকিয়ে অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করল সুজিতের। হাসল একটু। সুজিতের মনে হল সবিতা তার ইচ্ছার তাৎপর্য বুঝতে পেরেই হাসল। বরাভয়ের মতো হাসি। তাহলে? সুজিত একঘেয়ে বসে থাকার অস্বস্তি মেটাবার জন্যে নড়তে গিয়ে নিজের হাঁটুটাকে ছোঁয়াল সবিতার হাঁটুতে। কিন্তু অনুভব করল না কিছুই। হাতের আঙুলগুলো তাকে তখনো স্পর্শের আহ্বান জানাচ্ছে।

বিকেলের রোদের উগ্র উত্তাপ ক্রমশ জুড়িয়ে আসছিল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ওদিক থেকে গাছের সারি বেয়ে মাঝে মাঝে গা-জুড়োনো হাওয়া বয়ে গেল। ইতিমধ্যে বক্তৃতার উত্তাপও জুড়িয়ে এসেছে কিছুটা একই বক্তব্যের বারংবার পুনরুক্তিতে। সবিতার ভাল লাগছিল না বসে থাকতে। কিন্তু সুজিতকে সঙ্গে নিয়ে পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করতেও বাধা পাচ্ছিল মনে। সুজিতের ইচ্ছা করছিল ঠিক তার উল্টো। সবিতাকে সঙ্গে নিয়েই ঘুরতে চায় সে। যাদের চেনে, যাদের চেনে না, তাদের সকলের কাছেই সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে চায়, আমাকে দেখ, দেখে, ঈর্ষান্বিত হও, এই অতুল ঐশ্বর্যে আমি ছাড়া আর কারো অধিকার নেই, আমার সুখ কি দিয়ে মাপবে তোমরা?

হঠাৎ কাঁদন এসে দাঁড়াল ওদের সামনে, রোদে পোড়া মুখ আর মাথায় এলোমেলো চুল নিয়ে। সুজিত সবিতার দিকে তাকিয়ে হাসল একটু।

—তোমাকে মিতুদি খুঁজছে দিদি। আমি প্রায় আধঘণ্টা ধরে তোমাদের খুঁজছি। তুমি কতক্ষণ এসেছ? ভাদুড়ীর বক্তৃতা শুনলে? আগুন—না?

কাঁদনকে খুব আন্তরিক মনে হল সবিতার। কাঁচের মতো স্বচ্ছ মসৃণ এখন ওর মনটা।

—দিদি, সুজিতকে এক জায়গায় নিয়ে যাব। ডক্টর ধ্যানব্রত মুখোপাধ্যায় কলকাতায় এসেছেন লণ্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে। খুব সিলেকটেড লোকদের নিয়েই একটা ঘরোয়া বৈঠক ডাকা হয়েছে ত্রিলোকেশ বসুর বাড়িতে। উনি তো আমাকে খুব স্নেহ করেন। আমি যাচ্ছি, সুজিতকেও নিয়ে যাই। ধ্যানব্রতবাবুকে তো তুই কখনো দেখিস নি, সুজিত? দারুণ পার্সনালিটি। দর্শন আর অর্থনীতি দুটোতেই জায়েণ্ট। ভারত সরকার ওঁকে অ্যামবাসাডর করতে চেয়েছিল। উনি রাজী হন নি।

সবিতা চাইছিল না সুজিতের সঙ্গে দীর্ঘদিন পরে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার অবসরটুকু স্বল্পায়ু হোক। কাঁদনের ওপর রাগ করতে ইচ্ছে করল সবিতার। একবার মনে হল কাঁদনের মুখের উপরেই বলে দেয়, সুজিত ওসব পছন্দ করে না, যেতে হলে তুই একাই যা। কিন্তু কি যেন ভেবে ঠিক মনের ইচ্ছার উল্টো আবেগটাই প্রকাশ করল। কাঁদনের দিকে মিষ্টি করে তাকিয়ে বলল,

—আর উঠতে পারছি না কাঁদন, তুই মিতুদিকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়। লক্ষ্মী ভাইটি আমার······

কাঁদন চলে গেল।

সুজিত সবিতার দিকে তাকাল।

—যাব?

—তোমার যেতে ইচ্ছে করছে?

—না।

—তাহলে যেও না।

—তুমি যা বলবে তাই হবে।

—ভারী লক্ষ্মী ছেলে!

সবিতা যেন গানের মতো, যেন গালে চুমো দিয়ে আদর করার মতো সুর দিয়ে কথাটা বলল। মুখের কথার মধ্যে থেকে যেন সুজিতের সর্বাঙ্গে ঝরে পড়ল সবিতার অন্তরের উৎসারিত ভালবাসা, স্নেহ। এত আন্তরিক, এত প্রসন্ন, যেন এই রকম সব মুহূর্তের কিছু গন্ধ থাকে, যা মনকে আনন্দে কাঁদিয়ে তোলে তার সুরভিতে।

সুজিত মনে মনে প্রার্থনার মতো করে কয়েকটি কথা উচ্চারণ করল। সবিতাদির সঙ্গে একটা গোটা রাত্রি আমি শুধু কথা বলতে চাই।

মনের মধ্যে একটা আকস্মিক খুশীর ঢেউকে সামলাবার জন্যেই সুজিত পকেটে হাত দিল। ময়দানে আসার আগে তিনটে খুচরো গোল্ড ফ্লেক কিনেছিল। কেনার সময়েই ঠিক করেছিল সবিতার সামনেই আজ সে সিগারেট খাবে প্রথম।

পকেটের ভিতরে সিগারেটের প্যাকেটে হাত রেখেই সুজিত সবিতার দিকে তাকাল।

—আর একটা চকোলেট দেবে?

—এই তো একটা খেলে।

—আরেকটা সিগারেটের সঙ্গে খাব।

—সিগারেট? তুমি সিগারেট ধরেছ নাকি?

—ধরি নি। ধরবো ভাবছি। এখন একটা খাব। খাই?

—যদি বলি—না…।

—আমি জানি তুমি না বলতে পারো না। সিগারেট খাওয়ার মতো বয়স আমার হয়েছে।

সুজিত পকেট থেকে প্যাকেটটা ও একটা দেশলাই বার করল। সুজিতের কণ্ঠস্বরে প্রাপ্তবয়স্কোচিত দৃঢ়তা লক্ষ্য করল সবিতা। সুজিত বড় হচ্ছে, পরিণত হচ্ছে। বড় না হওয়াই যেন সবিতার

পক্ষে ভাল, শুভ—এই রকম একটা ভাবনার অস্পষ্ট আভাস মনে ভেসে উঠে ওকে একটু চঞ্চল করে তুলল।

সুজিত পর পর তিনটে কাঠি জ্বালল। একটাতেও সিগারেটে আগুন লাগল না। ময়দানের খোলা প্রান্তরে বাতাস বইছিল হুহু করে। সবিতা এবার দেশলাইটা ওর হাত থেকে টেনে নিল। নিজেই একটা কাঠি জ্বেলে সুজিতের মুখের সিগারেটের সামনে ধরল। সুজিত সিগারেট ধরাল।

সিগারেটের ধোঁয়া বাতাসে উড়িয়ে সুজিত সবিতার দিকে তাকিয়ে দুষ্টু-দুষ্টু মুখ করে যেন লুকোতে চাইছে এমন হাসি হাসতে লাগল।

—হাসছ যে ?

—একটা কথা মনে হল।

—কি ?

—তোমার আগুন ছাড়া আমার কিছু জ্বলে না।

সবিতার মুখেও হাসি এসে গিয়েছিল। হাসিটাকে দমন করে সবিতা যেন বিষণ্ণ হবার চেষ্টা করতে করতে বললে,

—আমার আগুনে যা জ্বলে, তা শুধু পুড়ে ছাই হবার জন্যে।

—এই জন্যে তোমার ওপর আমার রাগ হয়।

সবিতার কণ্ঠস্বর তখনও বিষণ্ণ।

—কেন ?

—তুমি বড্ড সিরিয়াস। একটা হালকা রসিকতা। তারও একটা সিরিয়াস জবাব না দিলে নয়।

সবিতা হয়তো কিছু বলতো। সেই সময়ে শর্বাণী অর্থাৎ মিতুদিকে নিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল কাঁদন।

মিতুদিকে পৌঁছে দিয়েই কাঁদন চলে গেল। যাবার আগে সবিতাকে বলে গেল,

—তোমরা এইখানেই আছ তো ? আমি আসছি।

সবিতা শর্বাণীকে বসবার জায়গা দেবার জন্যে সরে বসতে গিয়ে

সুজিতের আরো সংলগ্ন হল। চারপাশে অনেক ছড়ানো পরিসর। তবু সবিতা সুজিতের দিকেই সরে বসল।

—ব'সো।

শর্বাণী হাসতে হাসতে বসল। এই সময় সুজিতের দিকেই দৃষ্টিটা নিবদ্ধ ছিল তার। সুজিত শর্বাণীকে এক পলক দেখে নিয়েই অন্যমনস্ক করে রেখেছিল নিজেকে। এতক্ষণে বক্তাদের মাইক-ফাটানো কলস্বর কিছুই মন দিয়ে শোনে নি। এখন যেন শুনছে এমনি নিবিষ্ট ভঙ্গী করল। শর্বাণী বসেই চোখের চাউনি দিয়ে প্রশ্ন করল সবিতাকে—কে ?

সবিতাও চোখ দিয়ে হেসে জবাব না দেবার চেষ্টা করল। সবিতার হাসিতেই শর্বাণী যেটুকু বোঝার বুঝে নিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে এল।

সবিতা ভেবেছিল সুজিতকে দেখে শর্বাণী কিছুটা অস্বস্তি বা অখুশীর ভঙ্গী প্রকাশ করবে। কিন্তু শর্বাণী আজ যেন অন্যরকম। সবিতা তার কাছে কিছু একটা গোপন করছে এতেই সে আহত।

কথা বলতে বলতে, শর্বাণীর চোখের উজ্জ্বল নীল রঙের ভিতরে অন্তরঙ্গ প্রীতির লাবণ্য দেখতে পেয়ে সবিতা এক সময় বলে উঠল,

—মিটিংএর পর তুমি কোথায় যাবে ?

—কোথায় যাব ? কিছু ঠিক নেই।

—চলো, আমরা দুজনে কোথায় গিয়ে বসবো, তোমার সঙ্গে অনেক কথা ছিল।

—কি কথা ?

'কি কথা' কথাটা এমন মধুর হেসে শর্বাণী বলল যেন সব কথাই তার জানা হয়ে গেছে।

এই সময় সবিতা শর্বাণীর একটা হাত নিজের হাতে টেনে নিল আদরে।

—তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি···সুজিত···

সুজিত তাকাল সবিতার দিকে···

—সুজিত চক্রবর্তী, আমার বন্ধু। আর এই হচ্ছে আমাদের মিতুদি, ওরফে শর্বাণী চৌধুরী। দিনরাত শিক্ষক আন্দোলন নিয়ে এত ব্যস্ত যে মাথার চুল পেকে গেল তবু···

—তবু কি ?

—কি আর, সংসারে মন দিতে পারল না।

—মনের মতো মানুষ পেলাম কই।

—আহা! আর বলো না। মনের মতো মানুষের আবার তোমার অভাব হয়েছে কোনদিন। কম করে একশো জন তোমাকে ভাল বাসতে চেয়েছে, একশো জন এখনো ভালবাসতে পারে।

—দু-একজনের নাম বলে দে না, নিজেই গিয়ে প্রপোজ করি।

—আর ঠাট্টা ক'রো না।

এই সময় কাঁদন ফিরে এল। ইতিমধ্যে ময়দানে বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যের ধূসরতা নেমে এসেছে। আলো জ্বলে গেছে চৌরঙ্গীতে।

—সুজিত, যাচ্ছো তো আমার সঙ্গে ?

সুজিত সবিতার দিকে তাকাল।

—আমি জানি না। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

সবিতা শর্বাণীর দিকে তাকিয়ে হাসল।

—দেখেছো, কি রকম ফাজিল ছেলে! তুমি যাও। আমি আজ মিতুদির সঙ্গে একটু আড্ডা মারবো।

ময়দানের মিটিং তখনো ভাঙে নি। বক্তৃতার পালা শেষ হয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। এখন গান হচ্ছে সমবেত কণ্ঠে। এরপর অভিনীত হবে একটা একাঙ্কিকা।

কাঁদন বললে,—উঠে পড় সুজিত।

সুজিতের এত তাড়াতাড়ি ওঠার ইচ্ছে ছিল না। আরো কিছুক্ষণ সন্ধ্যের এই ম্লান অন্ধকারে সবিতার শাড়ীর আঁচল, শরীরের কোমল অংশের স্পর্শের ভিতরে মগ্ন হয়ে থাকার বাসনা ছিল। তবু উঠতে হল। সবিতাও উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। মিতুদিকে আজ সে সব

বলবে। বিরামের কথা, সুজিতের কথা। নিজের নতুন করে বেঁচে ওঠার কথা।

সবিতা চলে গেল শর্বাণীর সঙ্গে। সুজিত ও কাঁদন বালিগঞ্জের ট্রামে চাপল লেক মার্কেটের কাছে ত্রিলোকেশ বসুর বাড়িতে পৌঁছবার জন্যে। কাঁদনের কাছে পয়সা ছিল না। সুজিতই টিকিট কাটল দুটো।

ত্রিলোকেশ বসুর চারতলা বাড়ির দোতলায় বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। চারপাশের মসৃণ পরিচ্ছন্নতা ও রুচির সামঞ্জস্যে সুজিতের নিজেকে বড় অকিঞ্চিৎকর মনে হল, দরজার সামনে পায়ের সাণ্ডেলটা খুলতে গিয়ে লজ্জা পেল। কার্পেট বিছানো মেঝেয় বসতে গিয়ে গা কাঁপল তার। কিছুক্ষণ সে ভাল করে তাকাতে ও আলোচনার বক্তব্য শুনতে পেল না। ঘরের একাংশে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও সুরুচিসম্পন্ন বয়স্ক মহিলার দিকে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুজিতের মনে হল সে যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে এখানে। আসলে নিজের স্বাস্থ্যের রুগ্নতা সম্পর্কে সুজিত ভীষণ আত্মসচেতন ও দুর্বল। ক্রমশ ঘরের সবটা চেহারা চোখে পড়ল সুজিতের। কার্পেট ছাড়াও দেয়ালের দিকে দামী সোফা ও বেতের মোড়া আছে কয়েকটা। দেয়ালে টাঙানো আছে যথাক্রমে লেনিন স্টালিন, মার্কস, ভ্যান গগ্ ও যামিনী রায়ের ছবি ও রবীন্দ্রনাথের ফটো। দরজার জানালার পর্দাগুলো শান্তি নিকেতনের। বাংলার লোকশিল্পের প্রচুর সংগ্রহ আছে একটি আলমারিতে। কোণে একটা ছোট টেবিলে বাঁশের গাঁট কেটে তৈরি, নকশা আঁকা ফুল-দানিতে রজনীগন্ধা। উত্তরে প্রকাণ্ড দুটো আলমারি সোনার জলে নাম লেখা রেক্সিনে বাঁধানো বইয়ে ঠাসা। ক্যালেণ্ডার মাত্র একটি। বিমান কোম্পানীর বিজ্ঞাপন আঁকা।

কয়েকজন পরিচিত কবি সাহিত্যিককে দেখতে পেল সুজিত। সুজিত এতক্ষণে সাহস পেল ডক্টর ধানব্রত মুখোপাধ্যায়ের মুখের

দিকে সরাসরি তাকিয়ে দেখার। পালিশ করা ঝকঝকে প্রশস্ত ললাট। আয়ত অনুসন্ধানী চোখ। বয়সের প্রৌঢ়ত্বকে স্পষ্ট করে তুলেছে মাথার টাক ও সাদা গোঁফ। ঠোঁটের একদিকের ভাঁজে আজীবনের শিক্ষা-সাধনা চিন্তাশীলতার গাম্ভীর্য যতটা স্পষ্ট, চরিত্রের সহজাত রসবোধ, বৈদগ্ধ্য, অনায়াস কৌতুকপ্রিয়তা ইত্যাদি ততটাই প্রতিভাত হয় অন্যদিকে। ছোট ছোট শব্দে গভীর তাৎপর্য ফুটিয়ে কথা বলেন। কিছুটা অন্যমনস্কতার মধ্যে সুজিত ছাড়া ছাড়া ভাবে কথোপকথন শুনে চলল। কাঁদনের মধ্যে কিন্তু আড়ষ্টতার কিছুমাত্র চিহ্ন নেই। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পেয়ে ঘরের অনেকে দরজার দিকে তাকাল। মাঝবয়সী একজন ভদ্রলোক ঢুকলেন। হাতে চামড়ার ব্যাগ। সাদা ঢিলে হাতা পাঞ্জাবি। দেখে মনে হয় অধ্যাপক।

হাসি এবং মনের উৎফুল্লতা দিয়ে সকলেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। ধ্যানব্রতবাবুও সুন্দর হেসে সম্ভাষণ জানালেন,—আরে এস এস ক্ষিতীশ, তোমার কথাই জিজ্ঞেস করছিলুম।

ক্ষিতীশ ভৌমিক ধ্যানব্রতবাবুর পাশে গিয়ে বসলেন। সুজিত ক্ষিতীশবাবুকে চেনে। অধ্যাপক নন ইনি। সাহিত্য-সমালোচক ও প্রবন্ধকার। ভাষাতত্ত্বে গভীর জ্ঞান আছে। রাজনৈতিক মহলে এঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে। নির্ভীক ও হৃদয়বান পুরুষ।

আলোচনা সাহিত্যে বস্তুবাদ রোমানটিসিজমের পার্থক্য, অর্থনীতি ও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক কতটা ইত্যাদি বিষয় থেকে অবশেষে শান্তিতে পৌঁছল। ধ্যানব্রতবাবুর মুখমণ্ডল আগের চেয়ে উদ্ভাসিত হল।

—পিকাসোর পায়রাকে তো তোমরা পিস-ডাভ করেছ? পিকাসোকে বোধ হয় বাংলাদেশ কিছুটা বোঝে। সোভিয়েট বুঝতে পারে না। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে সোভিয়েট প্রাচীনপন্থী। তবু আমাদের যামিনী রায় বোধ হয় ওদের শান্তি দেবে।

ধ্যানব্রতবাবু দেয়ালে টাঙানো যামিনী রায়ের ছবির দিকে তাকালেন।
—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দপ্তরের চেয়ে যামিনী রায়ের চিত্রশালায় অনেক বেশি শান্তি।
প্রায় স্বগতোক্তির মতো শোনাল তাঁর কথাগুলো। ক্ষিতীশবাবু যখন গভীর কিছু শোনেন বা বলেন তাঁর মুখে একটা বেদনাদায়ক ভঙ্গি ফোটে। এটা সুজিত আজও লক্ষ্য করল আগেও করেছে।
শ্রোতাদের একজন প্রশ্ন করলে,—আচ্ছা আপনি তো কলকাতায় এলেন প্রায় তিন বছর বাদে। কলকাতার নতুন কোন ক্যারাকটার চোখে পড়ল আপনার?
কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে ধ্যানব্রতবাবু বলতে শুরু করলেন,
—হ্যাঁ, তা পড়েছে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাকে আশান্বিত করেছে বাংলার তরুণ মেয়েরা।
পুরুষ শ্রোতাদের মুখে এবং মহিলা শ্রোতাদের শরীরে চাঞ্চল্য জাগল।
—এদের দৃঢ়ভাবে হাঁটাকে মনে হল নতুন পদক্ষেপ। এদের মায়েরা কখনো এভাবে হাঁটতে পারত না। এদের কথা বলায় নতুন আত্মপ্রত্যয় এসেছে। অতিরিক্তকে বাতিল করতে শিখেছে এই সব তরুণীরা। আঁচল বাদ দিয়ে কাপড় পরছে এরা। এদের মায়েরা যখন দোকানে দরদস্তুর করছে, এরা তখন আলোচনা করে এম. এ.-র সাবজেক্ট সিলেক্‌শন নিয়ে। আমার মনে হল রাজনীতির উৎসাহ কিছুটা কমিয়ে এরা এখন জ্ঞানের দিকে মন দিয়েছে। পুরো উনিশ শতকের সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন যা করতে পারে নি একটা যুদ্ধের পরেকার অর্থনীতি তা করল। সমাজের কাঠামোটাকে না পাল্টালে সমাজের উন্নতি নেই। কাঠামোটাকে পাল্টানোর জন্যে চাই নতুন সমাজ-চেতনা। সেই চেতনাকে বহন করার জন্যে চাই একটা নতুন শ্রেণী। সে শ্রেণী কি ভারতবর্ষে, বাংলাদেশে জন্মেছে? মধ্যবিত্তই মরে বেঁচে আছে এখনও। এখন তো

তোমাদের মজুর নেতা মধ্যবিত্ত। তবে মনে হয়, বাংলার তরুণ মেয়েরা কিছু করতে পারবে অচিরে। তাদের পক্ষে শ্রেণীচ্যুত হওয়া অপেক্ষাকৃত সোজা। তারা জাত প্রোলেটারিয়েট। অন্তত ভারত-বর্ষের সমাজে এটা সত্যি।

সুজিত আকৃষ্ট হয়ে শুনল। ধ্যানব্রতবাবুর এই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তার মনে প্রবল শ্রদ্ধা জাগাল। শুনতে শুনতেই সুজিতের মনে পড়ল সবিতার কথা। সবিতাদির এখানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। এগুলো শুনে সবিতাদির আত্ম-সংকোচ কিছুটা দূর হত। সবিতাদি অন্তরে এত দৃঢ়, অনমনীয় অথচ বাইরের জগতের মেলামেশায় ভীষণ রকম দ্বিধা-কাতর! এগুলো ভাঙতে হবে।

বড় ট্রেতে সাজানো চায়ের কাপ এল ঘরে।

সেই সময় দরজার কাছে সুজিত দেখতে পেল করবীকে। দেখে কাঁদন হাত তুলল। করবী এসে বসল কাঁদন ও সুজিতের কাছাকাছি। করবীর শরীরের ভিতর থেকে প্রসাধনের একরকম মিষ্টি গন্ধ ঘ্রাণে এল সুজিতের। সুজিতের দিকে তাকিয়ে করবী হাসল। প্রত্যুত্তরে সুজিতও।

—অনেকক্ষণ এসেছেন ?

—ঘণ্টাখানেক হবে।

—দেরি হয়ে গেল।

করবী কাঁদনের দিকে তাকাল।

—তুমি! একসঙ্গে এসেছো বুঝি ?

—হ্যাঁ, আস্তে, চপ্ করো শোনো।

চা খাওয়ার জন্যে আলাপ-আলোচনাটা সাময়িক বন্ধ থাকলেও ধ্যানব্রতবাবু কয়েকজন লোকের সঙ্গে চাপা স্বরে কিছু কথা বলছিলেন। কাঁদন সেগুলো শোনার জন্যেই উৎকর্ণ।

সভা শেষ হলে করবী উঠে গিয়ে ভিড়ে মিশে গেল। সভার

প্রায় অধিকাংশরাই করবীর পরিচিত। করবী ধ্যানব্রতবাবুর কাছে গিয়েও তাঁকে প্রণাম করলে তিনি মাথায় হাত দিয়ে করবীকে আশীর্বাদ করলেন। ভিড়টা ধীরে ধীরে কিছুটা হালকা হয়ে এল। কয়েকজন সুন্দরী মহিলার সঙ্গে তখনও করবী মাথার বেণী দুলিয়ে উচ্ছল হাসিতে দুলতে দুলতে কথা বলে চলেছে। ঘরের একপ্রান্তে সুজিত ও কাঁদন দাঁড়িয়েছিল। করবীর জন্যে অপেক্ষা করছিল কাঁদন, কাঁদনের জন্যে সুজিত চলে যেতে পারছিল না।

একবার এসে করবী কাঁদনকে ডেকে নিয়ে গেল। পরিচয় করিয়ে দিল কয়েকজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সঙ্গে।

তারপর ওরা তিনজনে সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় নেমে এল।

—চা খাওয়াও।

অনুরোধের চেয়ে আদেশের ধ্বনিটাই বেশী স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল কাঁদনের কণ্ঠস্বরে।

ওরা তিনজনে একটা রেস্টুরেণ্টে গিয়ে বসল।

আজকের করবী যেন একটু কম উগ্র। যে শাড়ীটা পরেছে সেটা হয়তো ওর মায়ের, সাদা শাড়ীতে বয়স্কাদের উপযোগী ফুলের নকশা আঁকা পাড়। ত্রিলোকেশবাবুর ড্রইংরুমের রুচিমণ্ডিত পরিবেশের পক্ষে মানানসই হবে ভেবেই হয়তো করবীর গায়ে আজ সাদা শাড়ী, সাদাসিধে ব্লাউজ, সাদামাঠা ভ্যানিটি ব্যাগ, ঠোঁটে লিপস্টিকের হালকা প্রলেপ।

করবীর কথাবার্তার মধ্যেও আজ যেন ধার কম। যেন ত্রিলোকেশ-বাবুর ড্রইংরুমে টাঙানো যামিনী রায়ের আঁকা নারমূর্তির শান্ত শীতল নম্রতার প্রভাব পড়েছে তার উপর।

আজকের ময়দানের মিটিং-এর লোকসংখ্যা, মিটিং-এর বক্তব্য, মিটিং-এর ছোটখাট দেখাশোনার অভিজ্ঞতা এইসব নিয়েই কথা চলছিল চা খেতে খেতে। চা খাওয়া শেষ হলে সুজিত পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করল। একটা সিগারেট নিজে

নিয়ে আরেকটা কাঁদনকে দিল। কাঁদন সিগারেট ধরিয়ে কোনরকম ভূমিকা না করেই করবীকে বললে,

—তুমি আমাকে পনেরোটা টাকা দেবে।

—কেন ?

—একটা জামা কিনতে হবে।

—কি ব্যাপার ?

—মেদনীপুরে যাব। খাজুরী-র বাই-ইলেক্‌শানে কাজ করতে। আমার সব জামা ছেঁড়া।

—জুতো আছে ?

—চলে যাবে।

—কবে চাই ?

—কাল-পরশু দিও।

--ঠিক আছে।

সুজিত অবাক হল ওদের এই চাওয়া-পাওয়ায়। সুজিত অনুমান করার চেষ্টা করল ওদের সম্পর্কটা ঠিক কি ধরনের। ভালবাসা ? না রাজনৈতিক সূত্রের নিবিড় বন্ধুত্ব !

চলে যাবার আগে করবী আজও একবার সুজিতকে বললে,

—কবে আসছেন আমাদের বাড়ি ?

—যাব একদিন।

—পরিমল, তুমিই নিয়ে এসো না একদিন।

—আচ্ছা !

কৌতূহলটা অদম্য হয়ে উঠেছিল। তাই দোতলা বাসে বাড়ি ফেরার পথে সুজিত কাঁদনকে প্রশ্নটা জানিয়েই ফেললে।

—তুই করবীকে টাকা চাইলি কি করে ?

—কেন ?

—তোদের মধ্যে কি টাকা চাইবার মতো সম্পর্ক আছে কিছু ?

—আছে বৈ কি। না হলে চাইবো কেন ?

—কিসের সম্পর্ক ?

—কমরেড শিপ।

—তার বেশী কিছু নয় ?

—করবী আমার কবিতার ভক্ত। যদি কবিতার বই বার করি, করবীই টাকা দেবে ছাপবার।

সুজিতের মনে পড়ল করবী সম্বন্ধে বারীনের মন্তব্য। আর কোন কথা না বলে সুজিত বাসের জানলা দিয়ে রাত্রির কলকাতার দিকে তাকাল। কলকাতা রাত্রে বদলে যায়। সুজিতের অনেকবার ইচ্ছে করেছে একদিন সে কলকাতার রাত্রি থেকে ভোর হওয়া দেখবে।

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সুজিতের মনে পড়ল আর একটি আন্তরিক প্রার্থনা।

একদিন সমস্ত রাত, না ঘুমিয়ে, সুজিত কথা বলবে সবিতার সঙ্গে।

মিণ্টুর ভাবনায় সবিতা দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে একজন অচেনা ভদ্রলোককে ঘরে বসে থাকতে দেখল। মিণ্টু ঘুমিয়েছে দেখে ভদ্রলোকের দিকে একবার বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে তারপর আকস্মিক বিহ্বলতার জের সামলাতে না পেরে দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

—মণিকাকা, তুমি কখন এলে ? ঈস্, তোমাকে দেখতে পাব কখনো ভাবি নি। কতদিন ভেবেছি তুমি আসবে। কখন এলে এখানে। একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম। ময়দানে। বেড়াতে মানে মিটিঙে। কবে এসেছ কলকাতায় ? কাকিমা সুদ্ধ ? এঁ্যা, পরশু এসেছ ? আর আমার এখানে এলে আজ ? তাতো আসবেই, তোমরা কি আর মনে রেখেছ আমাকে ? আমাকে সবাই ভুলে গেছে। তোমাদের ভুলে যাবার মতো ক্ষমতাও আমার আছে। কাকিমাকে নিয়ে এলে না কেন ? আমার ছেলেটাকে দেখলে ? চা খেয়েছ ? দাঁড়াও চা বসাই। আর কি খাবে ?

দোকান থেকে সিঙাড়া এল। বারান্দায় শতরঞ্জি পেতে বসল দুজনে। কণ্ঠস্বর খুশিতে আর অনর্গল কথা বলার আবেগে থরথর করে কাঁপছিল। মণিকাকার আঙুলগুলো দু-হাতে অস্থিরভাবে নাড়তে নাড়তে সবিতা বলল,—জান মণিকাকা, খুশিতে আমি এখুনি মরে যেতে পারি।

—কেন রে? তুই দেখছি এখনও ঠিক সেই আগের মতোই আছিস। একটুও বদলাস নি।

—না, বদলাই নি। মাথার চুলে হাত দিয়ে দেখ। অর্ধেক নেই। মুখ দেখে আমাকে চিনতে কষ্ট হয় না তোমার। সে আমি আর নেই মণিকাকা। মরে যাচ্ছিলাম, মরতে মরতে বেঁচে উঠেছি।

—কি হয়েছিল রে? অসুখ-বিসুখ?

—সে তুমি বুঝবে না। বুঝলেও বিশ্বাস করবে না। বলবো, তোমাকে সব বলবো।

—কাঁদন কোথায়? ঘরে ঐ মেয়েটি কে? ওর বোধ হয় পড়ার অসুবিধা হল আমার আসাতে। এখানে বসে পড়ছিলেন।

—কাঁদন। কাঁদনের কিছু হল না মণিকাকা। পড়াশোনা করল না আর। রাজনীতি করছে, কবিতা লেখে, এই সব। মেয়েটি আমার ছাত্রী। চিত্রা, ওর বাবা মা থাকে লক্ষ্ণৌ-এ। এখানে এক দূর সম্পর্কের মাসীমার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করছিল। তারা তাড়িয়ে দিলেন। আমি এখানে এনে রেখেছি। পড়াশোনায় ভাল।

—বিরাম ফেরে কখন? সেইখানেই কাজ করছে নাকি?

—তার ফিরতে দশটা সাড়ে দশটা। হ্যাঁ, সেই সাপ্তাহিকেই। তবে বাইরের আরও নানা রকম কাজ করতে হয়। এখন ওর খাটুনিটা অনেক বেড়েছে।

—বেশ তো আছিস। দুজনেই উপায় করছিস। একটা ছেলে। বাচ্চা-কাচ্চা নইলে সংসার মানায় না। আমার কটা হল জানিস তুই। তিনটে।

—তুমি স্বপ্নের দেশে আছ মণিকাকা। আমি কোথায় নেমে এসেছি জান? পাতালে, নরকে। আমি এখন এক পয়সার হিসেবে গণ্ডগোল হলে গলা ফাটাই, জান?

মণিকাকা অট্টহাস্যের মতো হেসে উঠলেন। সবিতার পিঠে কয়েকটা আদরের চাপড় মেরে বললেন,—তোর চেহারাটা আগের চেয়ে বেশ খানিকটা পাল্টেছে বটে ডালিয়া, কিন্তু তোর চরিত্রটা, নেচারটা এখনো সেইরকম রয়ে গেছে। স্টাগল করাটাও লাইফ। আমার জীবনটাকে তো তুই দেখেছিস। কত ঝড়-ঝাপ্টা সামলে আজ দাঁড়াতে পেরেছি। কষ্টে পড়লেই আমার হাসি পায়। আমার এই হা হা করা হাসিটাকে তোর কাকিমা আবার সইতে পারে না। দিনে রোজ দু-ঘণ্টা হাসবি দেখবি মনে কোন রোগ নেই।

মণিকাকা আবার বারান্দা কাঁপিয়ে হাসলেন। নীচের মুদিখানা দোকানের বয়স্ক ছেলেটা ওদের দিকে তাকিয়েছিল।

চলে যাওয়ার আগে মণিকাকা সবিতাকে বুকের দিকে টেনে নিয়ে পোষা পায়রার মতো আদর করলেন। পাঁচটাকার একটা নোট জোর করে গুঁজে দিলেন সবিতার হাতে মিণ্টুকে কিছু কিনে দেবার জন্যে।

মণিকাকা চলে যাবার পরও সবিতার বুকে অনেকক্ষণ তোলপাড় করল হাসিটা। মণিকাকা এমন একটা অস্তিত্ব যে চলে গেলে ফাঁকা লাগে। পৃথিবীতে মণিকাকার মতো খাঁটি মানুষ ক-জন জন্মেছে কে জানে?

সবিতা বারান্দায় বসে রইল চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে চিত্রা এসে মণিকাকার সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করতে সবিতা তার সঙ্গে গল্প করল। মণিকাকাই বিয়ে দিয়েছিল ওদের। সবিতার বাবা রাজি ছিল না রেজেষ্ট্রী করা বিয়েয়।

নীচের তলার হরিসাধনবাবুর ছোট মেয়েটা এল বারান্দায়।

—সবিতাদি, বাবা আপনার কাছে একটা টাকা ধার চাইলেন, দেবেন ?

—এক টাকা ? খুচরো টাকা তো নেই। সব দশটাকা পাঁচটাকার নোট। মাইনে পাওয়ার পর ভাঙানো হয় নি। ভাঙিয়ে দোব।

মেয়েটি চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল আবার।

—আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে লোক। চা চিনি এসব আনতে হবে। বাবা বললেন, পাঁচ টাকাই দিন, ভাঙিয়ে ফেরত দেবেন।

সবিতা চিত্রাকে বলল,—সুটকেশ থেকে একটা পাঁচটাকার নোট বার করে দিতে। একটু পরে বারান্দায় এল পাশের বাড়ির গর্ভবতী মেয়েটি।

—জান দিদি ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। পেটের ছেলেটার কাল থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। কেন এমন হল বলতো ? উনি যে কেন আসছেন না। আমার মনে হয় সামনের সপ্তাহে মাইনে পেয়ে আসবেন আমাকে নিয়ে যেতে।

সবিতা মেয়েটির শিশুসুলভ শান্ত সহাস্য নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে বেদনা বোধ করল। ও জানে না যে ওর স্বামী ওকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেছে। ওকে গোপন রাখা হয়েছে কথাটা গর্ভের সন্তানটির প্রতি দৃষ্টি রেখে। অভাগী ! প্রত্যেক দিন মিথ্যে স্বপ্ন রচনা করছে স্বামীকে নিয়ে।

কিন্তু, আমি, আমি আজ সুখী, তৃপ্ত তাই নয় কি ? সুজিতকে পেলাম। মণিকাকা এল কতদিন পরে, মণিকাকা হাসতে বলল। হ্যাঁ, আজ অন্তত আমি প্রাণভরে হাসতে পারি।

বিরাম বাড়ি ফিরতেই সবিতা তার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে,—এই জানো, মণিকাকা এসেছিল আজ।

—তাই নাকি ? কখন ?

—এই তো একঘণ্টা হবে চলে গেল। কলকাতায় আছে চার-পাঁচ দিন। একদিন যেতে বলেছে আমাদের দুজনকে, যাবে ?

—দেখবো।

বিরাম খেয়ে উঠে টেবিলে বসতে যাচ্ছিল কাগজপত্র নিয়ে। সবিতা তার হাত চেপে ধরে বারান্দার দিকে টানলে। বারান্দায় শতরঞ্জি পাতা ছিল। বিরামকে প্রায় জোর করে বসালে সেখানে। বিরাম বলল,—কী হচ্ছে এসব ছেলেমানুষি।

—না তুমি ব'সো এখানে। বল, তুমি খুশি হয়েছ কি না?

—কিসে?

—মণিকাকার খবর শুনে?

বিরাম সবিতার দিকে তাকিয়ে হাসল। সবিতা বিরামের হাতের আঙুলে নিজের আঙুল গলিয়ে ফাঁস গড়ল।

—তোমার মনে আছে মণিকাকার মোগলসরাইয়ের কোয়ার্টারে বিয়ের আগেকার জীবনের দিনরাত্রিগুলোকে।

—কেন থাকবে না।

—কখনো মিলিয়ে দেখেছ সেসব দিনগুলোর সঙ্গে আজকের দিনগুলোর তফাত কতটা?

—আমাদের বয়সটা কি ঠিক সেইখানে আটকে আছে?

—বিরাম, তুমি সত্যি করে বল তো তিনটে বছরে কতটা বয়স বাড়তে পারে মানুষের। সমস্যাটা বয়সের নয়, মনের। তুমি কি নিজেকেও ভালবাস না?

—কী হচ্ছে, এসব। বাড়িতে আরো লোকজন আছে।

—যারা আছে, তারা আমার শ্বশুর-শাশুড়ী নয়! ভাইবোন। এবং সাবালক।

—শোনো, আমার দরকারী কাজ আছে। কাজটা সেরে নিয়ে কথা বলবো।

—না, এখন আমি আছি, তোমার কিছু কাজ নেই। তোমাকে বসতে হবে এখানে। মণিকাকা হাসতে বলেছে। আজকের রাতটা আমি হাসবো।

সবিতা বিরামের কোলের ওপর মাথা লুটিয়ে দিল। বিরামের অন্যমনস্ক আড়ষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

—শোনো, এদিকে তাকাও। মণিকাকা তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।

—তোমার মণিকাকা সেই রকম আছেন? না, বিয়ে-থা করে ছেলেপুলে হবার পর পাল্টেছেন। ব্যাচারেলি সেই হাসি-খুশি মানুষটি আর নেই নিশ্চয়।

সবিতার গলার স্বরে রুক্ষতা এসে গেল।

—কি করে বুঝলে তুমি? মানুষকে এত চমৎকার করে বোঝো কি করে বল তো? পৃথিবীতে তুমিই সুখী, জানো সত্যি, তুমিই সবচেয়ে সুখী।

বিরামের হাত থেকে আঙুলের ফাঁসটা খুলে নিল সবিতা।

সবিতা আজ তার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে প্রত্যাশা করছিল বিরামের সঙ্গ-সুখ।

বিরামের চোখের সামনে অতীত স্মৃতির আয়নাটাকে এমনভাবে তুলে ধরবে যাতে বিরাম বুঝতে পারে আজ সে কত জীর্ণ, পঙ্গু, স্থবির, প্রাণহীন। কিন্তু আয়নার কাঁচের মতো অসংখ্য টুকরোয় ভেঙে গেল সব সম্ভাবনা। সবিতা অবরুদ্ধ ক্ষোভে ও আক্ষেপে মুখটাকে বিরামের দিক থেকে ঘুরিয়ে আকাশের দিকে তাকাল।

আকাশে অনেক নক্ষত্র ফুটেছে। চোখের জলের মতো। কেবলই মনে হচ্ছে এক্ষুনি কিংবা একটু ধাক্কায় টস্‌টস্‌ করে ঝরে পড়বে মাটিতে।

তার আগেই সবিতা আকস্মিকভাবে উঠে গেল শোবার ঘরে।

চোখের কোণ থেকে আঁচল দিয়ে অশ্রুর চিহ্নটা মুছে নিয়ে সবিতা মিণ্টুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল তার বিছানায়। শোবার আগে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে।

যে অবরুদ্ধ একটা কষ্ট বুকের মধ্যে থেকে ঠেলে উঠতে চাইছে,

তাকে কি ভাবে থামাবে এই চিন্তায় তার কষ্টটা যেন আরো বেড়ে চলল।

ডালিয়া!

কতদিন পরে নিজের পুরনো নামটা নতুন করে শুনল সবিতা।

হায়! আমি নিজেই ভুলে গেছলাম আমার নিজের নাম। বাবা ডাকতেন আদর করে। বাবা আর মণিকাকা। মণিকাকার মুখে ঐ নামটা যেন সত্যিই রঙীন হয়ে ফুটে উঠতো। আমি তখন ডালিয়ার মতোই ছিলাম দেখতে।

বাবা তখন থাকতেন জলপাইগুড়িতে। বাড়ির সামনে ছিল ডালিয়ার বাগান। আমার বয়স তখন সাত কিংবা আট। সেই বয়সের নাম।

বিয়ের আগে পর্যন্ত মনে ছিল; বিয়ের পর কবে থেকে হঠাৎ যেন ভুলে গেছি, ফুলের নামে একটা নাম ছিল আমার।

মণিকাকা ছিল বলেই আমাদের বিয়ে। বাবার অমত ছিল। মণিকাকার কাছে একদিন কেঁদেছিলাম সারারাত। মণিকাকা সারারাত মাথার চুলে হাত বুলিয়ে আমাকে শান্ত করেছিলেন। তাঁর হাজারীবাগের কোয়ার্টারে পুজোর ছুটিতে আমাকে আর বিরামকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মণিকাকা আমাদের মেলা-মেশার অফুরন্ত সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এক একদিন কত রাত্রে ফিরেছি। কাকিমা ঘুমিয়ে পড়তেন। মণিকাকা খোলা দরজার সামনে বসে থাকতেন বইয়ের পাতা খুলে। মণিকাকা লুকিয়ে চশমার আড়াল থেকে দেখে নিতেন আমি খুশী কিনা, সুখী কিনা।

সেই মণিকাকার নাম শুনেও বিরাম এতটুকু কৃতজ্ঞ, এতটুকু উৎসুক হল না।

বিরাম কি তার অতীতের সমস্ত স্মৃতিকে ভুলতে চায়?

আট

একদিন রাত্রে আপিস থেকে ফিরে বিরাম সবিতার পাশে গিয়ে বসল। সবিতা বিস্মিত হল এই দৃশ্যে। গত এক বছরে এরকম ঘটনা তার চোখে পড়ে নি।

সবিতা একটা ইতিহাসের বইয়ে চোখ বোলাচ্ছিল। পড়তে পারছিল না। মাত্র চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে সুজিত উঠে গেছে। সুজিত ক্রমশ বড় হচ্ছে, পরিণত হচ্ছে। আজকাল ওর চোখের দৃষ্টিটাকে মাঝে মাঝে ভীষণ উজ্জ্বল ও শাণিত মনে হয়। আজকাল মাঝে মাঝে ওকে বড় বিষণ্ণ, করুণ মনে হয়। আগের মতো প্রাণখোলা হাসি-ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে পারে না। মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে ও কী যেন বলতে চায়, যার অর্থ সবিতা একেবারেই যে বোঝে না তা নয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে ভয় করে।

কথার ফাঁকে সুজিত আজ প্রশ্ন করেছিল,

—কলকাতার বাইরে তোমার কোন বন্ধু নেই?

—কেন থাকবে না, আছে।

—কোথায়?

—অনেক জায়গায়। তুমি কখনো রানাঘাটে গেছ?

—না।

—গেলে খুব ভাল লাগবে তোমার। ওখানে শেফালীরা থাকে। কলকাতার কত কাছে, কি ভাল জায়গা।

—চল যাই। বেড়িয়ে আসি।

—যাবে?

—সত্যি?

সবিতারও সত্যি খুব ভাল লাগছিল কলকাতা ছেড়ে কোথাও

চলে যাবার কথা ভাবতে। সুজিতের প্রস্তাবটাকে সে তাই গ্রহণ করেছিল খুশী মনে।

সুজিত বললে,—আমার একটা দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন আছে।

—কি বল?

কলকাতা থেকে দূরে কোথাও যাব আমরা। পাহাড়, নদী, অরণ্যের মাঝখানে একটা নির্জন বাড়ি। আকাশে মাত্র দু-একটা নক্ষত্র। তুমি আর আমি সারারাত দুজনে জেগে কথা বলবো। মাত্র একটা রাত। রোদ উঠলে আমরা ঘুমোতে যাব।

সবিতা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার মুখ দেখে বোঝা গেল না সুজিতের প্রস্তাবে কতটা উৎসাহিত। সুজিত অধৈর্য হয়ে উঠেছিল।

—কিছু বলছ না যে?

—কি বলবো।

—যা বললাম, সেই ব্যাপারে।

—তুমি কি আমাকে কষ্ট দিতে ভালবাস?

—তার মানে? আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই? আমি কি তোমাকে কষ্ট দেবার জন্য কথাটা বললাম নাকি?

—তুমি এবার ওঠো। মেসে যাও, গা হাত ধুয়ে খেয়ে নিয়ে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমোও। একদম রাত জাগবে না। শরীরের যা অবস্থা হচ্ছে দিন দিন।

—না আমি আজ উঠবোই না। আগে বলতে হবে কেন তোমার মনে হল যে আমি তোমাকে কষ্ট দেবার জন্যেই কথাটা বলেছি।

—আজ নয় সুজিত, আরো পরে বলবো। হয়তো বলতেও হবে না, তুমি নিজেই বুঝবে।

—না, আমি ওসব শুনতে চাই না। আমাকে আজই বলতে হবে। নইলে এইখানেই শুরু হবে আমরণ সত্যাগ্রহ।

সবিতা হাসল। যদিও সেই হাসির মধ্যেও কোথাও সামান্য একটু

বিষণ্ণতার আভাস ছুঁয়ে ছিল। কিন্তু সবিতা কোন কথা বলল না। সুজিত কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবিতার দিকে তাকিয়ে রইল।

—আমি কিন্তু এখনো উত্তর পাই নি।

সুজিত সবিতার হাত থেকে ইতিহাসের বইটা ছিনিয়ে নিল। একটা পাতার উপরের দিকের কিছুটা অংশ ছিঁড়ে গেল। সবিতা অবাক হয়ে গিয়েছিল সুজিতের এই আকস্মিক আচরণে।

—একি হচ্ছে। বইটা ছিঁড়লে তো।

—ছিঁড়ুক। তুমি উত্তর না দিলে গোটা বইটাই ছিঁড়ে ফেলবো।

—তুমি কিন্তু আগে এ-রকম জেদী গোঁয়ার ছিলে না।

—তুমিও আগে আমার সঙ্গে এ রকম হেঁয়ালী করতে না।

—হেঁয়ালী !

সবিতার কণ্ঠস্বর হঠাৎ খুব দৃঢ় হয়ে উঠল।

—সুজিত···

সবিতা একটু থামল। যেন মনের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠা আবেগকে একটু সংযত করে নেবার সময় নিল।

—আমার সারাজীবনটা এমন বিরাট হেঁয়ালী দিয়ে ঘেরা যে আমি নিজে কখনো কারো সঙ্গে হেঁয়ালী করার সুযোগ পাই নি। তোমার সঙ্গে হেঁয়ালী করছি এটা কেন মনে হল ?

—ঠিক যে কারণে তোমার মনে হয়েছে আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইছি।

—তুমি অনেক বদলে যাচ্ছ, সুজিত।

—তুমিও।

—আমি ?

—হ্যাঁ। সেদিন ময়দানের মিটিং-এ তুমি কে-এক মিতুদির সঙ্গে চলে গেলে কেন ?

—তারপর ?

—তারপর কি? তুমি আজকাল তোমার অনেক কথাই আমার কাছে গোপন করতে চাইছ। আগে সব বলতে।

—আগে তুমিও সব শুনতে। আজকাল নিজের কথাই তুমি বেশী বলতে চাও।

—আগে আমার বলার মতো কথা ছিল না। তোমাকে···

সুজিত থামল। তার জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল 'ভালবাসার পর থেকে'। কথাটা এভাবে বলা বোধ হয় খুব নাটকীয় শোনাবে। সুজিত নতুন শব্দ খুঁজতে লাগল।

—তোমাকে···তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই আমার মনের মধ্যে কথা এসেছে। কথা আর কষ্ট। এর আগে আমি দিনরাত এত কষ্ট পেতাম না।

সুজিতের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠেছিল এইসময়। মুখটাকে যতদূর সম্ভব নত করে কথাগুলো বলেছিল সুজিত। সবিতা ওর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। সুজিতের প্রায় কেঁদে ওঠার মতো কণ্ঠস্বরে সবিতাও যেন ব্যথিত হয়ে উঠেছিল কিছুটা। সুজিতের চিবুকটা ধরে মুখটাকে সামনে তুলে সবিতা এক লহমায় দেখে নিয়েছিল চোখের কোণে জল জমেছে কিনা।

মুখটা উঁচু হয়ে থাকলেও চোখ দুটো প্রায় বন্ধ করা ছিল। চিবুকটা ছেড়ে দিয়ে সবিতা হাত রেখেছিল সুজিতের এক মাথা এলোমেলো ঘন চুলের ওপর।

—চুলগুলো ছাঁট নি কেন? জঙ্গল হয়ে আছে।

সবিতার কণ্ঠস্বরে সুস্নিগ্ধ স্নেহ। নিজেকে সে পাল্টে নিয়েছে।

তখনও সুজিতের বিষণ্ণ বেদনার্ত ভঙ্গী।

সবিতা একটা ঝাঁকুনি দিয়েছিল তাকে আলতো করে। সুজিতের শরীরটা দুলে উঠেছিল। সুজিত অভিমানের চোখ তুলে তাকাতেই সবিতা উজ্জ্বল হেসে বলেছিল,

—কি হয়েছে?

—জানি না।

—হঠাৎ এত অভিমান কিসের?

—জানি না।

—আমি জানি। দেবো সব অভিমান থামিয়ে? দুষ্টু কোথাকার! মানুষ যেভাবে সুগন্ধের ঘ্রাণ নেয়, সুজিত তেমনি করে তার সারা শরীরের শিহরণ দিয়ে ঘ্রাণ নিচ্ছিল সবিতার আঙুলের স্পর্শের, তার কোমল কণ্ঠস্বরের। এই প্রত্যাশিত সুখানুভূতিকে সে কামনা করছিল আরো স্থায়ীভাবে। হয়তো সেই কারণেই নিজেকে সে কিছুটা কৃত্রিমভাবে করুণ করে রেখেছিল।

—চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

সুজিতের তখুনি উঠতে ইচ্ছে ছিল না। চারিদিকে কী রকম শান্ত নির্জনতা। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। তবু সবিতার মুখটা ঢাকা রয়েছে আবছায়ায়। সুজিতের হৃদয় ক্রমশ লোভী ও ক্ষুধার্ত হয়ে উঠছিল। সবিতার হাতের কয়েকটা আঙুল ধরে নিজের দিকে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়েছিল সুজিত। সবিতা সামান্য একটু ঝুঁকে পড়েছিল সুজিতের দিকে। সুজিত হয়তো চেয়েছিল সমস্ত শরীরটা নিয়ে সবিতা তার উপর ভেঙে পড়বে। সুজিতের সমস্ত হৃদয়, করতল, বক্ষপট কেঁপে উঠবে এক সহসা-উদ্বেলিত প্লাবনে।

তা হয় নি। সবিতা সতর্ক ছিল। হয়তো সব মেয়েরাই এই রকম আকস্মিক মুহূর্তের জন্যে সতর্ক থাকে।

সুজিত তখুনি উঠে দাঁড়িয়েছিল।

—কই, তুমি যে বললে আমার সব অভিমান থামিয়ে দেবে?

সবিতা মুখে হেসেছিল। কিন্তু তার মনের মধ্যে যেন একটা অনাগত আতঙ্কের ইশারা দুলে উঠেছিল।

—দিই নি?

—না।

—তাহলে দেবো। আজকেই দেবো বলেছিলুম কি?

—তুমিই জান।

—তুমি জান না?

—জানি না।

—না জানাই ভাল সুজিত। এত দ্রুত সব কিছু জানতে চেয়ো না। সবিতার কণ্ঠস্বর ভারী, বিষণ্ণ। চোখের দৃষ্টিতে অবসন্ন উদাসীনতা। যেন কথাগুলি দিয়ে সে নিজের অন্তরের কোন শূন্য জায়গাকে ভরাট করতে চাইছিল।

সুজিত চলে যাবার পর থেকে সবিতা একই জায়গায় বসেছিল। একটুও ওঠে নি, নড়ে নি।

বিরাম ইতিমধ্যে ধুতি পাল্টে একটা পায়জামা পরেছে।

সবিতা বললে—কি বলছিলে, বলো।

বিরাম একটা সিগারেট ধরাল।

—কাঁদন সম্বন্ধে তুমি কিছু ভেবেছো?

—কি ব্যাপারে?

—সব ব্যাপারেই। ও কি করবে? এইভাবে রাজনীতি করেই জীবনটা কাটাবে নাকি? পড়াশোনা তো করল না। বয়স বাড়ছে। একটা কাজকর্ম তো করা দরকার।

—তা তো দরকার।

—তাহলে?

—আমি কি বলবো। বলি তো মাঝে মাঝে, একটা কিছু কর কাঁদন। এক কান দিয়ে শোনে, আরেক কান দিয়ে বার করে দেয়।

—তা করলে তো চলবে না। এতে যে শুধু ওরই ক্ষতি হবে তা তো নয়। আরো অনেকের ক্ষতির আশঙ্কাও আছে।

অনেকক্ষণ বিরাম ও সবিতা কেউ কোন কথা বলল না। বিরামের সিগারেটের ধোঁয়া সবিতার মুখের উপর দিয়ে ভেঙে ভেঙে ভেসে ভেসে সারা ঘরটাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

সবিতা ভাবছিল হঠাৎ আজকেই বিরামের এই কথাটা এত জরুরী

হয়ে উঠল কেন। বিরাম ভাবছিল তার আসল কথাটা। সে কি ভাবে বলবে, বা আদৌ বলতে পারবে কিনা! খাটের তলার দিকে হাত নামিয়ে সিগারেটের উপর জমে ওঠা ছাইটাকে ঝেড়ে বিরাম আবার প্রস্তুত করল নিজেকে, তার আসল বক্তব্যটাকে ব্যক্ত করার তাগিদে।

—দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ভাল নয়। এই রকম সময়ে চাকরি-বাকরি করা বা করে যাওয়া অর্থাৎ করে যেতে হলে অনেকগুলো ব্যাপার আছে, ভাবতে হয় যা নিয়ে। আমাদের জীবনের সবটাই আমরা একা একা নিজের খুশীমতো গড়তে পারি না। তার অনেক-খানিই সময়, সমাজ, আরও অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল।...

বিরাম একটু থামল। সিগারেট শেষ হয়ে এসেছে। পায়ের তলায় ফেলে পায়ের আঙুল দিয়ে জুতোর একটা পাটি টেনে নিয়ে সেটার ওপর চাপ দিল।

—আমি একটা ব্যাপারে খুব চিন্তিত।

—কি বলতো!

—কাঁদন যদি এইভাবেই চলে তাহলে সেটা আমার পক্ষে ক্ষতিকারক হবে।

সবিতা হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠল।

—কেন?

—কেন বুঝতে পারছো না?

—না।

—ধর, চাকরিতে আমি একটা প্রমোশন পাব। তুমি জান আমি যে কাগজের অফিসে কাজ করি, সে কাগজের মালিকের রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে তোমার আমার রাজনৈতিক চেতনার কোন মিল নেই। সুতরাং...

আবার থামতে হল বিরামকে। বাঁ হাত দিয়ে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে নিল কয়েকবার।

—আমারই বাড়িতে থেকে কাঁদন এইভাবে রাজনীতি করে দিন কাটায়, এখানে ওখানে বক্তৃতা করে, সেটা যে আমার চাকরির ব্যাপারে হেল্পফুল হবে না সেটা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে।

সবিতা বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বিরাম যে এইভাবে কিছু বলবে সবিতা কখনো ভাবে নি। ছাত্রজীবনে বিরামও তো রাজনীতি করেছে। আজ রাজনীতিকে ভয় করতে শিখছে সেই বিরাম? পদোন্নতি, পদমর্যাদার জন্যে? কেন এইভাবে কথাটা বলল? বললে পারত, খরচ বাড়ছে ক্রমশ। সামলানো যাচ্ছে না। কাঁদনকে আর কতদিন আমরা এভাবে পুষবো?

সবিতার মনের মধ্যে একরাশ বিষাদ জমে উঠতে লাগল। একটু পরে এই বিষাদগুলো তার বুকে কান্নার রূপ নেবে। বিরাম অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছে। অর্থ ও প্রতিষ্ঠার চেয়ে মহনীয় তার কাছে আর কিছু নেই। সুজিত ক্রমশ বদলে যাচ্ছে কিংবা যাবে। সুজিত ক্রমশ অভিমানী, ক্রমশ ক্ষুধার্ত, ক্রমশ পুরুষ হয়ে উঠছে। আবার আমার জীবনে নিঃসঙ্গ হবার দিন বুঝি ঘনিয়ে এল। কাঁদনের ওপর রাগ হয়। সত্যি! কি করছে জীবনটাকে নিয়ে? কি ভাবছে ভবিষ্যৎ নিয়ে? এই রকম বেপরোয়া বিশৃঙ্খল জীবন কতদিন কাটাবে?

তবু, কাঁদন আমার ভাই। আমার মা-বাবা হারানো ভাই। বাড়ির ছোট ছেলে। বিবাহিতা যোগ্যা দিদির কাছে তার কি কিছু দাবি নেই। কাঁদন এখনো সাংসারিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। কিন্তু নিশ্চয়ই ওরকম থাকবে না। সব বুঝতে শিখবে, বুঝতে বাধ্য হবে। তখন ও নিশ্চয়ই মানুষ হবার চেষ্টা করবে। এখন এই বয়সে প্রত্যেকেই একটু বেহিসেবী বেপরোয়া, উদ্দাম হয়।

ওটা বয়েসের ধর্ম। আমার কাছে খাওয়া-পরার নির্ভরতা পেয়েছে বলেই ও জীবনটাকে উদ্দেশ্যহীন করে তোলে নি। আমি ওকে কতটুকু ভালবাসি? কি দিয়েছি, কি করেছি ওর জন্যে? শুধু ছুবেলার খাওয়া আর ছু-একটা জামা কাপড় এই তো!

—তুমি কিছু বলছ না যে।

বিরামের কথায় সবিতার আত্মমগ্নতা ভাঙল।

—আমি কাঁদনকে বলবো।

—কি বলবে।

—এখান থেকে চলে যেতে।

—আমি তো সে কথা বলি নি।

—তোমার আপত্তি রাজনীতি করায়, এই তো? তুমি ওকে রাজনীতি করা ছাড়তে বলতে চাও?

—হ্যাঁ।

—তুমি আমি কেউই তাকে সে কথা বলতে পারি না।

—কেন?

—পারি না। কেন পারি না তুমি নিজেই ভেবে দেখো।

—আমি ভেবেছি।

—কি ভেবেছো?

—ব্যক্তিগত জীবনে দায়িত্বহীন, অলস, অক্ষম একদল লোক শুধু কবিতা লিখে, গান গেয়ে আর গলা ফাটিয়ে দেশের সমাজব্যবস্থাকে পাল্টাতে পারে না। কাঁদনরা যে রাজনীতি করছে, তা বন্ধ করে দিলে ভারতবর্ষের কোন ক্ষতি হবে না।

—তাহলে দেশটাকে বদলাবে কারা? কয়েকজন দায়িত্ববান সাংবাদিক শুধু?

—আমাকে ঠাট্টা করে বিশেষ কোন লাভ হবে না।

—আমি তোমাকে আদৌ ঠাট্টা করছি না। নিজের অতীতটাকে নিয়ে ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, তুমিই ঠাট্টা করছো তোমার নিজের সঙ্গে।

সবিতার কণ্ঠস্বরে কান্নার মতো থরথরে একটা আবেগ। কথা বলার সময় তার গলার কাছে একটা নীল শিরা ফুলে উঠল।

সবিতা বুঝতে পারল তার মধ্যে একটা রুদ্ধ আক্রোশ যেন ফুঁসে উঠতে চাইছে।

—পৃথিবীতে সব কিছুরই মূল্য আছে। আবর্জনা থেকেও সার তৈরি হয়। কাঁদনের রাজনীতির যদি কোন মূল্য না থাকে, তাহলে তোমার আমার এই জীবন যাপনেরই বা কী মূল্য, কতটুকু মহত্ত্ব, কি এমন চরম সার্থকতা ? তুমি আমি মরে গেলে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হবে ?
এতক্ষণ পরে বিরাম হাসল, মৃদু, যেন মাপা।
—এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, স্টেজ নয়। একটু আস্তে, একটু কম উত্তেজিত হয়ে কথা বল।
বিরাম কথাগুলো বলল আস্তে এবং আদৌ কোন উত্তেজনা প্রকাশ না করে।
—আমি ভদ্র হতে চাই না। ভদ্রতা আমাদের কাছে একটা মুখোস। যাতে লোকে বুঝতে না পারে আমরা কতটা শূন্য।
—আমি জানতাম।
—কি জানতে।
—আজ বাড়িতে একটা নাটক হবে। কোনও একটা বিষয় পেলে তাকে কি তুমি নাটকীয় না করে তৃপ্তি পাও না ? আশ্চর্য ! স্ট্রেঞ্জ !
বিরাম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
সবিতার মনে হল তার কথা এখনো ফুরোয় নি। অনেক অজস্র অফুরন্ত কথা, উত্তেজনা, ব্যথা, আক্রোশ, ক্রোধ ঢেউএর মতো তার বুকের মধ্যে উঠছে, নামছে, দুলছে, উথলে উঠছে। তার এমন কিছু কথা আছে, যা একটা প্রচণ্ড চীৎকার ছাড়া বলা যাবে না। তার এক একবার মনে হয়, সে-চীৎকারে এই বাড়িটা ফেটে যাবে। সমস্ত কলকাতা হঠাৎ বোবা হয়ে যাবে সেই শব্দে। কলকাতার সমস্ত মানুষ হঠাৎ একটা স্তম্ভিত আঘাতে উপলব্ধি করবে—জীবন কি, জীবন কোথায়, জীবন কেন ? কিন্তু সেই কথাগুলো যে কি তা সবিতা জানে না। সেগুলো বুকের মধ্যেই যেন কোথায় আছে। মাঝে মাঝে যেন তারা ঠেলে উঠতে চায় বুকের তলদেশ থেকে। হারিয়ে যায় আবার।

আজ এই মুহূর্তে সবিতার মনে হল সে যেন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তার সেই কথাগুলো বলতে পারলে খুশী হত, নিজেকে হালকা মনে হত।

কিন্তু তা পারল না বলেই, যেন সেই না-বলা কথার ভারে সে বালিশে মুখ গুঁজে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। বিছানার পাশ দিয়ে মেঝের দিকে ঝুলে পড়ল তার খোঁপা ভাঙা চুল।

ঘটনাটা যে এত দ্রুত ঘটবে তা সবিতা ভাবে নি। ভেবেছিল দু-চারদিন সময় নিয়ে কাঁদনকে সব কথা বুঝিয়ে বলবে। তার আগেই বিশ্রীভাবে ঘটনাটা ঘটে গেল।

কাঁদন একদিন সন্ধ্যেয় বাড়ি ফিরল অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পেয়ে সবিতা ভেবেছিল সুজিত। সুজিত সাধারণত সন্ধ্যের পর এই সময়েই আসে। কদিন আসছে না। আবার অভিমান করেছে। চারদিক থেকে আবার সব এলোমেলো হতে শুরু করেছে সবিতার জীবনে।

সুজিত নয়, ঘরে ঢুকল কাঁদন।

বাড়িতে এসেই কাঁদন তার একটা ছোট্ট সুটকেশে বই কাগজপত্র তোয়ালে জামা ইত্যাদি গোছাতে বসে গেল।

সবিতা তার শোবার ঘরে ছিল। কাঁদনের গলার সাড়া পেয়েছে। কিন্তু কাঁদনকে চোখে দেখতে পায় নি। কাঁদনের মুখের মধ্যে কি রকম যেন একটা দৃঢ়তা, নাকি কাঠিন্য কিংবা ব্যক্তিত্ব আছে, যাকে সময় সময় সবিতার ভয় করে। সবিতা শোবার ঘরে বসে নিজেকে তৈরী করছিল কাঁদনের সঙ্গে আজ খুব অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলার জন্যে।

হঠাৎ কাঁদন সবিতার শোয়ার ঘরে ঢুকল। সবিতাকে কিছু না-বলেই তার ঘরের নানা জিনিসপত্র নেড়ে-চেড়ে কি যেন খুঁজতে লাগল।

—কি খুঁজছিস রে কাঁদন ?
—আমার সেফ্‌টি রেজারের বাক্সটা।
—এখন সেফ্‌টি রেজারের বাক্স নিয়ে কি করবি ?
দরকার আছে।
—কোথাও যাবি ?
—হ্যাঁ।
—কোথায় ?
—মেদনীপুরে।
—মেদনীপুর ? কেন ?
—খাজুরীর বাই-ইলেকশানে কাজ করতে।
—কই আগে তো বলিস নি।
—এর আর আগে বলার কি আছে। হঠাৎ ঠিক হল রাত্রের ট্রেনে সবাই যাবে।
—কিন্তু তুই যে যাবি সেটা তো আগেই ঠিক করেছিলি। আমাকে বলিস নি কেন ?
—এতে বলার কি আছে ? আমি রাশিয়া কি চীনে তো যাচ্ছি না।
—তাহলেও বলতে হয় কাঁদন। মেস বাড়িতে থাকলেও একবেলা না খেলে সেটা আগে জানিয়ে দিতে হয়। তোরা আমাকে এ-ভাবে অপমান করিস কেন ? আমি কি তোদের কেউ নই ?
অবশেষে খাটের তলা থেকে বাক্সটা খুঁজে পেয়ে কাঁদন সবিতার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সবিতাও সোজা হয়ে বসল। অনুভব করল তার ভিতরে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে একটা অপ্রতিরোধ্য উত্তেজনা। আবার সেই সমস্ত পৃথিবীর সামনে চীৎকার করে বলার মতো কথাগুলো বুকের মধ্যে উঠছে দবদবিয়ে। সবিতাও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। কাঁদন তখন সুটকেশ গোছাচ্ছে। চিত্রা পড়তে পড়তে কাঁদনের ওঠা বসা সব কিছু লক্ষ্য করছিল। সবিতাকে দেখে সে চোখ ঘুরিয়ে নিলে।

সবিতা সোজা এসে কাঁদনের সামনে বসল। কাঁদন তখন তার কিছু লেখার খাতা নাড়া-চাড়া করছিল। খাজুরীতে গিয়ে গ্রামের রাজনৈতিক জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হবার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা সে লিখে রাখতে ইচ্ছুক।

—তুই কি সারাজীবন এইভাবে কাটাবি ঠিক করেছিস?

—কি ভাবে?

—যে ভাবে কাটাচ্ছিস। উদ্দেশ্যহীন, পারপাস্‌লেস।

—পারপাস্‌লেস কেন? তুমিও তো ছাত্রজীবনে রাজনীতি করতে, তোমার লাইফটা কি পারপাস্‌লেস?

—আমার জীবনের কথা বাদ দে। রাজনীতির সঙ্গে আমরা লেখাপড়াটাও করেছিলাম। সেটা আর কোন কাজে নাই লাগুক, তাতে নিজের জীবনের দায়িত্বটা অন্তত নিজে বইতে পারবো, এই ভরসাটুকু ছিল।

—শুধু নিজেকে নিয়ে বেঁচে থাকাটাই যদি বড় কথা হয়, তার জন্যে অত বেশী লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন আছে বলে আমি তো মনে করি না। তুমি যা শিখেছ, তার চেয়ে কম শিখলেও এই রকম বাঁচতে।

সবিতার চোখ দুটো ঝলসে উঠল।

—কি রকম?

—যে রকম আছো। আর দশটা মধ্যবিত্ত মানুষের মতো, দুঃখ-বিলাস নিয়ে।

—কাঁদন, তুই আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলবি না।

—তোমরা শুধু অন্যেরই সমালোচনা করতে পার। তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিয়ে দিলে সহ্য করতে পার না।

—নিজেকে তুই খুব বেশী বুদ্ধিমান ভাবছিস বুঝি আজকাল! সত্যিই যদি বুদ্ধিমান হতিস, তাহলে যে-দিদি তোকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছে, তার জীবনের সবকিছু জেনেও আজ তাকে এ-ভাবে ছোট করতে তোর বাধতো।

—সমালোচনা করা মানেই ছোট করা নয়।
—থাক্ কাঁদন, থাক্। তোদের কাছ থেকে এর বেশী পাওনা আমি চাইও না।
সবিতা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। কেঁদে ওঠার মতো একটা প্রবণতা তাকে অস্থির করে তুলছিল ভিতরে। হাতের চুড়িগুলোকে বার বার টেনে টেনে খুলছিল, পরছিল। এই সময় সবিতার চোখে পড়ল একটা জামা কাঁদনের স্যুটকেশের পাশে। দেখে বোঝা যায় জামাটা নতুন। সবিতা অনেকক্ষণ জামাটার দিকে তাকিয়ে থেকে বার বার কিছু বলবে না ভেবেও নিজেকে দমন করতে পারল না।
—ঐ জামাটা কার?
—আমার?
—কোথায় পেলি?
—তৈরি করালাম।
—টাকা পেলি কোথায়?
—একজনের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে করিয়েছি।
—ধার করেছিস?
—না। আমার কবিতার একজন পাঠিকা। আমরা একসঙ্গে পার্টি করি। তাকে চাইতে টাকাটা দিয়েছে।
—তাকে চাইতে হল কেন? আমি তো তোকে বলেছিলাম, সামনের মাসের গোড়ায় তোকে একটা জামা তৈরি করে দেব।
—বল নি।
—বলি নি?
সবিতার মনে হল, বোধ হয় সত্যিই কথাটা কখনো কাঁদনকে বলে নি। মনে মনেই ভেবেছিল। মনে মনে সে যে একদিন কাঁদনের জামার অভাবের কথাটা ভেবেছিল এবং কাঁদন তা জানে না, এবং কাঁদন বুঝতে পারে নি যে দিদি নিজের মনে তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবে, এই অনুভব যেন সবিতাকে আরও বেশী আহত করে তুলল।

—আমাকে টাকা চাইলি না কেন ? আমি কি তোর পার্টির মেয়ের চেয়ে দূরের লোক ? কাঁদন, তুই অনেক বড় হয়েছিস। অনেক জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে তোর। তোর যদি সত্যিই মনে হয় আমি তোর পর, তুই এখানে আর থাকিস না। আমাকে কষ্ট দেবার লোকের অভাব নেই। তুই না থাকলেও আমি তা অনেক পাব। এই যে যাচ্ছিস, আর কোনদিনও তুই আমার সামনে এসে দাঁড়াবি না।
সবিতার ভারী গলা এবার সত্যিই কান্নায় ভেঙে পড়ল। কাঁদন হাসল।
—আমি জানতাম।
—কি জানতিস ?
অসম্ভব জোরে কথাটা বলতে গিয়ে সবিতার কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে উঠল।
—কি জানতিস, বল ! জানতিস যে আমি তোকে একদিন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দোব, এই তো। চমৎকার, চমৎকার। আমি ধন্য।
কান্নাসুদ্ধ চোখ নিয়ে ঘরের মেঝেয় কয়েক ফোঁটা জল ফেলতে ফেলতে সবিতা দ্রুত গতিতে উঠে এল বারান্দায়। বারান্দার বাইরে নিজের সমস্ত শরীরটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করল তার।
আর ক্রমাগত মনে হতে লাগল, এই সমস্ত ঘটনার জন্যে দায়ী সুজিত, সুজিত যদি আসতো, ঘটনাটা এভাবে ঘটতো না। সুজিতও নিষ্ঠুর হতে পারছে। সুজিতও আমার বেদনার সঙ্গী নয় আজ।

নয়

এক, দুই, তিন, আজ চারদিন।

সকাল থেকেই মনের আবহাওয়া মেপে সুজিত বুঝল, আজ আর তার পক্ষে নিজেকে সংহত করা কঠিন। আমি হেরে যাবো। তা হোক। তবু আজ একবার সবিতাদির মুখ আমাকে দেখতেই হবে।

সবিতাদি ভাবছে, আমি তার কাছে না গিয়ে খুব সুখে আছি। কোন কষ্ট পাই নি, দুঃখ পাই নি। মনের খুশীতে খেয়ে-ঘুমিয়ে দিন কাটিয়েছি।

যখন বলবো, যে একটা রাত্রিও ভাল করে ঘুমোতে পারি নি, বিশ্বাস করবে? বিশ্বাস করবে কি যদি বলি তিনদিনের তিনটে রাত্রিই জেগে জেগে প্রায় তিরিশ পাতা চিঠি লিখেছি? প্রথমে বিশ্বাস করবে না ঠিকই। প্রথমে গিয়েই চিঠিগুলো হাতে দেবো না। চলে আসার সময় দেবো। বলবো, আমি চলে গেলে পড়বে।

দিনের আলোয় চিঠিগুলো পড়লে আমারই লজ্জা করে। রাতের অন্ধকারে মানুষের মন বদলে যায়। এই সব চিঠির অনেক অক্ষরই দিবালোকে আমার কলম থেকে বেরোতে সংকোচ বোধ করবে। কিন্তু রাত্রে মনে হত, আরো তীব্রতর ভাষা আরও গভীরতর অনুভূতি চাই। তবে মনের সঠিক ভাবনাগুলো আমি প্রকাশ করতে পারবো।

রাত্রে দূরের মানুষগুলো কত কাছে আসে। রাত্রে তাদের কত আপন করে ভাবা যায়। পাওয়া যায়। তিনদিন সবিতাদির সঙ্গে দেখা হয় নি, অথচ তিনদিন রাত্রেই মনে হয়েছে, যখন চিঠিগুলো লিখতাম, সবিতাদি আমার পাশেই রয়েছে, তার নিঃশ্বাস

লাগছে আমার গায়ে। আমি ইচ্ছে করলেই হয়তো বাড়িয়ে তাকে ছুঁতে পারি। সবিতাদি এসব বিশ্বাস করবে না। আমি দিনের প্রত্যেকটা ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড তার সঙ্গে কথা বলেছি, তর্ক করেছি, তর্কে হেরেছি, জিতেছি, হেসেছি, মিশেছি। সব কথা দিয়ে।

কথা, কেবল কথা। সবিতাদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেবল কথার। সবিতাদি বলবে, আমি শুনবো।

সমস্তক্ষণ কথা বলার পরে কি পাই? কি নিয়ে ফিরি? কিছু যদি পাই তাহলে আমার রক্তের মধ্যে এত আলোড়ন কিসের? কিসের বিদ্রোহ? কিসের বিস্ফোরণ দেহের অণুপরমাণুতে?

দেহের ভিতরে একটা ক্ষুধার্ত লোমশ জন্তু যেন চারপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে কেবলই হেঁটে চলে। তার চাপে, তার চাপা আক্রোশের আর্তনাদে, তার বর্বর বিক্ষোভে আমি যেন মাঝে মাঝে হাতে-পায়ে শিকল-আঁটা বন্দীশালার কয়েদীর মতো নির্জীব। অথচ ভয়াবহ কোন হত্যাকাণ্ডের কিংবা রক্তপাতের দৃশ্যের অপেক্ষায় উন্মুখ অস্থির আলোড়িত প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে, আমার গায়ে পিঠে মেরুদণ্ডে, অঙ্গে অঙ্গে চাবুকের মতো ঘা মেরে মেরে কেবলই জাগিয়ে রাখে, উত্তেজিত করে রাখে।

কথা, কেবল কথা, সবিতাদি আমাকে কথা ছাড়া আর কিছু কি দেবে না?

তিনরাত্রি জেগে লেখা তিনখানা প্রায় তিরিশ পাতার চিঠি পাঞ্জাবির পকেটে ভরে নিয়ে সুজিত সবিতার বাড়ি রওনা হল।

আজ সে অনেক বেশী স্পষ্ট হতে চায় সবিতার কাছে।

—সুজিত। সু-উ-উ জিত। সু-উ-উ-উ-উ জি ই ই-ত।

সুজিত থমকে দাঁড়াল পথের মাঝখানে। কে যেন তাকে ডাকছে। চেনা স্বর কিনা বোঝা যাচ্ছে না, এত দূরের ডাক। শুধু বোঝা যায় কণ্ঠস্বরের অন্তরঙ্গ আবেগ। সুজিতকে তার জরুরী প্রয়োজন, এই রকম একটা আন্তরিক আর্তি আছে ডাকটার মধ্যে।

সুজিত যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল, খেয়াল করে নি সামনেই একটা মাংসের দোকান। কাঁচের কেসের মধ্যে একটা ছাগলের রক্তাক্ত মাথা। অনেকক্ষণ আগে ছাগলটাকে কাটা হয়েছে। হয়তো দুপুরে। সেটা বোঝা যায় ওপর থেকে ঝোলানো তার দেহের অবশিষ্ট ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের দিকে তাকালে। কিন্তু এখনো সেই কাটা মাথায় যে চোখ দুটো লেগে আছে, যেন জীবন্ত, যেন ঘাতকের শান-দেওয়া অস্ত্রটার মতোই শানানো, ঝকঝকে। কেবল স্থির। আর দৃষ্টিটা কেমন যেন অসহায়, বিষণ্ণ, করুণ, যেন এই চলমান চঞ্চল শহরটাকে দেখে মৃত্যুর পরেও তার জীবিতকালের কিছু স্মৃতিচিত্র মনে পড়ছে। জীবন সকলের কাছেই প্রিয়। এখানে ছাগল বা মানুষে ভেদাভেদ নেই। তারতম্য কেবল মাত্রায়, বোধে, এবং বোধ হয় তার প্রকাশভঙ্গীতে।

কাঁচা রক্তের কেমন একটা ভারী দম-আটকানো গন্ধ আছে। সুজিত রক্তকে ভয় পায়। দোকানটার কাছ থেকে সে সরে দাঁড়াল।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। কলকাতা শহরে ঠিক এই সময়টাতে বাড়ি ঘর দোকান সর্বত্রই রেডিও বাজতে শুরু করে জোরে। মাংসের দোকানের কাছ থেকে সুজিত যেখানে সরে দাঁড়াল ফুটপাতের ওপরে ; তার সামনে একটা সেলুন। রেডিওতে হিন্দী গান বাজছে। আর বৈদ্যুতিক গণ্ডগোলের ফলেই রেডিও থেকে গানের সঙ্গে একই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে ইলেকট্রিক ফ্যানের ঘ্যাটাং ঘ্যাটাং ঘ্যাটং ঘ্যাটাং একটানা একটা আওয়াজ। মাঝে মাঝে খুব পাকা হাতের তবলা সঙ্গত বলে ভুল হয়।

এতক্ষণে সুজিত দেখতে পেল উল্টোদিকের ফুটপাত দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে একটি যুবককে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এগিয়ে আসতে। এবং তাকে চিনতেও পারল সুজিত।

অসীম।

অসীমকে চিনতে পারা মাত্রই সুজিতের মনের মধ্যে কতকগুলো চিন্তা ও সিদ্ধান্ত দ্রুত গতিতে বয়ে গেল। অসীম যাই বলুক, ওর সঙ্গে আর বিশেষ অন্তরঙ্গতা দেখানো হবে না।

অসীম সুজিতের সামনে এসে হাঁফাতে লাগল।

—আমি ডাকছিলাম তোকে।

—কি ব্যাপার।

অসীমকে বড্ড রোগা লাগছে। শুধু রুগ্ন নয়, কেমন যেন বিবর্ণ, জৌলুসহীন। মুখটা চোপসানো। চোখ দুটোও যেন ঠিক কয়েক মুহূর্ত আগে দেখা কাটা ছাগলটার মতো। অসহায়, বিষণ্ণ, করুণ। কিছুক্ষণ চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল অসীম, পায়ের ময়লা স্যাণ্ডেলের দিকে তাকিয়ে।

—তুই কদিন আগে আমাদের হস্টেলে গিয়েছিলি, না?

—হ্যাঁ।

—বিজন বলেছিল। সেদিন দেখা হলে খুব ভাল হত।

অসীম আবার স্তব্ধ হয়ে গেল। অসীমের এলোমেলো কথা, ভাব ভঙ্গীতে কেমন একটা চাপা অস্থিরতা লক্ষ্য করল সুজিত।

—কেন ডাকলি?

—একটা মস্ত ব্লাণ্ডার করে বসেছি।

অসীমের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

—কি?

—লতিকার সঙ্গে একটা লাভ-এ্যাফেয়ার চলছিল আমার, বোধ হয় শুনেছিস।

—না। কেউ বলে নি। তুইও বলিস নি।

—গোড়ার দিকে ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস ছিল না। এমনি একটা আলগা আলগা সম্পর্ক ছিল।

এখন কি হয়েছে?

—আমাকে এমনভাবে ঘিরে ধরেছে, বেরোতে পারছি না। বিয়ে করতে চাইছে এখুনি।

—করে ফেল্।

—আমি, আমার, আমার আর, কি করে বিয়ে করবো, আর তা ছাড়া, আমি, আমার আর ওকে ভাল লাগছে না। বিয়ে করে কোথায় রাখবো? বাড়িতে জায়গা নেই বলে ছোড়দাই বিয়ে করতে পারছে না, তা ছাড়া লতিকাকে বিয়ে করে আমি সুখী হব না, অথচ বিয়ে না করলে ও বলেছে সুইসাইড করবে···

কিন্তু অসীমের কথা শুনতে শুনতে মাংসের দোকানের কাঁচা রক্তের গন্ধটা যেন নাকে ভেসে এল সুজিতের। নিজের অজ্ঞাতসারেই তার হাতটা পকেটে ঢুকে গিয়ে রুমালটা তুলে নিয়ে এল নাকের কাছে। সুজিত মুখটা মুছে নিল।

দুজনেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল। অসীম বললে,

—কিছু বল্।

—আমি কি বলবো। আমার এসব শুনতে ভাল লাগছে না।

—আমি কি কোথাও চলে যাব, কলকাতা ছেড়ে? বিয়ে করা আমার পক্ষে, অন্তত দুতিন বছরের মধ্যে, একেবারেই তো সম্ভব নয়। একটা ভাল চাকরি না পেয়ে কি করে করবো? বাড়িতে এতকাল আমরা সব বড় বড় আদর্শের কথা বলেছি, বাবা-মায়ের জীবনের ব্যর্থ দাম্পত্যজীবনকে সমালোচনা করেছি, এখন কোন মুখে···আসলে লতিকাদের বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ, আমি গুণে দেখেছি ওর মোটে তিনটে ব্লাউজ, সংসার থেকে এস্‌কেপ করতে চাইছে···কিন্তু ওর মধ্যে কোন চার্ম নেই, পোইট্রি নেই, চিরজীবনের জন্যে ওকে ভাবা যায় না।

—প্রেম করার আগে এসব ভাবলে পারতিস।

—আমি প্রেম করতে চাই নি। হঠাৎ লতিকা আমাকে কি রকম যেন লোভী করে তুলল।

—তাই আবার হয় নাকি ?

—তুই বড্ড মাতব্বরী ঢঙে কথা বলছিস সুজিত।

—আমি যা বলছি ঠিকই বলছি। পেটে খিদে না থাকলে কেউ কাউকে লোভী করে তুলতে পারে না।

—ন্যাকামী করিস না। তুইও তো প্রেম করছিস। বুঝে করছিস ?

—তার মানে ?

—মানে আবার কি ? রক্ত-মাংসের প্রতি লোভ ছাড়া আর কি দ্বিতীয় কারণ থাকতে পারে, তোর ডাবল বয়সের একটা মহিলার পিছনে দিনরাত ঘুর ঘুর করার। লতিকা তো তবু আমাকে ভালবেসেছে। দেহ দিয়েছে। তুই তো কিছুই পাস নি। তুই নিজে আমাকে বলেছিস তোদের সম্পর্ক স্নেহ আর বন্ধুত্বের। চিন্তা-ভাবনায় একটু এ্যাডাল্ট হ'।

—তুই আমার সঙ্গে আর একটু ভদ্রভাবে কথা বল অসীম।

—তুইও অন্যের সমস্যাকে আর একটা রেসপেক্ট দিয়ে, সিম্প্যাথী দিয়ে কথা বলতে শেখ্। আমাদের সব ঘটনার জন্যে শুধু আমরাই দায়ী নই। আমাদের সমাজ, সময়, আমাদের দেশের অবস্থা, অর্থনীতি এগুলোও বড় কারণ।

—তোর কথা শেষ হয়েছে ? আমার একটু তাড়া আছে। এক জায়গায় যাব।

—কোথায় ? তোর সেই সবিতাদির বাড়িতে ?

—ধর তাইই।

অসীম অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলল,

—য্যা। থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর কাইণ্ড এ্যাডভাইস।

সুজিত চলে যেতেই চাইছিল তখুনি। কিন্তু অপমানে, গ্লানিতে তার পা দুটো যেন কলকাতার পাথুরে ফুটপাথে আঠা দিয়ে আঁটা। সুজিতের মনে হল অসীমকে তার কঠোর কিছু বলার আছে। সুজিত যেন মনের মধ্যে সেই রকম একটা জোর খুঁজছিল। পথ-

চারীরা ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আসা-যাওয়া করছিল। সুজিত কোন কথা না বলে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই অসীম বললে,

—একটা অনুরোধ শুধু, দয়া করে আমি যা বললাম সেটা সিক্রেট রাখবে, হাটে-বাজারে ছড়িয়ে দিও না। চলি—

অসীম চলে গেল। এসেছিল বিষণ্ণ, অসহায়, করুণ মরা মরা ম্রিয়মাণ দুটো চোখ নিয়ে। যাবার আগে, সুজিত দেখতে পেল অসীমের চোখে ছোরার মতো ঝলসানো ধার।

পাঞ্জাবির পকেটে তিনখানা তিরিশ পাতার চিঠি যেন কাঁটার মতো খোঁচা মারতে লাগল সুজিতকে চলার সময়।

ছিঁড়ে ফেলবো? হ্যাঁ, ছিঁড়েই ফেলবো। তুচ্ছ মিথ্যে। বানানো। মূল্যহীন কিছু ছেলেমানুষী আবেগ ছাড়া সত্যি আর কি আছে চিঠিগুলোতে। প্রেম ব্যাপারটাই তুচ্ছ। মিথ্যে। বানানো। মূল্যহীন। লজ্জাবতী লতা যেমন হাত ছোঁয়ালেই কুঁচকে যায়, প্রেমও তেমনি। সমাজের ছোঁয়া সইতে পারে না। অসীমরাই তো সমাজ। একদিন সরল মনে তার কাছে অকপটে সব বলেছিলাম। আজ সেই অসীম, নিজের মনের জ্বালা জুড়োবার জন্যে, আমাকে, আমার প্রেমকে একমুহূর্তে নিছক মনোবিকার, কিংবা রক্ত মাংসের লোভ বা ক্ষুধা বলে বাতিল করে দিয়ে গেল।

সুজিত পকেট থেকে চিঠি তিনটে বার করল। তাকিয়ে দেখল।

ছিঁড়বো সত্যিই? যখন লিখেছিলাম, রাত্রির সেই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার অন্ধকারে মনে হয়েছিল চিঠির প্রত্যেকটা অক্ষরের পিছনে রয়েছে আমার দেহের প্রত্যেকটি আলোড়িত রক্তবিন্দুর হাহাকার, ক্ষুধার্ত চীৎকার, করুণ প্রার্থনা। কিন্তু দিবালোকে, শহরের জনবহুল রাজপথে সেই চিঠিকেই মনে হচ্ছে যেন পাপ, অন্যায়, অমার্জনীয় অপরাধের মতো একটা কিছু। মাঝে মাঝে ঝাপসা ভোরে কাউকে যেমন সাদা কাপড় চাপা দিয়ে মৃত শিশুকে

বয়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়, এই দৃশ্যটাও যেন তেমনি। তাহলে ছিঁড়েই ফেলা যাক্।

তিনটে চিঠিকে আলাদা আলাদা করে ছিঁড়ে সুজিত হাতের মুঠোয় ভরে নিল। একসঙ্গে এক জায়গায় ফেলল না। লোকে ভাবতে পারে অপরাধমূলক কোন কাগজ ছিঁড়ছে সে। কৌতূহলী হয়ে দেখতে পারে। একটা দুটো টুকরো এখানে ওখানে ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলল। সন্ধ্যেটা বেশ ঘনিয়ে এসেছে শহরে। সেই জন্যেই শহরের ফুটপাথে সাদা কাগজের টুকরোগুলোকে বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। না তাকালেও লোকের চোখে পড়বে এমন শুভ্র, শ্বেত। ভুল বশত বেল ফুল মনে করে কুড়িয়েও নিতে পারে কেউ। মানুষ তো সব সময়েই এ-রকম ভুল করে। ছেলেবেলায় যেমন খেজুর গাছের ঝোপকে অন্ধকারে মনে হয়েছে ভূত। আর একটু বড় বয়সে রঙীন কাঁচের টুকরো দেখলেই হাত ছুটে যেত হীরে জহরৎ ভেবে কুড়িয়ে নিতে।

এসব ভাবতে ভাবতে সুজিত বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই চলছিল। হাতের ভরা মুঠোটা প্রায় অর্ধেক খালি হয়ে এসেছে। হঠাৎ তার সমস্ত শরীরটা কেমন যেন অবশ মনে হল। ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সুজিত থমকে দাঁড়াল।

কিছুদিন আগে খবরের কাগজের পাতায় একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর পড়েছিল সে। হত্যাকারী মৃতদেহটাকে কুঁচিয়ে কুঁচিয়ে অসংখ্য টুকরো করে সারা শহরের নানা জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছিল। এই চিঠি ছেঁড়াও কি সেই রকম কোন হত্যাকাণ্ড?

তা কি করে হয়। চিঠি তো মানুষ নয়। চিঠির প্রাণ নেই, রক্ত নেই। চিঠি কথা বলতে পারে না। তার কোন স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা নেই। চিঠির চোখ নেই, কান্না নেই, তাহলে এত ভাবনা কিসের? সুজিত ক্রমাগত মনের ভিতরে নিজের ভয়কে কেবল সান্ত্বনা

যোগাতে লাগল—না, আমি হত্যাকারী নই, আমি হত্যাকারী নই, আমি হত্যাকারী নই···

সুজিত যখন সবিতাদের বাড়িতে এসে পৌঁছল, তখনও তার মুখের সবটা ঘাম জুড়োয় নি।

প্রায় তিন-চার মিনিট কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে নি। সবিতা একটা চেয়ারে মাথা নীচু করে বসে মাথার এক একটা দীর্ঘ সরু চুল ধরে টানছিল। খুব আত্মগত বিষাদের মুহূর্তে মাথার চুল টানা সবিতার একটা অভ্যেস। এক সময় সবিতা উঠে গিয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিলে। সুজিত একবার ভেবেছিল বারণ করবে। কিন্তু তার মনের মধ্যে এমন কতকগুলো ভারী চিন্তার প্রবাহ বয়ে চলেছিল যে, গলায় কোন আওয়াজ উঠে এল না।

—রাগ পড়ল ?

উদাসীন কণ্ঠস্বরে কথা বলল সবিতাই প্রথম।

—রাগ ? কে রাগ করেছিল ?

—রাগ কর নি ? তাহলে আস নি কেন ?

—আসি নি, এমনি। ভাল লাগছিল না। তোমার এখানে আসাটা নয়। আমার নিজের অনেক ব্যাপার, ভাল লাগছিল না।

—কাঁদনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

—না তো।

—কাঁদন এখান থেকে চলে গেছে।

—সেকি ? কবে ?

—পরশু।

—একেবারে ? আশ্চর্য ! ঝগড়া-ঝাটি করে ?

—আশ্চর্যের কি আছে। চিরকাল সবাইকে এক জায়গাতেই থাকতে হবে। এমন তো কথা নেই।

—তা নেই, তবু···

—আমিও চলে যাব।

—তার মানে ?

—কলকাতা থেকে চলে যাব, যেখানে চাকরি পাব সেখানে।

—এসব তো আমার ওপর রাগ করে বলা হচ্ছে।

—কি করে বুঝলে যে তুমি ছাড়া রাগ করবার আর কেউ নেই আমার ?

—তা হয়তো থাকতে পারে। তবে কলকাতা থেকে চলে যাবে যে বলছ, ওটা আমার ওপর রাগ করেই।

সুজিত ধীরে ধীরে হালকা হতে লাগল। সবিতার মুখের গড়নটা এমন, রাগ করলে বা গম্ভীর হলে দেখতে ভাল লাগে না। ভীষণ বয়স্কা মনে হয়। সবিতার মাথায় চুলের এক পাশে এমন আলো পড়েছে মনে হচ্ছে যেন এক থোকা পাকা চুল। অথচ সবিতা যখন হাসে, যখন ঠাট্টা ইয়ার্কি করে, বয়সটা কমে যায় অর্ধেক। সুজিত নিজেকে হালকা করে নিয়ে সবিতাকে সহজ করে তোলার চেষ্টা করতে লাগল।

—আমি কিন্তু রোজই এখানে এসেছি।

সবিতা ম্রিয়মাণ চোখে সুজিতের দিকে তাকাল।

বিশ্বাস করবে না জানি। কিন্তু ফ্যাক্ট, দশ মিনিট আগেও আমার হাতে প্রমাণ ছিল। এখন আর নেই।

এই সময় বিশুর মা মিন্টুকে কোলে নিয়ে বাইরে থেকে ঘরে ফিরল। সবিতা বললে—বিশুর মা, উনোন ধরিয়ে দু-কাপ চা করে দাও।

সবিতা মিন্টুকে নিজের কাছে ডেকে নিল। মিন্টুকে বুকের কাছে বসিয়ে সবিতা আবার স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। রান্নাঘরের বাইরে কয়লা ভাঙার জোরালো শব্দটা ঘরের সাময়িক স্তব্ধতাকে যেন ভারী করে তুলেছিল। সুজিত মিন্টুকে বার বার নিজের কাছে হাতছানি দিয়ে ডাকে। মিন্টু কখনো কখনো সহজেই সুজিতের কাছে আসে। আবার কখনো এমন অপরিচিত ব্যবহার করে

যেন সুজিতকে সে এই প্রথম দেখছে। অনেক সাধাসাধিতে ব্যর্থ হয়ে সুজিত বললে,

—যেমন মা, ঠিক তেমনি মেয়ে। এত রাগ করার কি আছে বুঝতে পারি না। আমি তিন গুণবো, এর মধ্যে যদি কথা না বল, চলে যাব।

সুজিত গুণতে শুরু করল। এক, অনেক বাদে দুই।

—এখুনি কিন্তু তিন বলে ফেলবো। বলছি, বললাম—

—কি পাগলামী হচ্ছে এসব !

—যাক্, সেভ্ড, কথা বলেছ।

—আমার কথা শুনতে বুঝি তোমার খুব ভাল লাগে ?

—লাগে সেটা জান বলেই তো তোমার এত অহংকার।

—আমার আর কোন অহংকার নেই। একদিন হয়তো ছিল। এখন সব একে একে ভাঙতে শুরু করেছে।

এক একটা কথা এমন স্তব্ধতা ডেকে আনে যার পর মুখ থেকে মন থেকে কথা হারিয়ে যায়। এক একটা কথা এমন সংক্রামক, যা অন্যের ব্যথার অনুভূতি অপরের মনের সজীবতাকে শুষে নিয়ে ম্রিয়মাণ করে দেয়। ঘরটা আবার কিছুক্ষণের জন্যে বোবা হয়ে গেল।

বিশুর মা চা নিয়ে এল।

—তাহলে কজনের চাল নুবো ?

নন্দর মা চা দিয়ে সবিতার সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল। সবিতা চায়ে কয়েকটা চুমুক দিয়ে বললে,

—তিনজনের মতো চাল নাও।

—তিনজন কে কে ? চিত্রা দিদিমণি তো ফিরবে না বলে গেছে।

—আমি জানি। এই বাবু আজ এখানে খাবে।

সুজিত চমকে সবিতার দিকে তাকাল।

—কার কথা বলছো ?

—তোমার কথা। তুমি এখানে খেয়ে যাবে।
—হঠাৎ, কিসের নিমন্ত্রণ? চিত্রা কোথায় গেছে?
—তার মামা এসেছে নৈনিতাল থেকে, ডেকে পাঠিয়েছে।
—তাহলেও আমাকে নিয়ে তিনজন কেন?
—বিরাম কলকাতার বাইরে। দিল্লী গেছে কাল। ওদের কাগজ ওকে দিল্লীতে পাঠিয়েছে।
আবার স্তব্ধতা। সুজিত চা খাওয়া শেষ করে সবিতার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সবিতার একটা হাতকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে বললে,
—চলো, একটু বেড়িয়ে আসি। তুমি, আমি, মিণ্টু।
সবিতা উঠল। নীচের বাথরুম থেকে গা ধুয়ে এল। শাড়ী পরল উজ্জ্বল গোলাপী রঙের। তারই সঙ্গে মিলিয়ে ব্লাউজ। সাজগোজ সেরে সবিতা যখন সুজিতের সামনে এসে দাঁড়াল, সুজিতের মনে হল তার মনের ভিতরটাও সবিতার শাড়ীর মতো রাঙা হয়ে উঠল।
সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সবিতা বললে,—আজ এখানেই থাকবে। অনুরোধ নয়, আদেশ নয়, যেন একটা প্রার্থনার মতো অস্পষ্ট, অথচ গভীর আন্তরিক সবিতার সেই মুহূর্তের কণ্ঠস্বর সুজিতের কানে গানের মতো বাজতে লাগল।
বেড়াবার সময় মিণ্টু দেখছিল কলকাতাকে। সবিতা বেশীর ভাগ সময় নজর রাখছিল মিণ্টুর দিকে। সুজিত সারাক্ষণ সবিতাকে দেখছিল। আজকের মতো এমন পরিপূর্ণ, এমন বিষণ্ণ আর সুন্দর সবিতাকে সে বুঝি কখনো দেখে নি। আসলে শাড়ীর লাল রঙটাই ছিল ভীষণ মাদকতাময়। যে কোন বয়সের যে কেউ এই রঙের শাড়ী পরলে কিছুটা লাবণ্য ফিরে পেতো। সুজিতের মনে লেগেছে সেই রঙের ঘোর।

চিত্রা যে বিছানায় শুতো তারই ওপর বিছানা করেছিল সবিতা সুজিতের জন্যে।

খেতে বসে সুজিত বললে,—থাকতে রাজী আছি এক সর্তে। ঘুমুতে পাবে না।

—বাঃ, কাল আমার স্কুল আছে না?

—কামাই করবে।

—ওসব ছেলেমানুষী রাখো। তোমারও রাত জাগা ঠিক নয়। যা অবস্থা করেছ শরীরের। খানিকক্ষণ গল্প করা যাবে।

খেতে খেতে সুজিত একসময় সবিতার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

—হাসছ যে?

—ঐটে বুঝি আমার বিছানা?

—হ্যাঁ।

—বিশুর মাকে দিয়ে কিছু ফুল আনিয়েছ?

—ফুল কি হবে? ওঃ। আমার হাতটা এঁটো! নইলে···মারতুম।

—ঠিক আছে, খেয়ে উঠেই মেরো। শোনো, আমার আরও একটা সর্ত আছে।

সবিতা বুঝল সুজিত আবার ফাজলেমো করেই কিছু বলবে। চোখে তাই কিছুটা শাসনের মতো দৃষ্টি নিয়ে তাকাল।

—যেমন আছো, তেমনিই থাকতে হবে।

—তার মানে?

—যা পরে আছ, তা খোলা চলবে না।

—সত্যি, সুজিত, ভীষণ অসভ্য হয়ে উঠছ দিন দিন।

—আচ্ছা এতে অসভ্যতার কি আছে। এই রঙটা আমার ভাল লাগছে। তুমি যদি একটা রাত্রির জন্য এই শাড়ীটা পরে থাক, মহাভারত নষ্ট হয়ে যাবে?

—শাড়ীটা নষ্ট হয়ে যাবে। এটা দামী কাপড়।

—দামী কাপড় পরে বুঝি···। যাক গে, আহারাদি শেষ হল। এবার প্রস্থান।

সুজিত হাত মুখ ধুয়ে সত্যি সত্যিই দরজা দিয়ে বাইরে যাবার উদ্যোগ করলে সবিতা কিছুটা ঝাঁঝালো গলায় তার ক্রোধ প্রকাশ করল।
—ও রকম পাগলামী করছো কেন, ভেতরে এস।
—তা হয় না।
সবিতা দরজার কাছে এসে ওর হাতটা চেপে ধরল। ঈষৎ চাপা স্বরে বলল—খুব ফাজলামী হচ্ছে না। এ বাড়িতে আরো ভাড়াটে আছে। নাটক ক'রো না।
—ওঃ স্যরি। হাতটা ছাড়ো। দুটো পান আর কয়েকটা সিগারেট কিনে আনি।

রাত্রি স্তব্ধ হলে অনেক দূরের শব্দেরা কাছে আসে। শেষ ট্রাম চলে গেল। শেষ অনুষ্ঠান শেষ হল রেডিওতে। মায়ের কোলে ঘুমনো কোন শিশু কেঁদে উঠল আচমকা ঘুম ভেঙে। বহুদূরে কেউ হয়তো হাসল। আকাশে একটা গমগম আওয়াজ। প্লেন যাচ্ছে কলকাতার উপর দিয়ে। আর গভীর রাত্রে কি কাছের শব্দগুলো দূরে চলে যায়? সবিতা তার শোবার ঘরে কি যে করছে তখন থেকে, আসছে না। মাঝে মাঝে চুড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে বহুদূরে, আকাশের নীচে কোনো সুদূর প্রান্তের শব্দ। কেন আসছে না সবিতাদি? লজ্জা? সংকোচ? ভয়? আতঙ্ক? আমিও তো উঠে যেতে পারি সবিতাদির ঘরে? দিনের আলোয়, রাত্রেও, অবশ্য তখন বাড়িতে অন্যেরা থেকেছে, কতদিন গেছি, বিছানায় বসে থেকেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আজ পারছি না কেন? লজ্জা? সংকোচ? ভয়? আতঙ্ক?
বিশুর মা বোধ হয় ঘুমিয়েছে। নাক ডাকছে না। তবু ঘুমিয়ে পড়াই স্বাভাবিক।
সুজিত বিছানা ছেড়ে সবিতার শোবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

—তুমি আসবে না ?

সবিতা ঘাড় ঘুরিয়ে সুজিতের দিকে তাকাল ঠোঁটের উপর তর্জনী চেপে। সবিতার দেহের অর্ধেকটা বিছানায়, বাকী অর্ধেকটা খাটের বাইরে। মিণ্টু বোধ হয় কোন এক সময় উঠে পড়েছিল। মাথার চুলে আল্‌তো হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে। সুজিত ফিরে এল তার বিছানায়। মুখে একটা চাপা হাসি লেগে ছিল।

সবিতা এখনো সেই রক্তিম শাড়ীটা বদলায় নি।

অল্প কিছুক্ষণ পরে সবিতা এসে বসল সুজিতের বিছানায়।

—ঘুমিয়ে পড়।

—আলো জ্বললে আমার ঘুম আসে না।

—ভীষণ মার খাবে সুজিত।

—কেন, মার খাবার মতো কী বললাম আমি ?

—আলো জ্বলবে।

—সারা রাত ?

—তুমি যদি সারারাত জেগে থাকো, তাহলে সারারাত।

—অন্ধকারকে বুঝি তোমার খুব···? কেন ?

—ইয়ার্কি ক'রো না। ঘুমিয়ে পড়। এত রাত্রে আর বকবক করতে হবে না।

—অন্ধকার কি মানুষের চেয়ে ভয়ানক ?

—আবার ?

—আচ্ছা, ঠিক আছে, অন্য কথায় আসা যাক্। শাড়ীটা পাল্টালে না কেন ?

—আমার খুশী।

—তুমি জান, মানুষেরও ওপর তার পরিবেশের একটা ছাপ পড়ে। তুমি এই যে একটা প্রকাণ্ড রক্তিম গোলাপের মতো ফুটে আছো, চোখের সামনে, আমার রক্তে তার ফলে একটা প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে, বুঝতে পারছো ?

—বুঝতে পেরেছি, তোমার ঘাড়ে ভূত চেপেছে। আমি উঠলাম। সবিতা সত্যিই উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গী করলে সুজিত তার হাতটাকে চেপে ধরল।

—বসো, ঠিক আছে, আর একটাও কথা বলব না। কেবল তোমাকে দেখব। এক হাতে সুজিত সবিতার একটা হাত ধরে রইল। আর একটা হাতের তালুতে চিবুক রেখে চুপ করে সবিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

চোখে দুষ্টুমীর হাসি।

—কি আছে দেখার? না দেখেও তো বেশ দিন কেটে যায়।

—আমি কিন্তু কথা বলছি না। তোমার কথার জবাব দিচ্ছি কেবল। না দেখা হলে হাত ব্যথা হয়ে যায়। চোখ জ্বালা করে।

সবিতা কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে কৌতূহলী চোখে ওর দিকে তাকাল।

—তিনদিন আসি নি। তিনটে রাত্রি না ঘুমিয়ে রোজ দশ পাতা করে চিঠি লিখেছি।

—তাই বুঝি? কই দেখি?

—তাহলে আমার সঙ্গে বেরুতে হবে। চিঠিগুলো নেই, তবে তার ছিন্নাবশেষ এখনো হয়তো কলকাতার রাজপথে ছড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে পাওয়া যাবে।

সবিতার চোখে না-বোঝার বিস্ময়। সুজিত বললে,

—ছিঁড়ে ফেলেছি।

সুজিতের হাল্কামী-ভরা কণ্ঠস্বরে এই প্রথম অন্তর্মুখী বিষাদের ছোঁয়া লাগল।

—কেন?

—জানি না কেন।

দুজনেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ। কলকাতায় শেষ ট্রাম বোধহয় গুমটিতে ফিরে

গেছে। কলকাতায় সব মানুষ বোধহয় ঘুমন্ত। কোথাও কোন শব্দ নেই। আশ্চর্য বিশুর মারও তো নাক ডাকছে না। কী ভয়াবহ নীরবতা। মাথার উপরে একটা একশ' কিংবা ষাট পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছে চারপাশটাকে চেনা যায় পৃথিবীর একটা পরিচিত অংশ হিসেবে। নইলে হত যেন মৃত্যুর মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে সব কিছু। চারিদিকে এত ভয়াবহ নিঃশব্দ যে সবিতা হঠাৎ একটু নড়ে বসলে তার মাড়-দেওয়া শাড়ীর শব্দে মনে হল বুঝি বাইরে কোথাও ঝড় উঠল।

দীর্ঘ স্তব্ধতার পর সুজিতই প্রথম কথা বললে। কথা বলতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বরে উঠে এল বুকের ভিতরকার একরকম কষ্ট মেশানো ভাবালুতা।

—তুমি কি ভাবছো জানি না, সবিতাদি। কিন্তু আমি জানি, ঐ চিঠির এক একটা অক্ষর আমি লিখেছিলাম আমার বুকের বিপুল বেদনা যন্ত্রণা দিয়ে। যখন লিখতাম, তখন, তুমি যে আমার এত কাছে বসে আছ, এর চেয়েও কাছে থাকতে। যেন তোমার দু-হাতে গড়া একটা বিশাল আলিঙ্গনের মধ্যে আমি চিঠিগুলো লিখতাম। রাত জেগে তিন দিনে তিরিশ পাতা লিখেছিলাম। কিন্তু যা লিখেছি তার চেয়ে অনেক বেশী কথা বলেছি মনে মনে। তুমি শুনেছো, হেসেছ, বকেছ, রাগ করেছ, ভালও বেসেছ। আমার …আমার কাছে, আমার কী ভীষণ, ভয়ংকর সুন্দর ছিল সেই দুঃসহ দুঃখের একাকীত্বের মুহূর্তগুলো।

সবিতার একটা হাত সুজিতের মুঠোর মধ্যে ছিল, আলগা ভাবে। সবিতা তার হাতটা সুজিতের মুঠোর মধ্যে থেকে সরিয়ে নিয়ে সুজিতের মাথার চুলের উপরে ছোঁয়াল। সুজিত হাতের তালুতে চিবুক ছুঁইয়ে নত হয়ে বসে কথা বলছিল। সুজিতের মাথা থেকে হাত নামিয়ে সবিতা তার চিবুকটাকে হাতের তর্জনী দিয়ে ছুঁয়ে বললে,

—আমার দিকে তাকাও।

সুজিত চিবুকটাকে শক্ত করে হাতের তালুতে চেপে ধরল।

—কি হল? আমার দিকে তাকাও।

—পারবো না।

—কেন পারবে না? এই তো একটু আগে তাকিয়েছিলে।

শিশুর প্রতি মায়ের কোমল সম্ভাষণের মতো সবিতার কণ্ঠস্বর মৃদু, মহিমাময়, অন্তরঙ্গ ও নির্ভরশীল।

—তুমি যতক্ষণ আমার থেকে দূরে থাক, ততক্ষণ তোমাকে আমার অনেক বেশী আপনার বলে মনে হয়। কাছে এলে, মনে হয় অন্য কথা।

—কি?

—তোমাকে আমি···আমি তোমার···তুমি আমাকে, তোমাকে আমি কোনদিন আপন করে পেতে পারি না।

সবিতার চোখে যেন মেঘের ছায়া নেমে এল। সুজিতের চিবুক থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে একটুখানি সময় কি যেন ভেবে নিয়ে সবিতা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল বিছানা থেকে। দরজার কাছে সুইচ বোর্ড। সবিতা ঘরের আলোটাকে নিভিয়ে দিলে। সুজিত প্রায় চমকে উঠেছিল। ভেবেছিল তার প্রতি অভিমান বা ক্রোধ বশতই সবিতা বোধ হয় ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে শুতে চলে গেল তার নিজের শোবার ঘরে। হঠাৎ-অন্ধকারে সুজিতের অন্ধের মতো অবস্থা। সেই সময় কে যেন তার মাথাটাকে দুটো কোমল হাতে চেপে ধরে একটা কিছু নরম জিনিসের ওপর শুইয়ে দিলে। তার কানে এল সবিতার তরল কণ্ঠস্বর।

—এবার তাকাতে পারবে তো? ভীষণ দুষ্টু ছেলে।

সবিতার কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে থাকতে থাকতে সুজিত ভাবতে লাগল—মৃত্যুর পক্ষে এইটেই সবচেয়ে মনোরম মুহূর্ত। বুকের সমস্ত শূন্যতা ছাপিয়ে উপচে পড়তে চাইছে সুখের স্রোত।

ঠিক এই রকম একটা অন্তরঙ্গ নিবিড় মুহূর্তের জন্য কত দীর্ঘদিন ধরে আমি প্রায় তপস্যা করেছি, ধ্যান করেছি। সবিতাদি আর আমি। ঘরময় অন্ধকার। বিশ্বময় স্তব্ধতা। এত স্তব্ধ যে আমরা দুজন যে-কথা মনে মনে ভাববো, মুখে উচ্চারণ না করলেও শুনতে পাবো পরস্পর। সবিতাদি বসে থাকবে আমার শিয়রে। ছেলেবেলার অসুখের দিনগুলোয় মা যেমন করে বসে থাকতেন। তখন মাকে দেখে মনে হত, আমি নির্ভয়, অসুখ আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এই মুহূর্তেও ঠিক সেইরকম মনে হচ্ছে। সবিতাদি যদি আমার শিয়রে এইভাবে জেগে থাকে, আমি পৃথিবীর ক্লেদ, গ্লানি, তুচ্ছতাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বেঁচে থাকতে পারি। তারা কেউ আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

অন্ধকারে সুজিতের চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল তার তিরিশ পাতা চিঠির কিছু কিছু অংশ। এখন, ঠিক এই মুহূর্তে কই আর তো মনে হচ্ছে না চিঠির কথাগুলো মিথ্যে, বানানো, মূল্যহীন। এই তো পেয়েছি, যে-বাসনায় শরীরের ভিতরে রক্তপাত হচ্ছিল, তার মূল্য।

যেভাবে তানপুরা বাজাতে হয়, সেই রকম কোমল ছোঁয়ায় সবিতা সুজিতের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে চলেছিল।

সুজিত বললে—কেউ যদি গভীর, আন্তরিকভাবে কিছু চায়, পায়। আজকের এই মুহূর্তকে পাব বলে আমি প্রায় যুগ-যুগান্তর ধরে তপস্যা করেছিলাম।

সুজিতের কণ্ঠস্বর পৌরুষে পরিপূর্ণ, ভরাট। কিছুদিন আগেও সবিতা সুজিতের এইরকম কণ্ঠস্বর শুনলে ভয় পেত, না, ঠিক ভয় নয়, চিন্তিত হত। এখন সবিতার সেরকম কিছু মনে হল না।

সবিতা বললে—পেয়েছো ?

—পেয়েছি।

—কি পেয়েছো ?

—তোমাকে। আমার নিজস্ব তোমাকে।

—খুশী হয়েছো ?

—হয়েছি।

—এবার তাহলে শুতে যাই।

সবিতার কণ্ঠস্বর অনুগত, শান্ত, স্নিগ্ধ।

—না।

—আর কিছু পাবার নেই সুজিত। আর কিছু দেবারও নেই। তুমি এসেছ অবেলায়।

—আবার ওসব কথা ? দেখো। কেউ তার নিজের সঠিক পরিচয় জানে না। তুমি জান তোমার মুখটা কি রকম দেখতে ? আয়না তো দেখায় উল্টো ছবি। তাহলে ? তুমি এমনভাবে কথা বল যেন, তিনকাল গিয়ে এককালে পা দিয়েছ। আজ বিকেলে যখন এই গোলাপী শাড়ীটা পরে প্রথম সামনে এসে দাঁড়ালে, তোমাকে মনে হচ্ছিল পঞ্চদশী, পূর্ণিমায় পৌঁছতে চলেছ।

—বাইরেটাই মানুষের সব নয়। তুমি ছেলেমানুষ, বুঝবে না। আমি মনের দিক থেকে ফুরিয়ে গেছি। হেরে গেছি। হেরে যাচ্ছি।

—কার কাছে ?

—সকলের কাছে। কাঁদন আমার ওপর ভুল রাগ করে চলে গেল। চিত্রা চিরকাল এখানে থাকবে না। বাদ দাও। বিরাম এখন নিজের কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত। অর্থ, সামাজিক মর্যাদা, যশ, প্রতিপত্তির সিংহাসনে বসবার জন্যে উন্মত্ত। আমার দিকে তাকাবার তার সময় নেই। সংসারের ক্ষেত্রে আমার সামাজিক পরিচয়টা কেবল টিকে থাকবে—আমি তার বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু বিরামের চিন্তা-ভাবনায় জগতে আমি অপ্রয়োজনীয়, বাতিল। আমাকে নিয়ে তার কোন স্বপ্ন নেই। আমার কোন স্বপ্নের সে অংশীদার নয় আজ। অথচ আমাদের পাশাপাশি থাকতে হবে, বাঁচতে হবে,

স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করতে হবে। ছেলেবেলা থেকে আমি কেবল হেরেই আসছি।

—আমার কাছে ?

—তুমিও চিরকাল থাকবে না সুজিত। বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে তুমি। তোমার জন্যে তাঁদের স্নেহ-ভালবাসা আছে। কিছুদিন পরে ভাল চাকরি করবে। বিয়ে করবে। সুন্দরী বৌ, সুন্দর সংসার, একটা গোটা জীবন তোমার সামনে পড়ে আছে। আমার সামনে কি আছে ?

—এখন, এই মুহূর্তে তোমার সামনে আমি আছি। ভবিষ্যৎ-এর কথা চুলোয় যাক। ও নিয়ে আর একটা কথাও বলা চলবে না। অন্য কথা বলো।

সবিতা কোন কথা বলল না। সুজিত মুখটা উঁচু করে সবিতার দিকে তাকাল। অন্ধকারেও সুজিতের মনে হল সবিতা বিষণ্ণভাবে হাসল।

—বলো।

—কি বলবো।

—অন্য কথা।

—কিছু বলার নেই।

—নেই তো ?

সুজিত তার একটা হাত ধীরে ধীরে সবিতার ঘাড়ের উপরে রাখল। সোনার সরু হারটা নিয়ে আঙুলে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। তারপর ঘাড়ের ওপর চাপ দিয়ে সবিতার মাথাটা নীচের দিকে নামিয়ে আনল। সবিতা কোন বাধা দিল না। অল্প টানেই পুষ্পিত কোন লতার মতো সবিতার মুখটা নেমে এল সুজিতের উঁচু করে থাকা উন্মুখ ওষ্ঠের দিকে। একটা প্রগাঢ় চুম্বন ওদের দুজনকে কিছুক্ষণের জন্যে একাত্ম ও আলোকিত করে রাখল, ঘরের ভিতরের নিবিড় অন্ধকারে।

—কি খাবি ? হুইস্কি না রাম ?

সুজিতের কাছ থেকে কোন উত্তর আসে না। যেন প্রশ্নটা কানেই ঢোকে নি তার।

—কি খাবি ? কি বলবো তোর জন্যে ?

সুজিত এবার সচকিত হয়ে ওঠে।

—কে আমি ? আমি, না আমি তো কিছু খাব না। আমি এসব খাই না।

—কেন ? তুই কি পবিত্র দেবশিশু ?

সুজিত কিছুক্ষণ স্তম্ভিত চেয়ে থাকে বারীনের দিকে। তারপর চোখ ছড়িয়ে দেয় বসে-থাকা ঘরটার দিকে। ঘর নয়, বার। প্রায় খালি। এখনো সন্ধ্যের গায়ে রাত্রির ছোঁয়া লাগে নি, তাই। এ-সব জায়গার যারা নিয়মিত অতিথি, তারা রাত্রিচর। রাতও বাড়বে, ভিড়ও বাড়বে।

মৃদু ঠাণ্ডা মোমের মতো নরম নীলচে আলোয় ঘরটা যেন কোলাহলের মধ্যেও ঘুমের মতো। প্লাস্টিকের মানি-প্ল্যাণ্ট ঝুলছে শিলিং থেকে। দেয়াল জুড়ে নানারকম আধুনিক এ্যাবস্ট্রাক্ট পেনটিং টাঙানো। আলোক সজ্জাও অতি আধুনিক। চেয়ারগুলো কাঠামো কাঠের, বাকিটা দড়ি দিয়ে বোনা। টেবিলের গড়নও বিচিত্র। চেয়ার-টেবিল ছাড়া কয়েকটি সোফাও পাতা আছে। গাঢ় লাল রঙের আচ্ছাদন-বস্ত্রে ঢাকা। ভীষণ চোখে লাগে। এতক্ষণ পরে সুজিত অনুভব করল যে তার ঘ্রাণে আসছে কী-রকম একটা অজানা অদ্ভুত গন্ধ। গন্ধটা টাটকা নয়। যেন একটা স্নিগ্ধ সৌরভ দীর্ঘদিন শুকিয়ে শুকিয়ে, রোদ-জল-বাতাসের সম্পর্কচ্যুত নিঃসঙ্গ নির্জনতার

অন্ধকার আবর্তে গুমরে গুমরে নষ্ট হয়ে যেতে যেতে একটা জায়গায় এসে থেমেছে।

সুজিত সমস্ত পরিবেশটাকে বুঝে ওঠার পর নিজের মনেই খুব বিস্ময় অনুভব করল।

বারীনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল ওয়েলিংটন পেরিয়ে। দেখা হবার পর গল্প করতে করতে সুজিত রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেছিল তার সঙ্গে। সুজিতই কথা বলছিল বেশী। বারীনকে আজ সে তার জীবনের সদ্যপ্রাপ্ত কিছু নূতন অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে চাইছিল প্রায় জোর করেই। সবিতার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে বারীন ইতিপূর্বে তাকে নানারকম খোঁচা-মারা কথা শুনিয়েছিল। এতদিন পরে জবাব দেবার পালা এসেছে সুজিতের। তাই কথার আনন্দে বিভোর হয়েছিল সে। কখন যে তাদের পায়ে হাঁটার পথ ওয়াটালু স্ট্রীটের মদের দোকানের উর্দি-আঁটা বেয়ারা আর 'পুশ' লেখা গ্লাস ডোরের পিছনে হারিয়ে গেছে সুজিতের খেয়ালই ছিল না।

—কি খাবি? হুইস্কি না রাম?

—বললুম তো, ওসব কিছুই খাব না, তুই খা। আমাকে একটা সিগারেট দে।

—খাবি না কেন?

—কোন আর্জ ফিল করছি না খাবার জন্যে, তাই।

—তাহলে জিন্ খা। মেয়েরা খায়। তোর ভাল লাগবে। এখানে এসে কিছু না খেলে বেয়ারাগুলো হাসবে।

বারীন একটা বেয়ারাকে ডাকল নাম ধরে। বেয়ারা এল।

—মুশা।

—বলিয়ে বাবু।

—এক্ পেগ্ হুইস্কি, ব্ল্যাক নাইট, বড়া। আউর এক্ পেগ্ জিন উইথ লাইম।

বেয়ারা চলে গেল। বারীন তার গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেটটা খুলে

মেলে ধরল সুজিতের সামনে। সুজিত একটা সিগারেট ধরাল। আস্তিন গুটানো ডান হাতের কনুইটা টেবিলে ঠেকিয়ে নীচের দিকে মুখ করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। টেবিলের আচ্ছাদনটা স্বচ্ছ। সুজিত তার মধ্যে নিজের মুখের প্রতিবিম্বটিকে মোটামুটি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল। সুজিতের বেশ ভাল লাগছিল নিজেকে দেখতে। অস্পষ্ট, আবৃত, ঝাপসা, নরম, মোলায়েম, বিষণ্ণ, করুণ, সব মিলিয়ে রহস্যময় এক সুজিতকে শান্ত সস্নেহ একটা ভালবাসা দিয়ে অবলোকন করছিল সুজিত। সেই সঙ্গে সুজিতের এই রকম একটা ধারণা বা ভাবনাও মনের মধ্যে কাজ করছিল যে, টেবিলের প্রতিবিম্বের সুজিতকে যে দুটো চোখ দিয়ে সে দেখছে সেটা তার নয়, তার সবিতাদির। সুজিত ভাবছিল, সবিতাদি যখন আমার দিকে তাকায়, আমাকে দেখে, এই-ই দেখতে পায়, যা আমি দেখছি টেবিলের প্রতিবিম্বে। অথচ আমি দেখতে এমন নই। আমি রুগ্ন। আমার কোন অনির্বচনীয় মুখশ্রী নেই। আমার চেয়ে অনেক বেশী সুশ্রী সুগঠিত যুবককে আমি প্রতিনিয়তই দেখে থাকি পথের চারপাশে। মেসের সতীর্থ ভবেশের যে আয়নাটা চেয়ে নিয়ে আমি গোঁফ-দাড়ি কামাই বা চুল আঁচড়াই, সেই আয়নায় আমার নিজের মুখ আমি দেখেছি। মেসের নীচের তলায় ম্যানেজার বঙ্কিমবাবুর চেয়ারের পিছনে যে চৌকো বিরাট কোন-ভাঙা ধোঁয়ায়-ধুলোয় ধূসর আয়নাটা ঝুলে থাকে, প্রতিদিন মসলা মুখে দেবার সময় সেটার দিকে একবার তাকানো আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, সে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে কেমন যেন বেঁচে থাকার, কথা বলার, কিছু করার, কারো কাছে যাবার উৎসাহ থাকে না। তখন মনকে সান্ত্বনা যোগাই এই বলে যে, ম্যানেজার বঙ্কিমবাবুর মতো ঐ রকম ধড়ীবাজ, ঝানু ব্যবসাদার লোক কোনদিন ভুল করেও দামী কাঁচের আয়না কিনতে পারে না। কাঁচের মধ্যে দিয়ে নিজেকে দেখতে একমাত্র ভাল লাগে আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটা পানের

দোকানে, সবিতাদির বাড়িতে যাবার পথে আজকাল যেখান থেকে রোজ সিগারেট কিনি। বেশ পুষ্ট লাগে মুখটা। বেশ পরিণত মনে হয় নিজেকে। চোখের চাউনিতে কিছু গভীরতা খুঁজে পাওয়া যায়। আমার অনেকবার ইচ্ছে করেছে ঐ আয়নাটার দিকে তাকিয়ে একটু হাসি। হাসলে আমাকে কেমন দেখায়, তা দেখার জন্যে।

ভাবতে ভাবতে সুজিতের মনে হল সত্যিই যেন তার পাশে বা পিছনে সবিতা দাঁড়িয়ে আছে। সুজিতের ঠোঁটের কোণে একটা নিশ্চিন্ত নির্ভয় পরিতৃপ্ত হাসি উঁকি মারল। সেই সঙ্গে তার সর্বাঙ্গকে শিহরিত করে সবিতা যেন তাকে একটা ঠেলা দিল। সুজিত মুখ তুলে তাকাল। সবিতা কোথাও নেই। তার কাঁধের কাছে বারীনের হাত।

—কি ভাবছিস? তারপর কি হল বল এবার?

—কার পর?

—ঐ যে কি সব বলছিলি রাস্তায়। বাড়িতে কেউ নেই। শুধু তুই আর তোর সবিতাদি। দেন, হোয়াট?

সুজিত খুব শান্তভাবে শুনল। বারীনের ঈষৎ তাচ্ছিল্য মেশানো কৌতূহল। বারীনের চোখের দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুজিত।

—কি ধরনের ঘটনা শুনলে তুই সবচেয়ে খুশী হবি?

সুজিত, সুজিতের মতো নরম সলজ্জ যুবকের পক্ষে যতখানি কঠিন করা সম্ভব, কঠিন কণ্ঠস্বরে কথাটা বলে বারীনের দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখে উদ্ধত নির্ভয় চাউনি।

আজ আমি তোর কাছে হারবো না বারীন। ছেলেবেলা থেকে আমি ক্রমাগত সকলের কাছে, সব কিছুর কাছে হেরে এসেছি। রোগা ছিলাম বলে খেলায় হেরেছি। লাজুক ছিলাম বলে ভাল-বাসায় হেরেছি। অন্যমনস্ক ছিলাম বলে পড়ায় হেরেছি। আমার

নিজের চিন্তা-ভাবনা ছিল বলে রাজনীতির কাছে হেরেছি। আমি ব্যবহারে সম্ভ্রান্ত, অভিজাত, সংযত হতে চাই বলে বন্ধুদের কাছে হেরেছি। আর হারবো না। বারীন, তুই আজ আমাকে হারাতে পারবি না। আমি জিতবার জন্যে মিথ্যে পর্যন্ত বলবো।
বারীন কিছু বলতে যাচ্ছিল। বেয়ারা মদের বোতল, গ্লাস ইত্যাদি নিয়ে এল। বেয়ারা না যাওয়া পর্যন্ত সুজিত একই রকম দৃষ্টিতে বারীনের দিকে তাকিয়ে রইল পলকহীন। যেন একটা ভীষণ বোঝাপড়া আছে তার বারীনের সঙ্গে।
বারীন তার নিজের গ্লাস হাতে তুলে একটু উঁচু করে তুলে ধরতেই সুজিতও তাই করলে।
—চিয়ার্স
—চিয়ার্স
বারীনের কাছে হারবে না, তাই সুজিত অসঙ্কোচে গ্লাসে একটা চুমক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখেই বারীনকে প্রশ্ন করল,
—বল্!
—কী?
—কী রকম উত্তর শুনলে তুই খুশী হবি?
—আমি? কোন উত্তরেই আমি খুশী হবো না। ওসব ভ্যাত্‌ভেতে ব্যাপারে আমি আর মাথা ঘামাই না।
—তাহলে জিজ্ঞেস করছিলি কেন?
—এমনি। অনেকদিন থেকে রগড়াচ্ছিস। তোর কিছু একটা হিল্লে হল কিনা তাই জানছিলুম। হয় নি?
—হয় নি মানে?
—কিছুই হয় নি। ঐ কেবল আসা-যাওয়া আর পান চিবোনো।
—পান আমি খাই না।
—এত ব্লাণ্ট হয়ে যাচ্ছিস কেন? পান চিবোনো মানে পান চিবোনোই হতে হবে নাকি? মিষ্টি মিষ্টি কথা বলাও এক

রকম পান চিবোনো। তোর চেয়ে অসীম ঢের কাজের ছেলে।

—অসীম! আমাদের অসীম?

—হ্যাঁ, একটা মেয়েকে বিয়ে করবে বলে তার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে এখন সরে পড়ার তাল করছে।

—বারোটা মানে?

—উজবুক নাকি রে তুই, একদম গেঁইয়া। বারোটা মানে, নাউ সি ইজ প্রেগনেণ্ট!

—সে কি? অসীমের সঙ্গে তো আমার কদিন আগে দেখা হয়েছিল। ও কথা তো বলল না। বিয়ে করার ব্যাপারে কিছু অসুবিধে ঘটছে। এইটুকুই শুধু বলল।

—আমি ওর চোখ দেখেই আন্দাজ করেছিলাম।

—কী!

—ও মেয়েটাকে ঝুলিয়েছে।

—চোখ দেখে বোঝা যায় নাকি এসব?

—খুব যায়। বুঝতে হয়। এক্সপেরিয়েন্স থাকলে বোঝা যায়। চোখ হচ্ছে দু রকম। একটা চোখ টেরী-কাটা চোখ। আরেকটা ন্যাড়া চোখ। টেরী-কাটা চোখ হচ্ছে তাদের যারা এখনো ফুলে বসে নি, আশপাশে ছুঁই-ছুঁই ছোঁব-ছোঁব করছে। ন্যাড়া চোখ হচ্ছে, ক্ষুর বুলিয়ে মাথা যেমন চেঁছে দেয়, ন্যাড়া চোখ হচ্ছে তেমনি রঙ চাঁছা চোখ। উদাস দৃষ্টি, ব্যাকুল নয়ন, নয়নের নীল ওসব কাব্যের ব্যাপার-ট্যাপার মুছে গেছে চোখ থেকে। নিংড়োলেও রস-কষের ছিটে-ফোঁটা বেরোবে না। পাথর-পাথর ভাব।

চোখ! চোখ এত কথা বলতে পারে! তাহলে কি আমার চোখ দেখেই বারীন বুঝতে পারছে আমি সব-পেয়েছির অভিনয় করবার চেষ্টা করতে যাচ্ছিলুম ওর কাছে।

কিন্তু আমি জানি আমার চোখ দুটো বদলে গেছে। আজ

সকালেই যখন আমহার্স্ট স্ট্রীটের পানের দোকানের আয়নায় তাকিয়েছিলাম, মনে হয়েছিল আমার চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। নীল, ধারালো অস্ত্রের মতো ঝলসাচ্ছে। চোখ দুটো বড় হয়ে গেছে।

শুধু চোখ নয়, সবিতাদির ঘরে রাত-কাটানোর পর থেকে আমার মনেও একটা ক্রমাগত রূপান্তর ঘটে চলেছে যেন। আমি যেন কৈশোরের চূড়ান্ত সীমা পার হয়ে যৌবনের নবীন আর পরিপূর্ণ জগতে পা দিয়েছি। সবিতাদির ভালবাসা যেন আমার শরীরে মাংস, চোখে দ্যুতি, চিন্তায় দৃঢ়তা, জীবনে অভিজ্ঞতার অজস্র উপাদান এনে জড়ো করেছে। অন্ধকারে খুলে গেছে একটা ভেজানো দরজা, জোৎস্নার বাগান, সেখানে করতল দিয়ে যা ছোঁয়া যায় তাইই কুসুম, যা নিশ্বাসে আসে তাইই সৌরভ, যা কিছু ঝরে সব নক্ষত্রের মতো স্বপ্নময়।

একই সঙ্গে দুটো কারণে সুজিতের বুকের ভিতরে একটা চাপা বেদনা ভারী হতে লাগল। প্রথম কারণ, এই মুহূর্তে, তার সবিতা-দির কথা নিরবচ্ছিন্নভাবে ভাবতে ইচ্ছে করছে, অথচ এখানে এই মুহূর্তে, এই পরিবেশে তা যাবে না। দ্বিতীয় কারণ, বারীনের কাছে আবার সে হেরে যাচ্ছে। বারীনরা কি উপদানে গড়া? এরা সব জানে। সব জেনে ফেলেছে। পৃথিবীর যা কিছু কৌতূহল, বিস্ময়, রহস্য, জিজ্ঞাসা, সব যেন এদের কাছে ছেলেবেলার শিশু-ধারাপাতের মতো মুখস্থ।

দুজনেরই গ্লাস শেষ হয়ে এসেছিল।

বারীন বললে, আর খাবি?

—খাব। হুইস্কি। এটা তো শরবতের মতো লাগছে।

—বাঃ, গুড, তোর উন্নতি হচ্ছে। তাহলে ওঠ্। আমার সঙ্গে চল। ভাল হুইস্কি খাওয়াব।

—কোথায়?

—চল না।

দেনা-পাওনা ও বেয়ারার বক্‌শিশ মিটিয়ে ওরা দুজন বাইরে এল। দরজার সামনেই একটা ট্যাক্সি মিলে গেল। বারীন গাড়িতে উঠে বললে,—ল্যান্সডাউন।

গেটের মুখেই লেখা ছিল—বীওয়ার অব ডগ্‌স। লনে পা দিতে না দিতেই সেই কুকুরের সিংহ-গর্জনে লনের মাটি, টবের গাছ, চৌকো চৌকো সিজ্‌ন ফ্লাওয়ারের বেডে ফুলের আধফোটা কুঁড়ি, সুজিতের হৃৎপিণ্ড সব যেন এক সঙ্গে কেঁপে উঠল। বারীন নিশ্চয়ই এবাড়িতে এর আগে বহুবার এসেছে। তাই ভ্রূক্ষেপহীনভাবে সে এগিয়ে চলেছিল সুজিতের আগে।

একতলার একটা বন্ধ ঘরের সম্ভবত ড্রইং রুমের দরজার কাছে ওরা যখন দাঁড়াল, বারান্দায় চেনে বাঁধা অ্যালসেসিয়ান তখনও রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করে চলেছে।

বারীন কলিং বেল টিপলে।

একটু পরে ভেজানো দরজা খুলে গেল। হলুদ ও হালকা ধূসর রঙের লতাপাতা আঁকা শাড়ী পরে ঘরের দরজা খুলে হাসি মুখে ওদের দুজনকে যে মেয়েটি অভ্যর্থনা জানাল, তাকে চিনতে পেরে সুজিত প্রায় বোবা হয়ে গেল। করবী।

সুজিতের দিকে তাকিয়ে একমুখ হাসল করবী।

তিনটে সোফায় বসল তিনজনে। কুকুরটা তখনও চেঁচাচ্ছিল। করবী একটু উঠে গিয়ে বোধ হয় ওর পিঠ চাপড়ে আদর করে কিছু বলে এল। সে থেমেছে। করবী বসল সুজিতের মুখোমুখি।

বারীন সিগারেট ধরাল।

—একে তুমি কোথায় পেলে? বাঃ বাঃ, এতো সাংঘাতিক কাণ্ড!

বারীন বললে,—ধরে নিয়ে এলাম। অন কণ্ডিশান, ভাল হুইস্কি খাওয়াব। বাবা কোথায়?

—বাবা মা, ওরা গেছেন একটা ককটেল পার্টিতে। এবার ফিরবেন।
—স্বাতী ?
—নাচ শিখতে। তারও ফেরার সময় হয়ে এল।
—তুমি একা ?
—দোকা আর কোথায় পাব ? কি খাবেন বলুন, সুজিতবাবু। কফি ?
সুজিতের হয়ে বারীন বললে,
—না, না, কফি-টফি নয়। হুইস্কি।
—যাঃ, বেচারা ভালমানুষকে কেন তোমরা পাকাচ্ছ ?
—আমরা পাকাচ্ছি কোথায় ? ও নিজেই পাকতে শুরু করেছে।
—সত্যি হুইস্কি খাবেন ?
অন্যদিন হলে সুজিত লজ্জায় ভেঙে পড়তো মাটিতে। আজ পড়ল না, তার কারণ প্রথমত জীবনে প্রথম মদ্যপান করার ফলে যেভাবেই হোক, তার শরীরের অভ্যন্তরে একরকম মৃদু উত্তেজক অনুভূতির প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, আজ সে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবে বারীনের কাছে না হারায়।
করবী বললে,—তাহলে চলুন, ওপরে আমার শোবার ঘরে।
দেয়াল, মেঝে, কাঠের রেলিং দেওয়া ঘোরানো সিঁড়ি, দরজা, জানালা, কার্পেট, পরদা, ছবি, আসবাবপত্র সব যেন ঝলমল করছে। কোথাও মানুষের ব্যবহার-জনিত স্পর্শের কণামাত্র মালিন্য নেই। দেখে মনে হয় না এ-বাড়িতে মানুষ বাস করে। মনে হয়, এসব বাড়ি যেন শুধু সাজিয়ে রাখার জন্যে, লোকে দেখবে বলে, দেখে বাহবা দেবে বলে।
সিঁড়িতে উঠতে উঠতে সুজিত আরও একটা কথা ভাবল।
বারীন তাহলে সব কথাই মিথ্যে বলে না।
বারীন বলেছিল, করবীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে টেনে নিয়ে যায় তার শোবার ঘরে। হুইস্কির বোতল খুলে দেয়। তারপর নাকি আলো নেভে। এসব এক আশ্চর্য জগৎ।

করবীর শোবার ঘর। প্রচুর বই। যামিনী রায়ের ছবি। বিদেশী উড়োজাহাজ কোম্পানীর বিশাল ক্যালেণ্ডার। কৃষ্ণনগরের পুতুল। বাঁকুড়ার ঢোকরাদের পোড়া-পেতলের ছোট-বড় মূর্তি। লক্ষ্মীর সরা। ভ্যান গগের ছবি। শ্রীনিকেতনের বেড শীড ও জানলা-দরজার পর্দা। রেডিও গ্রাম। বেতের কাজ করা লাইট-স্ট্যাণ্ড। কাশ্মীরী কাঠের টি-পয় ও অন্যান্য শিল্পকাজ।

ঘরের মধ্যে বসবার বহুরকম আয়োজন আছে। গদী-আঁটা বেতের চেয়ার। দুটি নরম সোফা। কারুকার্য করা চামড়া দিয়ে ঢাকা মোড়া। যার যেমন খুশী বসতে পারে।

সুজিত সোফাতেই বসল। বারীন আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে করবীর বিছানার কাছাকাছি বসল একটা মোড়ায়। করবী বসল সুজিতের কাছাকাছি। করবীকে যেন অন্য রকম লাগছে দেখতে। উগ্র প্রসাধন নেই। মেপে হাঁটা নেই। অকারণ ব্যস্ততার নকল অভিনয় নেই। খোলা-মেলা সরল আড়ম্বরহীন আটপৌরে চেহারা। মাথার চুল খোলা।

সুজিতের কাছাকাছি বসে করবী হাসল তার দিকে তাকিয়ে।

—এতদিনে এলেন তাহলে!

সুজিত হাসল।

—আমি যে এখানেই আসছি, তা কিন্তু জানতাম না।

—ওমা, সেকি?

—ও বলল, চল্ আমার সঙ্গে। চলে এলাম।

—তাই বলুন, নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ির নাম বললে আসতেন না।

—তা কেন হবে। আপনাদের বাড়িটা বেশ। মিউজিয়ামের মতো। দেখবার জিনিসে ভর্তি।

—আপনার ভাল লাগছে দেখতে? এসবই বাবার কাণ্ড। একসময়ে কিছুদিন আর্ট-স্কুলে পড়েছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত পড়া হয় নি। ঠাকুর্দার আপত্তি ছিল। তিনি জোর করে বিলেতে পাঠিয়ে দিলেন।

বাবা কিন্তু মনে মনে শিল্পীই রয়ে গেছেন। নিজের হাতে কিছু আঁকেন না বটে, কিন্তু সত্যি-সত্যিই উনি পেনটিং, মিউজিক, গার্ডেনিং, আর্কিটেকচার এমন কি ইনটেরিয়ার ডেকরেশন, ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট, যেটুকু সময় পান এসব নিয়ে পড়াশোনা, চর্চা করেন। ক'বছর আগে যেবার জাপানে গিছলেন, ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট, ইকেবানা শিখবেন বলে, এক জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলেন। তিনি যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে ছিলেন চার-পাঁচ দিন। মায়ের নিজের হাতে রাঁধা, মা তো আবার পূর্ববঙ্গের মেয়ে, মোচার ঘণ্ট খেয়ে জাপানী ভদ্রলোক, মিঃ তোমিকি কী খুশী! ওয়াণ্ডারফুল ওয়াণ্ডারফুল বলে অস্থির। যাবার সময় মাকে বলে গেল, এগেন আই উইল কাম টু ইণ্ডিয়া টু টেস্ট ইউর ওয়াণ্ডার ফুল কারী···মোছার ঘোন্তো। কি রকম মজা না?

সুজিত সহাস্যে মাথা নাড়ল।

করবী এবার উঠে দাঁড়াল।

—একটু বসুন। আমি আসছি।

করবী ঘরের ভিতরে চলে গেল।

বারীন করবীর বিছানা থেকে একটা বই তুলে নিয়ে পড়ছিল। বারীনের বোধ হয় এ-সব গল্প শোনা। সে তাই বইয়ের পাতাতেই মগ্ন ছিল এতক্ষণ। করবী ফিরতেই, হঠাৎ সে বইখানাকে আবার বিছানাতেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। করবী তাকাল সেদিকে।

—কি হল?

—দূর, এক পাতায় একশোবার শুধু বুর্জোয়া, পেটী বুর্জোয়া, সোস্যালিজম, প্রোরেটারিয়েট, ডায়ালেকটিক, জ্বালালে।

—পড়তে গেলে কেন?

—পড়ি নি তো। চোখ বোলাচ্ছিলুম। এসব অনেকদিন আগে পড়েছি। আজকাল মেয়েরা ছাড়া এসব বই কেউ পড়ে না।

—তাই বুঝি? ছেলেরা তাহলে কি পড়ে?

—আগাথা ক্রিস্টি।

—এসব তথ্য তোমাকে কে সাপ্লাই করেছে? প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার বুঝি?

—করবী, আস্তে। আইজেন হাওয়ার শুনতে পেলে ভীষণ রাগ করবেন। তোমার বাবা আমেরিকান অয়েল কোম্পানীর ডিভিসনাল কণ্ট্রোলার।

—বাবা ইজ বাবা। বাবার কথা তুলবে না। আমার সঙ্গে কথা বলছো আমার কথা বলো। তুমি কি আজকাল নিজেকে দিয়ে দেশকাল-সভ্যতাকে বিচার করছো নাকি?

—করবী প্লীজ, আমি উইথড্র করছি। একসময় রাজনীতি করে-ছিলাম। এখন সব ভুলে গেছি। কেন মিছিমিছি আমাকে তোমাদের ঐ সব ঘোর-প্যাঁচের কথায় জড়াচ্ছো। কেমন চমৎকার শাড়িটা পরেছো। পরী পরী লাগছে। চুপ করে বোসো। তোমাকেই কিছুক্ষণ দেখি। তন্বী, শ্যামা শিখরিদশনা পক্ক-বিম্বাধরোষ্ঠী।

করবীকে খুব উত্তেজিত এবং সেই কারণে আরক্ত দেখাল।

—সত্যি, তোমরা না কিভাবে একটা দেশের স্ট্রাগল ফর সোস্যালিজমকে নষ্ট করে দিচ্ছো, তাই দেখছি। ইনডিভিডুয়ালিস্টিক অ্যাটিচিউড। শামুকের খোল। কিন্তু সুধীন দত্ত পড়েছো তো? অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ থাকে না।

বারীন করবীর আরো কাছে এসে দাঁড়াল। একটা সিগারেট ধরাবার উপক্রম করতে করতেই তীক্ষ্ণ হাসিতে করবীর দিকে তাকিয়ে বললে,

—সুধীন দত্ত? তাহলে শোনো—

তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে
বসেছি বিজনে নব নীপবনে
পুষ্পিত তরুমূলে।

তোমাদের বাড়িতে আজ তপ্‌সে মাছ এসেছে, না?

—সত্যি, বারীন তুমি একেবারে জাহান্নমে চলে গেছ।

—এখনো যাই নি করবী, যাব যাব করছি। তোমার মতো একজন গার্ল-ফ্রেণ্ড পেলে, এই যা পরে আছি, এক বস্ত্রে চলে যেতাম।

উত্তেজনায় সাময়িক বিরতি ঘটল। বাড়ির চাকর চাকা লাগানো দু-থাক ট্রে ঠেলতে ঠেলতে ঘরে এল।

আশ্চর্য, সকলের উপরের থাকে তিনটে প্লেটে দুটো করে তপ্‌সে মাছের বেসমে-ভাজা ফ্রাই। বারীন তপ্‌সে মাছ দেখতে পেয়ে বললে—দেখেছ নাকটা কি রকম সার্প?

করবী বললে,—জানি, তোমার স্বভাবটাই নাক উঁচু।

বারীন খাবারের প্লেটের দিকে হাত বাড়িয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে গুমরে গুমরে সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়ে হাসতে লাগল।

—কি হল হাসছ যে?

—না থাক, একটা কথা মনে এসেছিল। এ বিট্ সিলি। বলব না।

—থাক নিজের যখন এতটা বুদ্ধি হয়েছে, কথাটা সিলি, তাহলে অনুগ্রহ করে সেটা পেটের মধ্যে রেখে দিন। তপ্‌সে মাছ অনেক তপস্যার মাছ। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। খেয়ে ধন্য করুন। সুজিতবাবু নিন।

এতক্ষণ সুজিতের মনে হচ্ছিল করবী বোধ হয় ভুলেই গেছে তার কথা, বারীনের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে।

সুজিত বললে—হ্যাঁ, নিচ্ছি। আপনিও নিন।

—এই তো।

এখন তিনজনেই বেশ কাছাকাছি। বারীন করবীর কাছে। বারীন মশগুল হয়ে মাছ চিবোচ্ছে। তার চোখে মুখে কোন উত্তেজনার ছাপ নেই। হাঁস যেভাবে জল থেকে উঠে গায়ের জল ঝেড়ে ফেলে, বারীনও তেমনি করে একটু আগের উত্তেজনা ঝেড়ে ফেলেছে। পরিতৃপ্ত মুখে মাছ চিবোতে চিবোতে বারীন বললে,

—এই তো চমৎকার। তপ্‌সে মাছের ফ্রাই। তারপর জনি ওয়াকার।

তুমি। ছাপা শাড়ী পরা কী সুন্দর একটি মেয়ে। সন্ধ্যে বেলা। ফ্লোরেসেন্ট টিউবের নীল আলো। বাগান থেকে হাসনাহানা না কিসের যেন গন্ধ আসছে। রেডিওগ্রামে গোটা-ছয়েক অতুলপ্রসাদ কি রবীন্দ্রনাথ চাপিয়ে দাও। দেশী ভাল না লাগে এলভিস প্রেসলি। আর তাকেও যদি রিঅ্যাকশনারী মনে হয় তাহলে বেঠোফেন বাজুক। জানলাগুলো খুলে দাও। চাঁদের আলো আসুক। এই তো জীবন। মোচার ঘন্টর মতো ওয়াণ্ডারফুল। তা নয়, বুর্জোয়া, পেটী-বুর্জোয়া, প্রোলেটারিয়েট···শুকনো কথার চচ্চড়ি। একটা কথা কেন ভুলে যাও করবী, আসলে তুমিও যা, আমি তাই। তফাত আছে সার্টেনলি। তোমার বাবা আছেন। আমার বাবা নেই। আছে কেবল বাবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা। অ্যাম আই রাইট ?

—বারীন, ইফ ইউ এগেন টক্ দিস ননসেন্স আমি সত্যিই তোমাকে মারবো, এ গুড স্ল্যাপ।

—মারলে ডান হাতে মেরো···

—তাতে কি হবে···

—একটা সান্ত্বনা থাকবে। 'তব দক্ষিণ হাতের পরশ করেছ সমর্পণ।'

ঘরে একটা হাসির গুঞ্জন উঠল। হাসতে হাসতে করবী বললে,

—রিয়েলি, য়ু আর এ ফাজিল দ্য গ্রেট।

হাসির শব্দ ঘর থেকে মিলিয়ে যাবার আগে নীচের বাগানে গাড়ির শব্দ হল। নীচের তলার কুকুরের সহসা-উদ্ধত গর্জনে দোতলার মোজেইক মেঝেও ঈষৎ দুলে উঠল যেন। করবী বললে,

—ঐ বাবা এলেন। যাও, বাবার সঙ্গে তোমার কি দরকার সারগে। আমি সুজিতবাবুর গান শুনি।

সুজিত চমকে উঠল যেন।

—আমি কি গান গাইবো ? না, না, আমি ভাল গাইতে পারি না।

আপনি তো বলেছিলেন, আপনাদের বাড়িতে পুরনো বাংলা গানের খুব ভাল কালেকশান আছে। বাজান না, শুনি।

—স্বাতী আসুক। ওটা স্বাতীর ডিপার্টমেণ্ট। সে তো শুনবেনই। তার আগে আপনি একটা গান শোনান।

ওদের কথার মাঝখানে বারীন উঠে দাঁড়াল।

—আমি নীচেয় যাচ্ছি। ড্রিঙ্ক-এর সময় ডেকো।

বারীন চলে গেল। করবী বারীনের চলে যাওয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার সুজিতের দিকে ঘুরে বললে,

—বারীনটা বড় স্ট্রেঞ্জ, তাই না ?

সুজিত মাথা নাড়ল।

ঠিক সেই সময় ঘরের রঙীন পর্দাটা ফাঁক করে একটি কচি বয়সের তরুণীর মুখ উঁকি দিল। আর সেই সঙ্গে গানের মতো কিংবা বাঁশীর মতো মিষ্টি একটা কণ্ঠস্বর।

দিদিভাই। ও, স্যরি।

পর্দাটা পড়ে গেল।

করবী ডাকলে—স্বাতী, আয়।

ঝুমরের শব্দ সঙ্গে নিয়ে স্বাতী ঘরে এল। সুজিত একবার মাত্র তাকিয়েছিল। আর তাকাতে পারল না। যেন বিদ্যুতের মতো দ্যুতিময় কিছু একটা, তাকালে চোখ পুড়ে যাবে। স্বাতী এসে করবীর পাশে বসল। হাতে একটা খাতা আর দু'তোড়া ঝুমুর। নাচের স্কুল থেকে ফিরছে। স্বাতীর হাত দুটো যেন দুধে গড়া।

—আলাপ করিয়ে দি। আমার বোন স্বাতী। আর ইনি সুজিত-বাবু। সুজিত চক্রবর্তী।

—নমস্কার।

—নমস্কার।

—আপনার কথা দিদির কাছে কিছু কিছু শুনেছি। আপনার তো আরও আগে আসার কথা ছিল। তাই না দিদিভাই ?

সুজিত কি বলবে বুঝতে পারল না। তার গলা কাঁপছে।
স্বাতী যে কথাগুলো বলল সেগুলো যেন কথা নয়, টানা টানা এক রকম গানের মতো জিনিস। মানুষের, মানে মেয়েদের এমন অলৌকিক কণ্ঠস্বর সুজিত কখনো শোনে নি। সুজিতের মনে হল তার গলার আওয়াজ এই মুহূর্তে এই ঘরে একেবারেই বেমানান ঠেকবে।
সুজিত কোন কথা না বলে সলজ্জ হাসল। তাও মাথা নীচু করে।
স্বাতী সুজিতের দিকে তাকিয়ে বললে,
—আপনি তো কবিতাও লেখেন, তাই না ?
— সুজিত এবার চোখ তুলে তাকাল।
—আমি ? না, আমি কবিতা লিখি না।
—তাহলে ? তুই যেন কার কথা বলতিস দিদিভাই—কবিতা লেখেন।
—সে অন্য। শ্যামল সেনগুপ্ত।
—ওঃ।
—সুজিতবাবু খুব ভাল গান জানেন।
ওঃ, তাই বুঝি। বাঃ, আমাদের তাহলে গান শোনাচ্ছেন তো ?
এক একটা কণ্ঠস্বরের মধ্যে ফুলের পাপড়ির মতো এমন স্বচ্ছ কোমলতা থাকে, যাকে আঘাত দিতে, ছিঁড়তে কষ্ট হয়।
সুজিতকে শেষ পর্যন্ত গান গাইতে হল।
গানের আসর বসল স্বাতীর ঘরে। স্বাতীর ঘরে ঢুকে সুজিতের বুকের মধ্যে একটা অস্পষ্ট অকারণ যন্ত্রণাবোধের শুরু হয়েছিল। পালকের মতো নরম সোফায় বসে সুজিত সারা ঘর, ঘরের ছোট বড় সৌখীন মূল্যবান আসবাবপত্রের দিকে তাকিয়ে কেবল বার বার ভাবছিল—কি স্বচ্ছন্দ, নিরাপত্তা ! কি মোলায়েম জীবন এদের। কত বিপুল অপচয় অপব্যয়ের ভিতর দিয়ে এরা প্রতিদিন মনের মতো সুখে বাঁচছে।

এদের জীবনে অভাব নেই, অনিশ্চয়তা নেই, আতঙ্ক নেই, উদ্‌বেগ নেই।

আর এই সব ভাবনার ফাঁকে ফাঁকেই সুজিত মনে মনে বার বার উচ্চারণ করছিল,

—কারণ এদের বাবা আছে। আমার বাবা নেই।

সুজিত আবার নিজের চিন্তাকে সামলে নিয়ে মনে মনে বলতে লাগল—বাবা নেই। কথাটা ঠিক নয়। বাবা আছেন। তবে এদের মতো বাবা নেই। থাকলে···

সুজিতের মনে পড়ছিল তার মায়ের মুখ।

আমার মায়ের মুখ দেখলেও মনে হয় না পৃথিবীতে কোথাও অভাব আছে, দুঃখ আছে, অনিশ্চতা, আতঙ্ক আছে। মা যেন কি মন্ত্র জানেন। আকণ্ঠ দুঃখের মধ্যে ডুবে থেকেও কি করে যেন পারেন মুখে দিব্য একটা সুখের ভাব শান্তির আভাস ফুটিয়ে রাখতে। আত্মীয় বাড়ি থেকে কোন একটা উপলক্ষে উপহার-উপঢৌকন হিসেবে অতিরিক্ত একটা শাড়ী পেলে মায়ের মুখ যেন কী বিরাট একটা প্রাপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অথচ সেই মা যখন তালি দেওয়া শাড়ী পরে দিন কাটায়, কখনো তাঁর মুখের রেখায় দারিদ্র্যের দৈন্যের আঁধার আঁচড় কাটে না। কখনো কখনো একান্ত নিভৃতে যখন মায়ের সঙ্গে কথা বলেছি, বুঝতে পেরেছি, মা আমার ওপর অনেক আশা রাখেন। কে যেন তাঁর কোষ্ঠী বিচার করে বলেছে, শেষ বয়সে তিনি সুখী হবেন। তাইই যদি সত্যি হয়, তাহলে কে তাকে সুখী করতে পারে। একমাত্র বোন ছিল, বিয়ে হয়ে যাবে। এক লটারী, আরেক দৈবঘটনা ছাড়া বাবার পক্ষে দুর্ভাবনাহীন সুখের সংসার গড়ে তোলার চিন্তা অলীক।

মায়ের সঙ্গে যখন কথা বলি, মা যখন ছোট ছোট দুঃখ বেদনার কথা বলতে থাকেন, মায়ের শান্ত সংযত কণ্ঠ যখন কোমল ব্যথায় অন্তর্বাহী আঘাতে গোপন কান্নার মতো বাজতে থাকে, তখন বুকের মধ্যে,

আমার মনের মধ্যে, আমি যেন কি প্রবল সাড়া অনুভব করি। আমাকে বড় হতে হবে, দায়িত্ববান হতে হবে, কৃতি হতে হবে। সাধারণ মানুষের মতো কোলাহলের ভিড়ে হারিয়ে যাব না আমি। পৃথিবীতে বাঁচার জন্যে সুখের জন্যে কত আয়োজন, কত উপকরণ। কত বিলাস সামগ্রী। আপন যোগ্যতায় আমিও হবো সে-সবের অধিকারী। লোকে বলবে, হ্যাঁ, অমুকের ছেলে একটা ছেলের মতো ছেলে। বাবা মনে মনে তৃপ্ত হবেন। মা'র মুখের হাসি তাঁর কপালের সিঁদুরের মতো রাঙা হয়ে উঠবে। মা সন্ধ্যেবেলায় ঈশ্বরকে প্রণাম করার সময় বলবেন,—ঠাকুর, তুমি আমাকে অনেক দিয়েছ।

মায়ের মুখের দিকে তাকালে মনের মধ্যে এই রকম প্রবল ইচ্ছার ঢেউগুলো দুলতে থাকে।

আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি জাগে।

কিন্তু কলকাতায় এলে সেই ফোলা বেলুনটা চুপসে যায়। ভবিষ্যৎকে নিয়ে ভাবনার কথা মনে থাকে না। শুধু বর্তমান। শুধু ভিড়ে মিশে হাঁটা।

স্বাতী বেশ কিছুটা দূরে বসে আছে। শাড়ী পরেছে। খাটো ব্লাউজ। দীর্ঘ অনাবৃত হাত। মসৃণ। যারা অর্থবানের ঘরে জন্মায়, তাদের সকলেরই হাত এরকম হয়। সবিতাদির হাতও সুন্দর। কিন্তু এরকম নয়। সবিতাদির হাতে টীকের দাগ আছে। আঙুলের নখগুলো ঈষৎ খয়ে গেছে।

গান আরম্ভ হয়েছিল স্বাতীর মা ঘরের ঢোকার পরে।

স্বাতীই তাঁর সঙ্গে সুজিতের আলাপ করিয়ে দিল।

স্বাতীর মায়ের সমস্ত অবয়বে এমন এক উজ্জ্বলতা ছিল, সুজিতের ইচ্ছে করেছিল পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে হাত তুলেই নমস্কার করল। সুজিতের মুখোমুখি একটা

সোফায় তিনি বসলেন। গান আরম্ভ হবার আগে খুব সামান্য একটু কথাবার্তা হল দুজনের মধ্যে।

স্বাতীর মাকে দেখে, তাঁর কথা শুনে সুজিতের মনে এই-রকম একটা ধারণা হল, তিনি অতি সাধারণ পরিবারের মেয়ে। অর্থবান স্বামীর সংসারে এসে নিজেকে সময়, সমাজ, ফ্যাশান, আদব-কায়দায় অভ্যস্ত করেছেন ধীরে ধীরে। অনেকটা লক্ষ্মী-প্রতিমার মতো গোলাকার শান্ত, সরল, ব্যক্তিত্বহীন গ্রাম্য মুখে গাঢ় লিপস্টিক এবং পেন্সিলে আঁকা ঘন ভুরু তাঁকে যেন মানাচ্ছিল না। হয়তো এটা তাঁর নিজের স্বভাবের সঙ্গেও খাপ খায় না। তবু যেহেতু স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন পার্টিতে যেতে হয়, তাই তিনি মুখের ওপর মুখোশ চাপান।

—গান আরম্ভ করল সুজিত। যে গানটা তার প্রথমেই গাইতে ইচ্ছে করেছিল, সেটা সে গাইল না।

স্বাতী বসে আছে দূরে, চুপচাপ, তার পড়ার টেবিলের কাছে। স্বাতী বেশী কথা বলে না। স্বাতী বেশী চলা-হাঁটা করে না। স্বাতী জোরে হাসে না। দীর্ঘ, আয়ত তার দৃষ্টি, যাকে লোকে বলে পটল-চেরা চোখ। অথচ স্বাতী কোন দিকেই বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকে না। সব সময়ই তার চোখ, তার চিন্তা যেন নিজের দিকে নিমগ্ন। নিজের মধ্যেই সে যেন কিছু খুঁজছে, কিছু গড়ছে, দেখছে, শুনছে, বুনছে। দেহময় লাবণ্য নিয়েই সে যেন বিষণ্ণতার বন্দিনী। সুজিত ভেবেছিল প্রথমেই গাইবে—

—বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে···।

কিন্তু সুজিত গাইলো না। মনে হবে, সবাই ভাববে, স্বাতীকে উপলক্ষ্য করেই গানটা গাইলো সে। মুখে গাইতে পারল না। কিন্তু মনে মনে গাইতে লাগলো। তাঁর গলা দিয়ে যে গানটা বেরুল সেটা অন্য। গানের মাঝখানে বেয়ারা এসে একটা ট্রেতে তিন গ্লাস হুইস্কি রেখে গেল। গান শুরু করার পর সুজিত ভেবেছিল করবী এবং

বারীন এ-ঘরে আসবে। এল না। অথচ গাইতে-গাইতেই সুজিত যেন অনুভব করছিল পাশের ঘরে বারীন ও করবী কথা বলছে। গানের মাঝখানে সুজিত আরও একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করছিল। স্বাতী বার বার তার দিকে তাকাচ্ছিল। হাতে একটা মোটা বাঁধানো খাতা। হাতের পেন্সিলটা বার বার নড়ছে। স্বাতীর মা, দু-একবার স্বাতীর দিকে সেই সময় তাকিয়ে দেখেছেন। মৃদু হেসেছেন। সুজিত তখনো কিছু বুঝতে পারে নি।

গান শেষ হল।

স্বাতীর মা বললেন,—ভারী মিষ্টি গলা। কী সুন্দর গাইলে।

স্বাতী বললে,—অথচ বলছিলেন গান জানেন না।

স্বাতীর মা টি-পয়ের দিকে তাকালেন।

—হ্যাঁরে, আমাকে আবার দিয়ে গেল কেন? আমি তো এইমাত্র পার্টি থেকে ফিরলুম। তুমি আর একটু নেবে নাকি সুজিত? আমি খাব না।

সুজিত গ্লাস তিনটের দিকে তাকাল। একটা গ্লাসে হুইস্কির পরিমাণ একটু বেশী। সুজিত বুঝল, এটাই তার। গ্লাস তিনটে দেখে সুজিতের লজ্জা করছিল। অথচ স্বাতীর মায়ের কণ্ঠস্বর কি শান্ত, সহজ। গ্রামে তার মা তাকে যেভাবে মুড়ি কিংবা ভাত খেতে বলেন তেমনি করেই স্বাতীর মা অনুরোধ করলেন মদ খেতে। নিজে খেলেন না। উঠে যাওয়ার আগে তিনি সহাস্যে স্বাতীর দিকে তাকালেন।

—কি রকম আঁকলি, দেখি।

স্বাতী লজ্জায় নত হল।

—স্কেচের মতো হয়েছে। পোট্রেটটা আসে নি।

স্বাতীর মা খাতাটা নিজের হাতে নিয়ে দেখলেন। তারপর সুজিতের দিকে তাকিয়ে খাতায় আঁকা ছবির সঙ্গে একবার সেটা মিলিয়ে নিয়ে বললেন,

—তোমার ছবি।

—আমার ?

সুজিত চমকে উঠলো বিস্ময়ে।

—আমার এই ছোট মেয়েটির খুব ছবি আঁকার সখ। এই তো, ঐ ছবিটা, এইটা ওদিকের ঐটা ওসব ওর নিজের হাতে আঁকা।

সুজিত ঘাড় এবং চোখ ঘুরিয়ে ছবিগুলো দেখল। ছবিগুলো সবই কোন না কোন বিখ্যাত শিল্পীর অনুকরণ। তবু ভাল।

—তোমরা বোসো, গল্প কর। আমি আসি।

স্বাতীর মা চলে গেলেন।

বেশ কিছুক্ষণের স্তব্ধতা কাটিয়ে সুজিত বললে,

—আমার ছবি আমাকে দেখাবেন না ?

—ভাল হয় নি।

—আমি যেমন তেমনই তো হবে।

—না। আমি যে অ্যাঙ্গেল থেকে আঁকছিলাম, তাতে ভাল আসছিল না পোট্রেটটা।

স্বাতী খাতাটা নিয়ে সুজিতের সামনে এসে যেখানে একটু আগে তার মা বসেছিল, সেখানে বসল। সুজিত স্বাতীর হাত থেকে খাতাটা নিয়ে দেখতে লাগল।

নিজেকে চিনতে অসুবিধে হল সুজিতের। পাশ থেকে দেখলে তাকে কেমন দেখায় সে তো তার নিজেরও জানা নেই। তবু কিছু কিছু আভাস আছে ছবিতে, যা সুজিতের নিজস্বতা প্রকাশ করছে। মাথার এলোমেলো চুলগুলো আর খাড়াই নাক দুটো মেলে।

স্বাতীর হাতে খাতাটা ফিরিয়ে দিয়ে সুজিত বললে,

—এটা আমাকে দিয়ে দিন।

—না, না। কিছু হয় নি। লোকে দেখলে আমারই নিন্দে করবে।

—লোকে দেখবে কেন ? শুধু আমি দেখবো।

—আপনি খান।

স্বাতী হুইস্কির গ্লাসটা এগিয়ে ধরল সুজিতের দিকে।

—আপনি নিন।

—নিচ্ছি।

—ছবিটা কিন্তু সত্যিই আমাকে দেবেন। আমি নিয়ে যাবো। একটা স্মৃতিচিহ্ন থাকবে।

স্বাতী হঠাৎ কলকল করে হেসে উঠল। সমস্ত শরীরটা দুলে উঠল উচ্ছল ঢেউ-এর মতো। কাঁধের উপরে আলতো করে রাখা শাড়ীর আঁচলটা পড়ল খসে। স্বাতীর সুগঠিত, সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত শরীরটা যেন হঠাৎ সুজিতের চোখের সামনে একটা কুসুমের মতো বিকশিত হয়ে উঠল। আগে দেখা যায় নি, এখন দেখা গেল স্বাতীর গলায় সাদা পুঁতির হার। স্বাতীর গলাটা দীর্ঘ, মরালের মতো। গলা থেকে বুকের ওপর পর্যন্ত অংশ অনাবৃত। গায়ের সঙ্গে আঁটো করে লাগানো খাটো জামার রংটা ফিকে বেগুনী। এক পলকের এই দেখা যেন ঘন অন্ধকারে একটা বিদ্যুৎ ঝলক। একটা অপরিচিত জগতের আকস্মিক উন্মোচন।

স্বাতী আবার শাড়ীর স্খলিত অংশটা কাঁধে তুলে দিল। হাসির রেখা তখনো মুখ থেকে মিলিয়ে যায় নি।

—হাসলেন কেন?

—আপনি বুঝি আর কখনো আমাদের বাড়িতে আসবেন না?

—তা তো বলি নি।

—তবে কি আমি কোথাও চলে যাবো?

—তা কেন হবে।

—তবে যে বললেন স্মৃতিচিহ্ন।

সুজিত মৃদু বোকা বোকা হাসি হাসল।

—আমি ওসব কিছু ভেবে বলি নি। তবে, আমি তো আর নাও আসতে পারি।

—কেন আসবেন না?

—আজ হঠাৎ এসে গেছি। বারীন আমাকে কিছু না বলে হঠাৎ নিয়ে এসেছে।

—এমনি করেই হঠাৎ একদিন চলে আসবেন। বারীনদা তো প্রায়ই আসছে আজকাল। মাঝে কিছুদিন আসছিল না। ওদের বোধহয় ঝগড়া মিটে গেছে।

—কাদের ?

—দিদি আর বারীনদা। মাঝে মাঝে ঝগড়া হয়। আবার ভাব।

—আপনার হয় না ?

—কি ?

মাঝে মাঝে ঝগড়া।

—কার সঙ্গে।

—কারো সঙ্গে।

স্বাতীর মুখে ঈষৎ লজ্জা ছড়াল। কিন্তু অতি সুস্পষ্ট তার উচ্চারণ।

—না।

সুজিতের শরীরের রক্ত কিংবা অস্থি মজ্জা কিংবা কলকব্জার ভিতরে আবার ধীরে ধীরে হুইস্কির প্রতিক্রিয়া ঘটতে শুরু করেছে। ঝিনঝিন করতে শুরু করেছে মাথাটা। একই সঙ্গে অবসাদ ও উত্তেজনা তাকে অবশ ও অস্থির করে তুলতে চাইছে। হঠাৎ তার মাথার মধ্যে ঝনঝন করে কি যেন বেজে উঠল। এখনো বাজছে। তার শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে কোন মহাউল্লাসে, আদিম মানুষেরা শিকারে যাওয়ার আগে যেমন মেতে উঠতো কাড়া-নাকাড়ার তাণ্ডবে! যেন একসঙ্গে একশ, কি একহাজার লোহার শিকল তার শরীরের ভিতরে কোথাও কে যেন ভাঙছে, মাথার মধ্যে তারই প্রতিধ্বনি।

স্বাতী উঠে গেল তার বিছানার দিকে। সুজিত দেখল স্বাতী তার বিছানার কাছের একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে টেলিফোন ধরল। এ ঘরেও যে একটা টেলিফোন আছে সুজিত দেখে নি। সুজিত

এতক্ষণে সজাগ হল তার মাথার ভিতরকার ঝনঝনানি শব্দটার উৎস সম্পর্কে। স্বাতী কথা বলতে লাগল ফোনে।

—হ্যাঁ, কথা বলছিরে, বল, তোর গগল্‌স ? কই নাতো, হ্যাঁ, একবার পরেছিলুম, তারপর তো দিয়ে দিলুম তোকে, না, কই আমি তো দেখি নি, ছ্যাখ, অন্য কেউ হয়তো ভুল করে নিয়ে গেছে, হ্যাঁ, হতে পারে, ছ্যাখ না ফোন করে, পেয়ে যাবি, পেয়ে যাবি, না, গল্প করছিলুম, তুই চিনবি না, না, যাঃ ফাজিল কোথাকার আচ্ছা, রাখি, ও কে, গুড নাইট।

স্বাতী আবার আগের জায়গায় ফিরে এসে বসল। গ্লাসে মৃদু চুমুক দিল। সুজিতের গ্লাসটা প্রায় শেষ হতে চলেছে। সুজিত সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিল। মাথাটা ঈষৎ হেলানো পিছন দিকে। স্বাতী সুজিতের দিকে তাকিয়েছিল।

—শরীর খারাপ লাগছে ?

স্বাতীর সাড়া পেয়ে সুজিত আবার সোজা হয়ে বসল দ্রুতগতিতে।

—না!

স্বাতী সুজিতকে দেখছিল। সুজিত দেখল স্বাতী তাকে দেখছে। একসঙ্গে সমস্ত জগৎটাকে দেখতে পাবে এত বিশাল নয়ন তার। যেন এই মুহূর্তে সুজিতের বাইরের এবং ভিতরের সমস্ত কিছু স্বাতী দেখতে পাচ্ছে।

ওর কাছে কিছু লুকনো যাবে না। দেখতে পাচ্ছে আমার এই বাইরের নম্র শান্ত স্বভাবের ভিতরে লুকিয়ে আছে একটা লোভী মন, একটা ক্ষুধিত আত্মা, এমন একটা ধূর্ত জন্তু যে একটু সুযোগ পেলেই কামড়াবে।

সুজিত হঠাৎ প্রশ্ন করল,

—কে ফোন করেছিল ?

—আমার এক বন্ধু।

—ছেলে ?

স্বাতী হাসল।
—না, মেয়ে।
—আপনার কোন পুরুষ বন্ধু নেই ?
—না।
—আমাকে আপনার বন্ধু করবেন ?
সুজিতের কণ্ঠস্বর করুণ। সাদা দাঁতে স্বাতী আবার হাসির মুক্তো ফোটাল।
— আপনি হাসছেন ? কেন আমি আপনার বন্ধু হতে পারি না ?
স্বাতী আরও খলখলিয়ে হেসে উঠল। সুজিত লজ্জা পেল না।
—হয়তো পারি না। কেননা আমি খুব সাধারণ পরিবারের ছেলে। খুব সাধারণ। এত সাধারণ যে আপনাদের কাছে আমি একটা তৃণ। তৃণও বলতে পারেন, খড়কুটোও বলতে পারেন। যেটা আপনার ভাল লাগে, সেটাই।
—সুজিতে কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসছে। অসংলগ্ন বাক্য। সুজিত বুঝতে পারছে সে ঠিকমতো কথা বলতে পারছে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তবু অনেক কথা তার কণ্ঠনলী দিয়ে বেরিয়ে আসছে। হৃদয়ের অন্তর্গত একটা বিপুল উত্তেজনা সেই কথাগুলোকে সাহায্য করছে বেরিয়ে আসতে।
—আপনি আমার বন্ধু হলে, তুমি বিশ্বাস কর স্বাতী···সত্যি, আমার অল্প অল্প নেশা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি মাতাল হই নি, আজকেই প্রথম মদ খেলাম তো, সেইজন্যে মাথাটা ঘুরছে, আচ্ছা এ ঘরে ফ্যান নেই, একটু চালিয়ে দিলে বোধহয় ভাল লাগত, আমি কারো ক্ষতি করি না, আমি যদি হিংস্র হই, কিংবা কামড়াই, কামড়াতে যাই, আমাকে একটা শক্ত চেন দিয়ে বেঁধে রাখলেই, আমি ঠিক শান্ত হয়ে যাবো, তুমি ভীষণ মিষ্টি মেয়ে, দেখা মাত্রই আমার মনে হয়েছে, আমার এই রকম একটা বন্ধু থাকা দরকার ছিল, আমি

পাই নি, সাধারণ ঘরের ছেলে তো, তাই অনেক কিছুই পাই নি, অথচ জানো, স্বাতী···স্বাতী...

আঠা দিয়ে আটকানো চোখের পাতাগুলোকে টেনে খুব স্পষ্ট করে তাকিয়ে সুজিত দেখতে পেল স্বাতী ঘরে নেই। সুজিতের কিরকম একটা ভয় ও ভাবনা হতে লাগল। এই ঘর, যার সবটাই অপরিচিত, এখানে কি কেউ তাকে বসতে বলেছিল, নাকি সে ঢুকে পড়েছে। কে তাকে এখানে এনেছিল ? স্বাতী নামের একটি মেয়ে, যার হাতে কোথাও দাগ নেই। হাসলে যার গালে ঈষৎ টোল পড়ে, যার চোখ বিদ্যুতের শিখার মতো, যার গলা থেকে বুকের কিছুটা অনাবৃত অংশের সুষমা গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহরের মতো এমন জ্বলন্ত যে সমস্ত হৃদয় মরুভূমির মতো তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে, সেই স্বাতী, সেই মেয়েটি···

স্বাতী উঠে এসেছিল পাশের ঘরে। যে ঘরে বারীন ও করবী গল্প করছিল, খুব নিবিড় হয়ে। স্বাতীকে দেখেও বারীন করবীর পিঠ থেকে হাতটা নামাল না। স্বাতী করবীকে বললে,

—দিদি, একবার আমার ঘরে আয়।

—কেন ?

—সুজিতবাবু খুব ইন্‌টক্সিকেটেড হয়ে পড়েছেন।

—তাই নাকি ? এই বারীনটাই ওকে পাকাবে। একটা ভাল-মানুষের ছেলে, চল—

ওরা তিনজনে স্বাতীর ঘরে সুজিতের সামনে এসে দাঁড়াল।

সুজিত সোফায় মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজিয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে তার গলা থেকে অস্পষ্ট উচ্চারণে কতকগুলো এলো-মেলো কথা শোনা যাচ্ছে।

—আমি তো কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করি নি। যে যার নিজের মতো করে বাঁচ না বাবা। আমি কোথায় গেলাম, কি করলাম, তা নিয়ে এত মাথা ব্যথা কেন ? তোমরা সবাই বুঝি সাধুপুরুষ,

ধোয়া তুলসী পাতা? তুমিও তো অদ্ভুত সবিতাদি, একটা কিছু রটলেই তা বিশ্বাস করবে? রাগ করবে। আমি কি রামায়ণের সীতা, যে আমাকে একটা গণ্ডীর মধ্যে থাকতে হবে? আমি থাকবো না। আমি আমার খুশী মতো বাঁচবো। যেহেতু আমি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, আমার জন্যেই যত নীতিকথা, হিতোপদেশ, ঈসপ্‌স ফেবল। আমার বুঝি কোন কান্না নেই, কষ্ট নেই।

বারীন করবীর দিকে তাকিয়ে হাসল। স্বাতী হাসল না। বারীন গলাটাকে ভারী করে ডাকল,—সুজিত।

সুজিত তাকাবার চেষ্টা করল। চোখ খুলল না। আবার ডাকল বারীন। এবারে গায়ে ঝাঁকুনী দিয়ে।

সুজিত ঈষৎ সোজা হয়ে বসল।

—কে?

চোখ মেলতেই সুজিত স্বাতীকে সামনে দেখতে পেল।

স্বাতীর চেহারাটা আগের মতো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না আর। এখন ছায়া ছায়া ভাব। স্বাতীর পাশে আরো দুটো ছায়া ছায়া চেহারা। সুজিতের ঘাড়ের কাছে, খুব জোরে না হলেও, একটা চাপড় মারল বারীন। বেশ বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলল,

—কিরে হতভাগা! বাথরুমে যাবি? বমি হবে?

কণ্ঠস্বর শুনে সুজিত বুঝল বারীন। বারীন তার পাশে এসেছে বুঝতে পেরে অনেকটা যেন বল ফিরে পেল।

—বারীন?

—হ্যাঁ, তোর যখন অভ্যাস নেই তখন ঢক্‌ঢক্ করে অতটা খেতে গেলি কেন? ও-সব জিনিস ধীরে সুস্থে খেতে হয়। নলেন গুড়ের পায়েস নয়।

—বারীন, তুই আমাকে কিছু বলিস না। আমি নিজের মনে কষ্ট পাচ্ছি। সত্যি বলছি, আমি একটুও মাতাল হই নি। শুধু মাথাটা

যেন কেমন ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু আমার জ্ঞান আছে। আমি তোকে, আমাকে কি করতে হবে বল, আমি করছি।

—কিছু করতে হবে না, চল মেসে পৌঁছে দি চল।

—কেন, মেসে কেন, আমি এখানে আর একটু থাকি না। আমি তো কারো ক্ষতি করছি না। এই সোফাটায় একটু হেলান দিয়ে আমি যদি ঘুমোই। আমার ঘুম পাচ্ছে বারীন।

—একেবারে মেসে গিয়ে ঘুমোবি চল।

করবী বললে,—কিসে যাবে ?

—একটা ট্যাক্সি ডেকে নেবো।

—আমাদের গাড়িটাই যাক। মেসে পৌঁছে দিয়ে আসবে। ট্যাক্সি ধরতে গেলে অনেকটা হাঁটতে হবে। অতটা হাঁটতে পারবে তো ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারবে। ওর কিচ্ছু হয় নি। গায়ে বাতাস লাগলেই কমে যাবে।

করবী স্বাতীর দিকে প্রশ্ন করল,

—অনেকখানি খেয়েছেন নাকি ?

—না, না। সামান্যই তো!

বারীন বললে,—অল্পেই আউট হবে। ওর যে আজকেই হাতেখড়ি।

সুজিত যেন ঘুমিয়ে পড়ার মতো আচ্ছন্ন। বারীন তাকে হাত ধরে তুলতে গেল। করবী বাধা দিলে।

—থাক, একটু পরে ডেকো। ফ্যানটা খুলে দি। এই সময়ে গাড়ির ঝাঁকুনিতে সত্যি-সত্যিই বমি হয়ে যেতে পারে।

সুজিত স্পন্দনহীন। একটু দাঁড়িয়ে থেকে করবী ও বারীন চলে গেল। স্বাতী ঘরের সাদা বাল্‌ব নিভিয়ে নীল আলোটা জ্বেলে দিল। ঘরটা রূপকথার দেশের মতো একটা নীল রঙের ছবি হয়ে গেল।

স্বাতী গিয়ে বসল তার পড়ার টেবিলে।

পাশের ঘরে করবী রেডিওগ্রামে লংপ্লেইং রেকর্ড চাপাল। জাজ

এগার

পরের দিন সকালে সুজিতের ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। ঘুম ভেঙে দেখল টেবিলে প্লেটে ঢাকা দেওয়া চায়ের কাপ। জুড়িয়ে বরফ। মেসের রুমমেটরা স্নানের জন্য তৈরী হচ্ছে। জান্‌লার বাইরে পৃথিবীটা রোদে জ্বলছে। রুমমেটদের দু-একজন সুজিতকে নানারকম উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করল। সেই সব প্রশ্ন থেকে সুজিত বুঝে নিল কতকগুলি না-জানা তথ্য।

কাল অনেক রাত্রে মেসে ফিরেছে সে। একটা কালো অ্যামবাসাডর গাড়ি এসে তাকে মেসে পৌঁছে দিয়ে গেছে। গাড়িতে সুজিত ছাড়া ছিল একটি যুবক ও যুবতী। অর্থাৎ বারীন ও করবী। স্বাতী নিশ্চয়ই সুজিতের সঙ্গে আসবে না। স্বাতী শিল্পী। স্বাতীর একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে। স্বাতীকে করবীর বোন বলেই মনে হয় না। সে যাই হোক, গাড়ি থেকে তাকে যুবকটিই এই ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গেছে। সারারাত সে খায় নি। তা ছাড়া কাল বিকেলে আর এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। অর্থাৎ সবিতাদি। তার দেখা না পেয়ে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন। সে চিঠিখানা পরেশ রেখেছে সুজিতের পড়ার টেবিলে, একটা ইংরেজী বইয়ের ভিতরে। এ ছাড়া কাল বিকেলের ডাকে তার নামে এসেছে একটা পোস্টকার্ড। দুটো চিঠি একই জায়গায় আছে।

সাধন নীচে যাচ্ছিল। সুজিত তাকে অনুরোধ করলে নীচে এক কাপ চা বলে দিতে। বাসি মুখে এক কাপ চা না খেলে তার গা-হাতের জড়তা ছাড়ে না। আজ তো, বিশেষ করে, জড়তার পরিমাণ কিছুটা বেশী।

সুজিত বইয়ের ভেতর থেকে দুটো চিঠি বার করল। পোস্টকার্ডটা লিখেছেন তার বাবা।

দীর্ঘজীবেষু

কল্যাণীয় সুজিত,

তুমি এখান হইতে কলিকাতায় গিয়া কোন পত্রাদি দাও নাই। আশা করি ভগবৎ কৃপায় তুমি কুশলে আছ।

গত পরশুদিন কল্যাণীর ভাবী শ্বশুরবাড়ি হইতে লোক মারফত সংবাদ আসিয়াছে, তাঁহারা এই মাসের ১৭ই তারিখে বিবাহের দিন স্থির করিয়াছেন। এ ব্যাপারে আমাদেরও সম্মতি আমরা জানাইয়া দিয়াছি। বিবাহের পাঁচ-ছয় দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছুটি লইয়া তুমি দেশে চলিয়া আসিবে। এছাড়া আরও একটি বিশেষ কারণে তোমাকে পত্র দিতেছি। তোমার মেজকাকা আগামী সপ্তাহের গোড়ার দিকে কলিকাতায় যাইবেন, কল্যাণীর গহনা ও অন্যান্য কেনাকাটার ব্যাপারে। তুমি ঐ সময় তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিও।

এখানকার অন্যান্য খবরাদি কুশল। তোমার মায়ের চার-পাঁচ দিন আগে একদিন রাত্রে হঠাৎ বাতিক-জ্বর হইয়াছিল। এখন ভাল আছেন। কল্যাণী ও তোমার অন্যান্য ভাইবোনেরা একপ্রকার ভালই আছে। ইতি—আশীর্বাদক

তোমার বাবা।

চা এল। চা খেতে খেতে সুজিত সবিতার চিঠিটা পড়তে শুরু করলে। চিঠির উপরে শিরোনামায় লেখা—It is dark and I am alone.

সুজিত,

সারা সন্ধ্যে কোথায় উড়ে বেড়াচ্ছ আড্ডা দিয়ে? কাল সারাদিন যাও নি কেন? আজ সন্ধ্যেয় তোমার মেসে এসেছিলুম। ভেবেছিলুম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেসেই ফিরবে।' তোমাকে সঙ্গে করে

নিয়ে যাব। তুমি জান, আমি কি রকম একা! কাল থেকে ভীষণ ভাবে খুঁজছি তোমাকে। একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে। তোমাকে না-বলা পর্যন্ত আমার রেহাই নেই।

কাল সকালে বিরামের একটা চিঠি পেলাম। দিল্লী থেকে লিখেছে। আমাদের বিয়ের পর বিরাম আমাকে বোধ হয় এই তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বার চিঠি লিখল। আমি এতটা আশাই করি নি। ওদের কনফারেন্স শেষ হয়ে গেছে। বিরাম খুব ভাল করে দিল্লী হায়দ্রাবাদ-অজন্তা ইলোরা এগুলো দেখে কলকাতায় ফিরবে। আমার খুব কষ্ট হবে একা থাকতে, তাই ওর দূর সম্পর্কের এক ভাইকে কাছে এনে রাখতে বলেছে। এর পর আর যা যা কথা, তা আমাদের ব্যক্তিগত। তুমি এলে চিঠিটা পড়বে। আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেছি, আমাকে ও চিঠি লিখেছে। তার চেয়ে আশ্চর্যের কথা, অজন্তা-ইলোরার শিল্পকলা দেখার বাসনা এখনো ওর মধ্যে মরে যায় নি। হয়তো এটাও ঠিক, কলকাতায় ফিরে এই নিয়ে ও একটা বই লিখবে, এরকম পরিকল্পনা মাথায় নিয়েই ঘুরছে। নিদেনপক্ষে খবরের কাগজে ধারাবাহিক ফিচার। কিন্তু তবুও ওর চিঠিতে কোথাও কোথাও আমি যেন একটা একা, বিষণ্ণ, সঙ্গীহীন, ক্লান্ত মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, যা বহু দূর থেকে ভেসে আসছে বলে ক্ষীণ কিন্তু আন্তরিক।

বিরাম যদি আর কলকাতায় না ফেরে, কিংবা আরো দীর্ঘদিন কলকাতার বাইরে থাকে আর আমাকে ও এই রকম আন্তরিক স্বরে চিঠি লেখে আমি ধন্য হয়ে যাব। বুঝবো বিরামের কাছে আমার অস্তিত্বের মূল্য এখনো নিঃশেষ হয়ে যায় নি। দূরে গেলে আমাকে তার মনে পড়ে।

চিঠির একটা জায়গায় লিখেছে, ফতেপুর সিক্রী আর পুরনো দিল্লী এই দুটো দেখা হয়েছে। আমি সঙ্গে থাকলে নাকি খুব ভাল হত। ওখানে একজন বোম্বাই সাংবাদিকের সঙ্গে খুব আলাপ

হয়েছে। বয়স্ক ভদ্রলোক। কিন্তু ভারী রসিক। কথায় কথায় শের আওড়ান। জ্যোৎস্না রাতে পুরনো দিল্লীর পথে একদিন ভদ্রলোক হঠাৎ বিরামকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি বিবাহিত? বিরাম জবাব দিল—হ্যাঁ। ভদ্রলোক একটা শের আওড়ালেন। যার অর্থ হল—যখন কবরে যাবে একা যেও। কিন্তু হে রসিক, যখন বিদেশে যাবে সঙ্গে নিও প্রেয়সীকে। নতুবা শয়তান তোমাকে হাত ধরে অন্যের ভুল আঙিনায় টেনে নিয়ে যাবে।

এগুলো তো কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমার কাছে এগুলো কথার চেয়ে অনেক বেশী। বিরাম কথা বলতেই ভুলে গেছল।

তুমি কখন আসছো? রাত্রি আট-সাড়ে আটটার মধ্যে মেসে ফিরলেও চলে এসো। তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। আমার এখনকার জীবনের যা কিছু সুখ, যা কিছু আনন্দ তার মূলে তুমি। তুমি আমাকে বন্ধুত্ব দিয়ে বাঁচিয়েছো বলেই আমার এই মনটুকু আজও বেঁচে আছে, যা দিয়ে আমি বিশ্বাস রাখি প্রত্যেকটা কালো রাত্রির শেষে একটা করে সূর্যকরোজ্জ্বল ভোরবেলা আছে।

আর দুদিন বাদে আমাদের কনফারেন্স শুরু হচ্ছে কলকাতায়। ভেবেছিলাম দূরে থাকবো। এখন ঠিক করেছি যোগ দেব এবারের আন্দোলনে।

কলমে কালি ফুরিয়ে এসেছে। শেষ করছি। আসবে।

তোমার সবিতাদি।

কিছুক্ষণ পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে সুজিত অনেক কিছু ভাবল। নানা রকম অসংলগ্ন ভাবনা।

সবিতার কথা। করবীদের বাড়িতে কাল রাত্রির কথা। স্বাতীর কথা।

নেশার ঘোরে স্বাতীর সঙ্গে সে যে কি সব কথা বলেছে মনে পড়ছে না।

স্বাতী কি তাকে ঘৃণা করবে সে জন্যে ?

স্বাতী ! একটা নক্ষত্রের নাম। দূর আকাশের নক্ষত্র।

স্বাতী। একটি মেয়ের নাম। ল্যান্স ডাউনের একটি অট্টালিকায় থাকে। পৃথিবী বা আকাশের তুলনায় ল্যান্স ডাউন খুব দূরে নয়। এতদিন যাই নি কেন ? এতদিন কেন দেখা হয় নি স্বাতীর সঙ্গে। এই পৃথিবীতে কতকাল ধরে স্বাতীও ছিল, আমিও ছিলাম। তবুও দেখা হয় নি। কালই প্রথম দেখা।

স্বাতীকে আমার এখুনি দেখতে ইচ্ছে করছে। স্বাতী যখন পৃথিবীতে আছে তখন সে কেন আমার কাছে, আমার পাশে থাকবে না ?

যদি এমন হত যে স্বাতীর সঙ্গে আমার অনেক দিনের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে, তাহলে ওকে কল্যাণীর বিয়েতে আমাদের দেশের বাড়িতে নিয়ে যেতাম।

স্বাতী কখনো গ্রাম দেখে নি। হয়তো নদীও দেখে নি। আম খেয়েছে ! আমের বউল ফোটা দেখে নি। স্বাতী গ্রাম দেখলে পাগল হয়ে ছবি আঁকবে।

এই সময় মেসের ছোকরা চাকরটা এসে খবর দিলে,···সুজিতদা, আপনার ফোন।

—আমার ?

সুজিত ভাবতে লাগল কে তাকে ফোন করছে ? বারীন ? সবিতাদি ? সবিতাদির কাছ থেকে আমি কি ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছি ? না, তাতো নয়। মাত্র ত্বদিন আগে দেখা হয়েছে। তবে কি সরে যাব ? তা হয়তো হতে পারে। সবিতাদি আমার জীবনে চিরদিনের হতে পারে না। বিরামবাবুর সঙ্গে যদি সবিতাদির আবার অন্তরের যোগ ঘটে, সেটাই ওকে সুখী করবে সবচেয়ে গভীর করে। সবিতাদি বিরামবাবুর কাছেই জিততে চায়, তার কাছেই হয়ে উঠতে চায় অনুপেক্ষণীয়, অপরিহার্য। ঈশ্বর ওদের মেলাক।

ফোনটা থাকে মেসের একতলায়, ম্যানেজার বঙ্কিমবাবুর টেবিলে। সকলেই বলে ও লোকটার কতকগুলো বদভ্যাস আছে। মেসের কোন বোর্ডারকে যদি কোন মেয়ে ফোন করে, লোকটা যেন সহ্য করতে পারে না। আগে তারা কাউকে ডেকে দিতে বললে ডেকে দিত না। কিছুকাল আগে ছেলেরা গিয়ে খুব কড়া রকমের একটা শাসানী দেয়। তারপর একটু নরম হয়েছে। কিন্তু কেউ যখন ফোনে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে, লোকটা আলু-পটলের দাম, মাছের মুড়ো পেটী গাদা, তিন দিনে দু'কিলো হলুদ খরচা হয় কি করে এই সব বাজে ব্যাপার নিয়ে ম্যানেজারী চালে অকারণ চেঁচামেচি করতে থাকে, গোলাকার গোঁফওয়ালা হোঁৎকা মুখটাকে আরও বিকৃত করে।

সুজিত রিসিভার তুলে কানে ধরল।

—হ্যাঁলো।

—হ্যাঁলো, সুজিতবাবু!

—হ্যাঁ, কথা বলছি।

—আমাকে চিনতে পারছেন?

সুজিত একটু থমকে গেল। একটা ক্ষীণ সন্দেহ দেখা দিল মনে। কিন্তু তা কি সত্যি হতে পারে? সুজিত কিছু বলার আগেই ওপ্রান্ত থেকে কথা ভেসে এল।

—আপনার বন্ধু! এবার চিনতে পেরেছেন?

সুজিতের সমস্ত শরীরে বয়ে গেল একটা বৈদ্যুতিক শিহরণ।

—স্বাতী?

একটা চাপা উল্লাস ফুটে উঠল সুজিতের কণ্ঠস্বরে।

—চিনতে পেরেছেন তাহলে। কেমন আছেন?

—ভাল।

—রাত্রে ঘুমিয়েছিলেন?

—শুনতে পাচ্ছি না। এখানে বড্ড হৈ হৈ ডিসটার্ব হচ্ছে

—রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল ?

—হয়েছিল।

—মা বললেন, খোঁজ নিতে। আপনি খুব ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কবে আসছেন ? আজ ?

—না, আজ নয়। আজ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

—তবে যে বললেন, আপনার কোন বন্ধু নেই।

—না, বন্ধু মানে ঠিক বন্ধু নয়। আত্মীয়ের মতো।

—তাঁর নাম সবিতাদি, তাই না ?

—আপনি কি করে জানলেন ?

—কাল কিন্তু আমাকে তুমি বলেছিলেন।

—তাই বুঝি ? তুমি কি করে জানলে ?

—আপনিই বলেছিলেন। কবে আসছেন ? মার খুব ভাল লেগেছে আপনাকে। মা কি বলেছেন জানেন ? শুনলে হয়তো রাগ করবেন।

—না, রাগ করবো কেন ?

—বলছিলেন, ছেলেটি বড্ড সরল, গ্রাম্য।

—ঠিকই বলেছেন।

—তাহলে কাল আসছেন ?

—আজও তো যেতে পারি, তুমি যদি বল।

—আপনার সবিতাদি ভাববেন না তো ?

—হয়তো ভাববেন। তাঁকে বলবো আমার একটা হঠাৎ নিমন্ত্রণ এসে গেল।

—যদি জিজ্ঞেস করেন কোথা থেকে ?

—বলবো……

—সুজিত একটু থামল। তার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চাপা হাসিতে।

—বলবো, জগতে আনন্দ-যজ্ঞে।

ওপ্রান্তে স্বাতী হাসল।

সুজিতের মনে হল হাসিটা যেন একটা নির্ঝরের মতো তার বুকের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। মনে হল যেন ঐ হাসির ধারাজলে স্নান করে ক্রমশ স্নিগ্ধ হতে স্নিগ্ধতর হচ্ছে তার সমস্ত দেহ মন।